মাসুদ রানা

বিদেশী গুপ্তচর-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৭৪

এক

চৌরঙ্গীর কন্টিনেন্টাল হোটেল।

বিদায়ের আগে এক কাপ কফি খাচ্ছে রানা লাউঞ্জে বসে। কফিটা এরা বানায় ভাল। সুটকেস গোছানোর ভার গিলটি মিঞার ওপর ছেড়ে দিয়ে নেমে এসেছে ও চার তলার স্যুইট থেকে। ট্যাক্সির জন্যে বলা হয়েছে পোর্টারকে, এতক্ষণে এসে গেছে হয়তো। যাত্রার সব আয়োজন শেষ। ভিয়েনায় চলেছে ও ইন্টারপোলের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে।

কফির কাপে তৃতীয় চুমুক দিয়েই কান খাড়া হয়ে গেল রানার।

'আচ্ছা এই হোটেলে মাসুদ রানা বলে কেউ উঠেছেন কি?' কণ্ঠস্বরটা কাঁপা কাঁপা।

চট করে চোখ তুলল রানা। এক বৃদ্ধা। বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির কম হবে না। সম্ভ্রান্ত চেহারা। বেশিরভাগ চুলই পাকা। হাতের চামড়া ঝুলে পড়েছে, জরজর, কোঁচকানো। বাঁ হাতে একটা স্কুলটীচারী ছাতা আর উনিশশো ছত্রিশ মডেলের ভ্যানিটি ব্যাগ। ডান হাতে রিসেপশন কাউন্টারের ব্রাস-রেল আঁকড়ে ধরে পুরু লেন্সের চশমার ভিতর দিয়ে চেয়ে রয়েছেন বৃদ্ধা ব্যস্ত ক্লার্কের

মুখের দিকে। রানা লক্ষ করল, পা দুটো কাঁপছে মহিলার, মনে হচ্ছে ব্রাস-রেল ছেড়ে দিলেই পড়ে যাবেন হুড়মুড় করে।

মুখ না তুলেই জবাব দিল রিসেপশন ক্লার্ক, 'উঠেছিলেন, কিন্তু আজ চলে যাওয়ার কথা, খুব সম্ভব চলে গেছেন।'

'কোথায়?' ফ্যাকাসে হয়ে গেল বৃদ্ধার মুখটা।

'জানি না,' ঝাঁঝাল কণ্ঠে কথাটা বলে বিরক্ত দৃষ্টিতে চাইল ক্লার্ক মহিলার মুখের দিকে, সম্ভ্রান্ত চেহারা চিনতে ভুল করল না, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল চাবি ঝোলানো বোর্ডটার দিকে, একটা মোটা রেজিস্টার উল্টে দেখল। 'দেড়টায় ফ্লাইট। আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট আছে।' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। 'এতক্ষণ পর্যন্ত কি করছে লোকটা ঘরে বসে?' হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে কানে ধরল ক্লার্ক, পরমুহূর্তে চোখ গেল তার পোর্টারের দিকে, সেদিকে ইঙ্গিত করে বলল মহিলাকে, 'ট্যাক্সি এসে গেছে। দেখা হবে না এখন। ওই দেখুন মালপত্র নামছে।'

পাশ ফিরে দেখলেন মহিলা ব্যস্ত-সমস্ত পোর্টারকে, সুটকেসের ওপর 'মাসুদ রানা' লেখা লেবেলটা পড়লেন। দ্রুতপায়ে বাইরে বেরিয়ে গেল পোর্টার দুই হাতে দুটো সুটকেস নিয়ে। শূন্যদৃষ্টিতে সেদিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মহিলা, চলে যাওয়ার জন্যে এক পা বাড়িয়ে টলে উঠলেন, মাথাটা বোধহয় ঘুরে উঠল, চট্ করে একটা চেয়ার ধরে সামলে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন।

শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল রানা, তারপর উঠে এসে দাঁড়াল বৃদ্ধার সামনে।

'আপনার কি খুবই জরুরী দরকার ছিল?'

'হ্যাঁ, বাবা।' ফোঁস করে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মহিলা। চোখ দুটো ঘোলাটে। কাঁপা গলায় বললেন, 'মহা ভুল হয়ে গেল। আরও আগে রওয়ানা হওয়া উচিত ছিল। ট্রামে-বাসে যা ভিড়,

উঠতেই পারলাম না। হেঁটে এসেছি, তি-ন মাইল।'

'খুব বেশি সময় লাগবে? মানে, কথা কি অনেক বেশি?'

'না বাবা। বেশি কথা নয়। কিন্তু বুঝতে পারছি, এখন তার দম ফেলবারও সময় নেই। ভুল হয়ে গেছে আমার। এত ব্যস্ততার মধ্যে—'

ঘড়ি দেখল রানা বলল, 'আচ্ছা, কি ব্যাপারে কথা বলুন তো?'

সরাসরি রানার মুখের দিকে চাইলেন বৃদ্ধা। 'আমার ছেলের ব্যাপারে।' আশার আলো ফুটে উঠল দুই চোখে। 'তুমি পারবে বাবা দেখা করিয়ে দিতে?'

'কিছু মনে করবেন না, আমার আগেই পরিচয় দেয়া উচিত ছিল—আমিই মাসুদ রানা। চলুন না ট্যাক্সি করে দমদম যাওয়ার পথে আপনার কথা শুনব?'

রানার পরিচয় জেনে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বৃদ্ধার, কিন্তু শেষের কথাটায় ম্লান হয়ে গেল আবার। চট্ করে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'আমার পেছনে পুলিসের লোক লেগে আছে। ওরা ধরে ফেলবে। উঠতেই দেবে না তোমার ট্যাক্সিতে।

হঠাৎ রানার মনে হলো মহিলা পাগল নয়তো? কিন্তু তাহলে ওর নাম জানল কি করে? ঘড়ি দেখল আর একবার। গিলটি মিঞাকে দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে আসছে এদিকে লিফট থেকে নেমে। সময় নেই। কি করবে বুঝতে পারছে না রানা।

রানার ভাবটা লক্ষ করলেন মহিলা। বললেন, 'ঠিক আছে, যত সংক্ষেপে পারি বলছি। অনিলকে চেনো তুমি?'

'অনিল—মানে, অনিল চ্যাটার্জী?' বসে পড়ল রানা সামনের চেয়ারে।

চোখ দুটো সামান্য একটু বিস্ফারিত হয়ে গেছে রানার। ভাল

করেই চেনে সে অনিলকে। দেড় বছর আগে একসঙ্গে কাজ করেছে ওরা একটা অ্যাসাইনমেন্টে। তুখোড় ছেলে। ভারতীয় গুপ্তচর বিভাগের সেরা এজেন্টদের একজন অনিল চ্যাটার্জী। ইনি কি তারই মা? তাহলে এঁর পিছনে পুলিসের লোক কেন?

'হ্যাঁ। আমি তার মা। দেড় মাস আগে রোমে গিয়েছিল ও। পৌঁছে চিঠি দিয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে আর কোন খবর নেই।' চোখ দুটো ছলছল করে উঠল বৃদ্ধার। 'যখনই বাইরে যায়, যেখানেই থাকুক সপ্তাহে দুটো করে চিঠি দেয় ও। কিন্তু এবার কোন খবর নেই ওর।'

'ওর অফিসে জানিয়েছেন?'

'সবাইকে জানিয়েছি। কেউ কোন সাহায্য করবে না। ও ফরেন সার্ভিসের লোক, মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্সে জানিয়েছি, পুলিসকে জানিয়েছি, কোন লাভ হয়নি। এমন ভাব দেখাচ্ছে সবাই যেন অনিলের কিছু হয়ে থাকলে ওদের কিছুই এসে যায় না। আমার মন বলছে ভয়ানক কিছু একটা ঘটে গেছে। নিজে যাব মনে করে আমার পাসপোর্টটা রিনিউ করবার জন্যে দিয়েছিলাম দুই সপ্তাহ আগে, ওরা বলছে হারিয়ে গেছে সেটা, আবার নতুন করে অ্যাপ্লাই করতে হবে। তার আগে থেকেই আমার পেছনে লোক লেগে গেছে, যেখানেই যাই না কেন, আমাকে অনুসরণ করছে সাদা পোশাক পরা দুজন পুলিস। এখানেও এসেছে পেছন পেছন।

মহিলা পাগল কিনা সে সন্দেহটা আবার একবার উঁকি দিল রানার মনের কোণে। গিলটি মিঞা এসে দাঁড়াল পাশে। চঞ্চল হয়ে উঠল সে রানাকে নির্বিকার চিত্তে গল্প করতে দেখে।

'ট্যাক্সি ডেঁড়িয়ে আচে, স্যার। যাবেন না? হাতে আর সোমায় নেই।'

'বাইরে দুজন টিকটিকি রয়েছে, ওদের সঙ্গে খানিক গল্প-

গুজব করোগে যাও। ভেতরে ঢুকতে দেবে না।'

দুই সেকেন্ড অবাক হয়ে চেয়ে রইল গিলটি মিঞা রানার মুখের দিকে, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। রানা ফিরল বৃদ্ধার দিকে।

'আমার কাছে কি সাহায্য আশা করছেন?' সরাসরি প্রশ্ন করল রানা।

'তা আমি ঠিক জানি না, বাবা। অনিল দেখা করতে বলছে তোমার সঙ্গে।' ব্যাগ থেকে একটা রঙিন পিকচার-পোস্টকার্ড বের করলেন বৃদ্ধা, রানার হাতে দিয়ে বললেন, 'গতকাল এসেছে এটা।'

কার্ডটা উল্টে-পাল্টে দেখল রানা। ভেনিসের ব্রিজ অফ সাইজের (দীর্ঘশ্বাসের সেতু) রঙিন ছবি। ইটালিয়ান পোস্ট অফিসের সীলে তারিখ দেখা যাচ্ছে পাঁচদিন আগের। প্রাপকের নাম অরুণা ভট্টাচার্য, ২৬/২ যদুনন্দন গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬। পরিষ্কার হস্তাক্ষরে একটা ছোট্ট চিঠি, ইংরেজিতে লেখা। বাংলা মানে করলে দাঁড়ায়:

কাজে আটকে গেছি, ছুটতে পারছি না।
শরীরটাও খারাপ। কাগজে দেখলাম, মাসুদ
রানা ভিয়েনায় আসছে। ওকে আমার প্রীতি
জানিয়ো। সেরা তিনটে হোটেলের যে কোন
একটায় পাবে। অবশ্যই দেখা করবে।
ইতি–এস.ও.সলিল।

অবাক হয়ে বৃদ্ধার মুখের দিকে চাইল রানা।

'কার চিঠি এটা? অনিলের নয়! আপনার উদ্দেশেও লেখা নয়। অথচ আমার নাম...'

'এ চিঠি অনিলেরই।' কাঁপা গলায় বললেন বৃদ্ধা। 'ওরই হাতের লেখা। ঠিকানাটা ওর মামা বাড়ির। বিয়ের আগে আমার

নাম ছিল অরুণা ভট্টাচার্য। সলিল ওর বাবার নাম। এস.ও. সলিল মানে সান অফ সলিল, তার মানে অনিল। আজ সকালে পৌঁছে দিয়ে গেছে এটা আমার কাছে আমার ভাইপো। আবার পড়ে দেখো বাবা, ও কিছু একটা বলতে চাইছে তোমাকে এই চিঠিতে। নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছে কোন।'

আবার একবার কার্ডটার দিকে চেয়েই মনে মনে চমকে গেল রানা। 'পিপ্‌ল্ হু ক্রসড্ দা ব্রিজ অফ সাইজ ওয়্যার কন্‌ডেম্‌ড।' অনিল বোঝাতে চাইছে বিপদে পড়েছে সে, হয় আত্মগোপন করে আছে নয়তো বন্দী হয়েছে–বেরোতে পারছে না। চিঠির শেষে নাম সই করবার ছলে এস.ও.এস. বিপদসংকেতটা এবার আর ওর চোখ এড়াল না। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল রানা। ঘড়ি দেখল–কাঁটায় কাঁটায় একটা।

গিলটি মিঞা এসে দাঁড়াল আবার। অস্থির হয়ে উঠেছে বেচারা। জীবনে এই প্রথম সত্যিকার অর্থে বিদেশ চলেছে সে। উৎসাহ আর উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে সকাল থেকে।

'সোমায় নেই, স্যার। ট্যাক্সিআলা বলচে এখুনও রওনা দিলে হয়তো...'

'বাইরের দুজন কি করছে?' প্রশ্ন করল রানা।

'গোমড়ামুকো ভূত, স্যার। কতা বলে না। উই উদিকে পানের দোকানে...'

'ঠিক আছে। তুমি এক কাজ করো, আজকে যাচ্ছি না আমরা, ট্যাক্সি বিদায় করে দিয়ে মালপত্র ঘরে তোলার ব্যবস্থা করো। আর আজকের টিকিটগুলো ক্যান্সেল করে কালকের জন্যে রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করো। পারবে না?'

'নিচ্চয়।' বারকয়েক রানা ও বৃদ্ধার মুখের দিকে চাইল গিলটি মিঞা, তারপর হাসল। 'ব্যাপারেশন খারাপ!'
দ্রুতপায়ে চলে গেল গিলটি মিঞা। অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলেন

বৃদ্ধা। বললেন, 'তোমার অনেক ক্ষতি...'

'কিচ্ছু না। এজন্যে ভাববেন না আপনি।' উঠে দাঁড়াল রানা। চলুন, উপরে গিয়ে আগাগোড়া সবটা ব্যাপার শোনা যাক।'

দুই

চারতলার স্যুইটে একটা সোফায় বৃদ্ধাকে বসিয়ে মুখোমুখি আরেকটা সোফায় বসল রানা। মহিলার অস্বস্তি দূর করবার জন্যে হাসল মিষ্টি করে।

'আর কোন তাড়া নেই। এবার ধীরে সুস্থে বলুন দেখি ব্যাপারটা?'

'কি দুশ্চিন্তার মধ্যে যে আছি বাবা, কি বলব। অনিল আমার একমাত্র সন্তান। ওর বাবা মারা যাওয়ার পর স্কুলের মাস্টারি করে বহু কষ্টে মানুষ করেছি ওকে। ভেবেছিলাম বুড়ো বয়সে বুঝি নিশ্চিন্ত হতে পারব, ছেলেটার একটা বিয়ে দিয়ে ওকে ঘরকন্না-সংসারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই মুক্তি পাব। কিন্তু তা হলো না। ছেলে এমন চাকরি নিল যে বছরের মধ্যে নয় মাসই থাকতে হয় ওকে বিদেশে। ফরেন সার্ভিস হলেই এত বদলি হয় নাকি, বাবা?'

রানা বুঝল, অনিল যে ঠিক কি কাজ করে জানা নেই ওর মায়ের। এক্ষুণি কিছু না জানানোই ভাল মনে করে চুপ করে থাকল। কথা বলেই চললেন বৃদ্ধা।

'আজ এদেশ, কাল ওদেশ, কোথাও থির হয়ে বসতে দিচ্ছে না ছেলেটাকে। চারমাস রোমে থাকার পর দেশে ফিরে এসে আবার যখন রোমে গেল এবার, আমি মনে করলাম যাক, এবার কিছুটা সুস্থির হয়েছে বুঝি, মেয়ে দেখতে শুরু করেছিলাম, এমনি সময়ে উপস্থিত এই বিপদ।'

‘বিপদটা টের পেলেন কবে? পৌঁছে যে চিঠি দিয়েছিল তাতে কোন আভাস ছিল?’

‘না, বাবা। সাধারণ চিঠি–পৌঁছেচি, ভাল আছি, তুমি কোন চিন্তা কোরো না, আর তোমার দুটি পায়ে পড়ি অজানা অচেনা কোন মেয়েকে পছন্দ করে বোসো না, সময় হলে আমি জানাব তোমাকে, তোমার অমতে বিয়ে করব না এটুকু জেনে রেখো–এইসব কথা। এ চিঠির পর সাতদিন পেরিয়ে গেল, আর কোন চিঠি না পেয়ে অবাক হয়েছি কিন্তু ঘাবড়ে যাইনি। দু’সপ্তাহ পর যখন আমার চিঠিগুলো রি-ডাইরেক্টেড হয়ে ফেরত আসতে আরম্ভ করল, তখন ঘাবড়ে গেলাম। ট্রাঙ্ক-কল করলাম ওর হোটেলে–নেই। এমব্যাসীতে ট্রাঙ্ক-কল করলাম–কথার জবাবই দিতে চায় না, উল্টে ওরাই আবোল-তাবোল প্রশ্ন শুরু করে দিল, অনেক অনুরোধ উপরোধ করেও কোন খবর বের করতে পারলাম না অনিলের, শেষে হতাশ হয়ে ছেড়ে দিলাম। গেল দেড়শো টাকা। ততক্ষণে আমার মন বলতে শুরু করেছে, ভয়ানক কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে অনিলের, নিশ্চয়ই খুবই অসুস্থ তাই খবরটা চেপে যাচ্ছে সবাই আমার কাছে।

‘ছুটে গেলাম সন্তোষের আপিসে। অনিলের বন্ধু। ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। কোন অসুবিধে হলে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে রেখেছিল অনিল আমাকে। আগেও একবার ওর সাহায্য দরকার পড়েছিল, পাকিস্তানে আটকে গিয়েছিল তখন অনিল, অনেক সাহায্য করেছিল তখন এই সন্তোষ। দেখা করতেই খুবই আদর-আপ্যায়ন করল, কথা দিল তিনদিনের মধ্যে অনিলের খবর বের করে জানাবে আমাকে, যেন কোন দুশ্চিন্তা না করি। কিন্তু কিছুই করল না ছেলেটা। আর দেখাই পেলাম না ওর। তিনদিন পর ওর আপিসে গেলাম–নেই। পরদিন গেলাম–নেই! আপিসের আর সবাই কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে

দেখছে আমাকে, ব্যবহার বদলে গেছে, কেমন যেন নির্বিকার, কঠিন। একজন অফিসার আমাকে জানিয়ে দিল, অনিলের কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি, জানা গেলে খবর দেয়া হবে আমাকে, কষ্ট করে ওদের আপিসে যাওয়ার দরকার নেই।’

‘এটা কতদিন আগের ঘটনা?’

‘বিশ-একুশ দিন। পরদিন ফোন করলাম আবার সন্তোষের আপিসে। আপিসেই ছিল, কিন্তু কথা বলল না। আরেকজন কে যেন খুব কড়া গলায় বলল, শুধু শুধুই বিরক্ত করছি ওদের, জানাবার মত কোন খবর থাকলে আপনিই জানাবে ওরা, ধন্না দিলে কোন ফল হবে না।’

স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে মলিন হয়ে গেল অপমানিতা বৃদ্ধার মুখ, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, ‘আমি বুঝতে পারলাম কোন সাহায্য করবে না এরা। সোজা গেলাম মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্সে। সেখানেও একই ব্যাপার, প্রথমে তো কেউ দেখাই করবে না আমার সাথে। কারও সময় নেই। ধন্না দিয়ে পড়ে রইলাম, অনিলের সংবাদ না নিয়ে কিছুতেই যাব না আমি। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে ডাকা হলো আমাকে একজন ডেপুটি সেক্রেটারির ঘরে। বসতে পর্যন্ত বলল না, ঘরে ঢুকতেই অনিলের বয়সী একটা ছেলে ভ্রূ কুঁচকে কটমট করে আমার দিকে চেয়ে বলল, ‘কেন মিছেমিছি আমাদের বিরক্ত করছেন? এটা ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপার, ওদের কাছে যান।’ কেঁদে ফেললাম, ইন্টেলিজেন্স থেকে যে অনর্থক ঘোরাচ্ছে সে কথা বললাম, কিন্তু কিছুতেই কোন কাজ হলো না। সোজা বলে দিল, ‘এটা আমাদের কাজ নয়, আপনি এবার আসুন।’ রুমাল বের করে চোখ মুছলেন বৃদ্ধা চশমা খুলে।

‘তারপর?’

‘আমি বললাম, আমার ছেলের সংবাদ আমাকে জানতেই

হবে। আপনারা সবাই মিলে যে ব্যবহার করছেন তাতে সোজা পত্রিকা অফিসে গিয়ে সব ব্যাপার জানানো ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না।'

ছেলের জন্যে মা যে কতটা করতে পারে উপলব্ধি করে রীতিমত মুগ্ধ হয়ে গেল রানা। বলল, 'ঠিক বলছেন। ওরা কি বলল এ কথা শুনে?'

এক লাফে উঠে দাঁড়াল ডেপুটি সেক্রেটারি। আমার মনে হলো এক্ষুণি বুঝি গায়ে হাত তুলে বসবে। কিন্তু তা না করে আমাকে বসবার ইঙ্গিত করে ছুটে বেরিয়ে গেল ছেলেটা কামরা থেকে। প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো একজন সেক্রেটারির ঘরে, সেখানে খুবই কটু ভাষায় ধমক দেয়া হলো আমাকে। জানিয়ে দেয়া হলো, ইচ্ছে করলে পত্রিকা অফিসে যেতে পারি আমি, কিন্তু গেলে পস্তাতে হবে আমাকেই। অনিলের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে কোন রকম পাবলিসিটি হলে ক্ষতি হবে অনিলেরই। এ ব্যাপারে বেশি খোঁজ খবর করতে যাওয়াটা নাকি আমার জন্যেই বিপজ্জনক। আমার এখন চুপচাপ ঘরে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। এমন চোখ পাকিয়ে কথাগুলো বলল লোকটা যে সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম আমি। অনিলের খোঁজ খবর করতে গিয়ে যদি ওর অনিষ্ট হয়, সেটা আমি চাই না। কিন্তু কেন ওর অনিষ্ট হবে, ওদের কর্মচারী ইটালিতে গিয়ে কি বিপদে পড়ল সে সম্পর্কে ওরা কিছুই জানে না বা জানতে চায় না কেন, এরকম অনর্থক দুর্ব্যবহারই বা কেন করছে কিছুই বুঝতে পারলাম না। হতাশ হয়ে বেরিয়ে এলাম ওখান থেকে। কিছুদূর হাঁটবার পরই বুঝতে পারলাম আমাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। উনিশশো তিরিশ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জড়িত ছিলাম, কাজেই এদের চিনতে ভুল হলো না আমার। একজন সামনে আর একজন পেছনে সর্বক্ষণ লেগে

আছে এরা আমার সঙ্গে।'

'পাসপোর্টের ব্যাপারে কি যেন বলছিলেন?'

'হ্যাঁ। কয়েকদিন ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবলাম। বুঝলাম কারও কাছ থেকে কোনরকম সাহায্যের আশা নেই। শেষে ঠিক করলাম আমি নিজেই যাব। রিনিউ করার জন্যে জমা দিলাম সেটা। হচ্ছে, হবে, দেখি কি করা যায়, ইত্যাদি করে বেশ কয়েকদিন দেরি করিয়ে দেয়ার পর একদিন ওদের অফিসে গিয়ে চেপে ধরলাম। আমার ফাইলটাই নেই, হারিয়ে গেছে। আবার নতুন করে দরখাস্ত দেয়ার পরামর্শ দিল আমাকে ওদের এক অফিসার, কথা দিল যত শীঘ্রি সম্ভব যাতে পাই সে চেষ্টা করবে সে। বুঝলাম সবই। হাল ছেড়ে দিয়ে চোখের জলে ভাসলাম কয়েকদিন, প্রার্থনা করলাম ভগবানের কাছে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, ছটফট করলাম অসহায় যন্ত্রণায়—এমনি সময়ে এল এই কার্ডটা। বেঁচে আছে, এটুকু বুঝতে পারছি, কিন্তু কেন সরাসরি আমার ঠিকানায় না পাঠিয়ে মামাবাড়ির ঠিকানায় পাঠাল ও কার্ডটা, বুঝতে পারছি না। বিপদে পড়েছে বুঝতে পারছি; কিন্তু কি বিপদ, কি ধরনের কতবড় বিপদ, কিছুই বুঝতে পারছি না। হু-হু করে কাঁদছে শুধু বুকের ভিতরটা।'

বৃদ্ধা কান্নায় ভেঙে পড়বার আগেই চট করে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আপনি কি কিছুই আঁচ করতে পারছেন না? কি ধরনের কাজ করত অনিল কিছুই জানা নেই আপনার?'

'না, বাবা। ওর কাজকর্মের ব্যাপারে কিছুই বলেনি ও আমাকে কোনদিন।'

'আচ্ছা, আপনার কি কোনদিন সন্দেহ হয়েছে যে আপনার ছেলে হয়তো ভারতীয় গুপ্তচর বিভাগে কাজ করে?'

ঝট করে চাইলেন বৃদ্ধা রানার চোখের দিকে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলেন।

‘কোনদিন ভাবিনি। হতে পারে। এখন মনে হচ্ছে, হতে পারে এটা।’ ভ্রূ কুঁচকে ভাবলেন বৃদ্ধা আরও কিছুক্ষণ। ‘ঠিকই বলেছ। সম্ভব। এদের কথাবার্তা, ব্যবহার দেখে তাই তো মনে হচ্ছে এখন। কোন দেশের স্পাই যদি অন্য দেশে ধরা পড়ে তাহলে তার পরিচয় অস্বীকার করে তার নিয়োগকারী দেশ–এ রকম কি যেন পড়েছিলাম কোথাও। তাই কি ঘটেছে অনিলের ভাগ্যে?’ পুরু লেন্সের ভিতর দিয়ে রানার মুখের দিকে চেয়ে জবাব খুঁজছে বৃদ্ধার ব্যাকুল দৃষ্টি।

‘ঠিক কি যে ঘটেছে তা বের করতে হবে আমাদের। এখান থেকে যতটা সম্ভব চেষ্টা করব আমি আজ খবর বের করবার। কয়েকজন হোমড়া-চোমড়া অফিসারের সঙ্গে জানাশোনা আছে আমার। যতটা জানা যায় আজই সন্ধ্যায় জানাব আমি আপনাকে। যদি এখান থেকে তেমন কিছু খবর সংগ্রহ করতে না পারি তাহলে ভিয়েনা থেকে ভেনিসে যাব, যে করে হোক খবর বের করবই আমি। আপনার ঠিকানাটা দিয়ে আপনি সোজা বাসায় চলে যান। কিচ্ছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।’

রানার কণ্ঠস্বরে নিজের ক্ষমতার ওপর আশ্চর্য এক আস্থা আর আত্মবিশ্বাসের রেশ উপলব্ধি করতে পারলেন বৃদ্ধা। দুর্দমনীয় একটা প্রাণ-স্পন্দন রয়েছে এর ভিতর। মনে হয় টগবগ করে ফুটছে এর ভিতরটা, কিন্তু বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই।

‘তুমি কি ভিয়েনায় চলেছ?’

‘তিনদিনের একটা সম্মেলনে যাচ্ছি বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে।’

‘তুমি বাংলাদেশের ছেলে?’

‘হ্যাঁ।’

‘কিছু মনে করো না বাবা, তুমি অনিলের বন্ধু, কিন্তু তোমার নাম কোনদিন শুনিনি আমি ওর মুখে। কতদিনের বন্ধু তোমরা?’

‘ঠিক বন্ধু বললে ভুল হবে। আমরা পরিচিত। সাতদিনের পরিচয়। দেড় বছর আগে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে একটা ব্যাপারে কাজ করেছিলাম আমরা সাতদিন। তখনই চিনেছিলাম ওকে আমি সৎ, সাহসী এবং বুদ্ধিমান ছেলে হিসেবে। তারপর ওর আর কোন খবর পাইনি, এতদিন পর আজ আপনার মুখেই ওর নাম শুনলাম প্রথম।’

অবাক হলেন বৃদ্ধা। ‘এই সামান্য পরিচয়েই ওর জন্যে এতটা ক্ষতি স্বীকার করে নিলে তুমি! আজকের ফ্লাইট ক্যান্সেল করলে, ভিয়েনা থেকে ভেনিসে যাবে, সময় নষ্ট হবে, টাকা নষ্ট হবে–’

মৃদু হাসল রানা। ‘এ নিয়ে আপনি ভাববেন না। সত্যি কথা বলতে কি, ওর জন্যে আমি ফ্লাইট ক্যান্সেল করিনি। আমি বিদেশী লোক, ভারতের রাষ্ট্রীয় কোন ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকারও আসলে নেই আমার। যেটুকু করছি বা করতে চাইছি সেটা না করে উপায় ছিল না আমার।’

‘কেন, বাবা?’

‘সন্তানের জন্যে একজন মায়ের প্রাণ কাঁদবে, আর আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যাব, সেটা কি সম্ভব? মায়ের চেয়ে বড় আর কি আছে পৃথিবীতে?’

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধা।

রানা বলল, ‘আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমার সাধ্যমত আমি সবই করব অনিলের জন্যে। কথা দিচ্ছি। অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে তাতে যে কোন মানুষের একেবারে ভেঙে পড়ার কথা। তবু তো আপনি অনেকখানি শক্ত হয়ে আছেন। আর কয়েকটা দিন সহ্য করতে হবে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, আমার মনে হচ্ছে সব ঠিক হয়ে যাবে।’

একটু সামলে নিলেন বৃদ্ধা। শীর্ণ একখানা হাত রাখলেন রানার শক্তিশালী বাহুতে।

'তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না। ধন্যবাদ দিয়ে তোমার মহত্ত্বকে ছোট করাও ঠিক নয়। আশীর্বাদ করি, সুখী হও, সফল হও জীবনের সব ক্ষেত্রে।'

বাসার ঠিকানা দিয়ে উঠে পড়লেন বৃদ্ধা। বললেন, 'মনটা অনেকখানি হালকা হয়ে গেছে, বাবা। সব জায়গায় বাধা পেয়ে পেয়ে হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম, চাপা আশঙ্কা আর উদ্বেগ কুরে কুরে খাচ্ছিল বুকের ভিতরটা। কোন দিকেই কোন পথ পাচ্ছিলাম না। কিভাবে যে কেটেছে গত একটা মাস!'

'সবটা বোঝা একা আপনার কাঁধে ছিল বলেই এরকম লেগেছে। এখন তো আর আপনি একা নন। আমিও আছি আপনার সঙ্গে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন গিয়ে। আমি চেষ্টা করব যেন আপনাকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে না হয়।'

বৃদ্ধাকে বিদায় দিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল রানা। পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করে নিল দু'মিনিটের মধ্যেই। ঘরে এসে ঢুকল গিলটি মিঞা। ওর দিকে না চেয়েই হুকুম করল রানা, 'একটা ট্যাক্সি ডাকো।'

জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে জনাকীর্ণ রাস্তায় হাঁটছেন বৃদ্ধা। পান দোকানের সামনের টুল থেকে উঠে দাঁড়াল দু'জন লোক।

তিন

রঞ্জন চৌধুরী। নামটা শুনলে মনে হয় কোন ছেলে ছোকরা হবে হয়তো। আসলে বয়স আটান্ন বছর। বেঁটে খাটো, ধুতি-শার্ট এবং তার ওপর পুরানো ছাঁটের কোট পরা সাদাসিধে লোকটিকে দেখলে যে কেউ মনে করবে কোন সরকারী অফিসের হেড ক্লার্ক, বড়জোর সেকশন অফিসার। আসলে ভদ্রলোক ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিসের চীফ। এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ডাকসেঁটে চীফ আর আসেনি

এই ডিপার্টমেন্টে।

অফিসার্স ক্যান্টিন থেকে খাওয়া সেরে লাউঞ্জের নির্জন কোণে পার্কের দিকে খোলা একটা জানালার ধারে বসলেন তিনি। বেয়ারা কফি দিয়ে গেল এক কাপ। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে বসে রইলেন চুপচাপ। গভীর কোন চিন্তায় মগ্ন।

কফির কাপে চুমুক না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর উঠে গিয়ে দাঁড়াল রঞ্জন চৌধুরীর টেবিলের পাশে।

'এই যে! কেমন আছেন? বসতে পারি?'

ঝট করে রানার মুখের দিকে চাইলেন চীফ। রানাকে দেখে একটু অবাক হলো দৃষ্টিটা। মুহূর্তে সামলে নিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই। কেমন আছেন? আমি জানতাম আপনি এতক্ষণে রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন ভিয়েনার পথে।'

'কাল যাচ্ছি।' বসল রানা চীফের মুখোমুখি।

'ওখান থেকে সোজা ফিরে আসবেন, না আরও কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে আছে?'

'ভাবছি একটু ভেনিস ঘুরে আসব।'

'দ্যাট্স্ গুড। ফেস্টিভ্যালটা দেখার জন্যে তো? আমি শুনেছি, দারুণ নাকি ওদের লা সেনেরেন্টোলা।'

ফেস্টিভ্যাল সম্পর্কে আলোচনায় রানার তেমন উৎসাহ নেই লক্ষ করে সরাসরি রানার চোখের দিকে চাইলেন রঞ্জন চৌধুরী। ভুরু নাচালেন। 'কি খবর?'

'একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার।'

ভুরু জোড়া সামান্য একটু কুঁচকে উঠেই আবার সোজা হয়ে গেল। 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কি ব্যাপারে?'

'অনিল চ্যাটার্জীর ব্যাপারে আমি আগ্রহী।'

স্থির দৃষ্টিতে রঞ্জন চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে কথাটা উচ্চারণ

করল রানা, আশা করেছিল এ প্রশ্ন শুনে চীফের কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটা লক্ষ করলে কিছুটা আঁচ করতে পারবে সে ব্যাপারটা। কিন্তু কোনরকম কোন প্রতিক্রিয়া টের পাওয়া গেল না তার মধ্যে। কোটের পকেট থেকে একটা চারমিনারের প্যাকেট বের করে খুলে এগিয়ে ধরলেন তিনি রানার দিকে, রানা একটা বের করে নিতেই নিজেও ঠোঁটে লাগালেন একটা, রানার গ্যাস লাইটারের আগুনে ধরিয়ে নিলেন সিগারেট। লম্বা করে গোটা কয়েক টান দিয়ে ঠোঁট থেকে আঙুলের ফাঁকে নিয়ে এলেন সিগারেটটা। রানার চোখের ওপর স্থির হলো তাঁর দৃষ্টি।

'অনিল, না? অনিল চ্যাটার্জী। হুম। তা, আপনি তার ব্যাপারে উৎসাহী কেন?'

'নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে আমরা এক সঙ্গে কাজ করেছিলাম কিছুদিন। ওর সততা আর দেশপ্রেম আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ভাল লেগেছিল ছেলেটাকে। ওর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না শুনলাম।'

'আমিও তাই শুনেছি,' বললেন রঞ্জন চৌধুরী। কফির কাপে চুমুক দিলেন আরেকটা। 'আজকাল সবকিছুতেই ভেজাল। কফির সে স্বাদ আর নেই। সেই ছাত্রজীবন থেকে খাওয়ার পর এক কাপ করে কফি খাওয়ার অভ্যাস...'

'কি হয়েছে ওর?'

চোখ মিটমিট করলেন রঞ্জন চৌধুরী।

'কার কি হয়েছে?'

মৃদু হাসল রানা। 'এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন আপনি, মিস্টার চৌধুরী। অনিল নিখোঁজ। আমি জানতে চাই কি হয়েছে ওর।'

'আমি জানি না। সত্যিই জানি না।' কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠবার উপক্রম করলেন রঞ্জন চৌধুরী। 'এবার আমাকে উঠতে হয়। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। সন্ধের সময় আবার

একটা থিয়েটার দেখার নেমন্তন্ন রয়েছে—সস্ত্রীক। অফিসের কাজে দেরি করে ফেললে একেবারে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। কি যে মজা পায় ওরা এসবে বুঝি না। থিয়েটার-ফিয়েটারে আমার কোনদিনই...'

'বিপদে পড়েছে অনিল?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন রঞ্জন চৌধুরী।

'বড় নাছোড়বান্দা লোক আপনি, মশায়।' সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললেন, 'সেটা সম্ভব। আমি ঠিক জানি না, এবং সত্যি বলতে কি খুব একটা কেয়ারও করি না। উঠি এবার।'

একটু সামনে ঝুঁকে এল রানা। 'এক মিনিট। অনিলকে আমি সৎ ছেলে হিসেবে জানি। ওর মা আজ এসেছিলেন আমার কাছে। আপনি যদি এভাবে এড়িয়ে যান তাহলে অন্যত্র খবর সংগ্রহ করতে হবে আমার।'

একটু যেন থমকে গেলেন রঞ্জন চৌধুরী। দৃষ্টিটা একটু কাত করে ভাবলেন তিন সেকেন্ড, তারপর অমায়িক ভঙ্গিতে ফিরলেন রানার দিকে। 'ছোট্ট একটা উপদেশ দেব আপনাকে। নিজের চরকায় তেল দিন। এ ব্যাপারে আপনার কিছুই করবার নেই। ভেনিস যাচ্ছেন যান, ফুর্তি করে ফিরে যান নিজের দেশে।'

কঠোর হয়ে গেল রানার মুখটা। বলল, 'ধন্যবাদ! অনিলকে খুঁজে বের করতে চাই আমি। আপনার সাহায্য না পেলে অন্য রাস্তা দেখতে হবে আমাকে।'

রানার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন রঞ্জন চৌধুরী, রানার চোখে মুখে দেখলেন অনমনীয় দৃঢ়-সংকল্প। মুচকে হাসলেন তিনি।

'আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারছি না বলে দুঃখিত। শুধু এটুকু বলতে পারি, নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মেরেছে অনিল চ্যাটার্জী, এখন আর কারও কিছু করবার নেই। ওকে নিয়ে কারও

মাথা ঘামানোও উচিত বলে মনে করি না আমি। আপনাকে এতটা খোলাখুলি ব্যাপারটা বললাম এই জন্যে যে আমি চাই না আপনি এর মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে জলটাকে আরও খানিকটা ঘোলাটে করে তুলুন। ইট্স্ আ ম্যাটার অফ স্টেট–এর বেশি আর কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এর ভেতর নাক গলাবেন না। আরও সহজ করে বলতে হবে?'

চৌধুরীর চোখে চোখ রাখল রানা। বলল, 'না। কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলাম না আমি। গতকাল যে ছিল আপনাদের বিশ্বস্ত কর্মচারী হঠাৎ আর তার ভালমন্দে কিছুই এসে যায় না আপনাদের, চোখ উল্টে নিচ্ছেন বেমালুম; এটা কেমন উদ্ভট ঠেকছে আমার কাছে। কিন্তু সেটা আপনাদের ব্যাপার, আপনারা বুঝবেন। তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি, অনিলের মায়ের সঙ্গে আপনারা যে ব্যবহার করেছেন, যেভাবে হেস্তনেস্ত করেছেন সন্তানের সংবাদ জানার জন্যে ব্যাকুল এক বৃদ্ধা মাকে–'

অবাক চোখে রানার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন রঞ্জন চৌধুরী, হঠাৎ হেসে উঠলেন।

'এই সব ভাবালুতা ত্যাগ করবার ট্রেনিং দেয়া হয় না আপনাদের? এরকম সস্তা আবেগ আপনাকে কত বড় বিপদের মধ্যে ফেলতে পারে সে শিক্ষা দেননি আপনাদের চীফ?'

'তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, সব কিছুর গোড়ার কথা মনুষ্যত্ব। এখানে কিছুর সাথে কোন আপোষ নেই। সবার ওপরে স্থান দিতে হবে একে। শিখিয়েছেন, মনুষ্যত্বকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রয়োজন হলে নিজের প্রাণটা বিসর্জন দিতে দ্বিধা কোরো না। কারণ, এটা নষ্ট হয়ে গেলে ওই প্রাণের আর কোন দাম থাকে না।'

বাঁকা করে হাসলেন রঞ্জন চৌধুরী।

'ইটস্ আ ডেঞ্জারাস গেম, মাই ডিয়ার ইয়াং ম্যান। হয়

মারো, নয় মরো। ওইসব ভাবালুতা হয়তো বই পুস্তকে বেশ মানানসই মনে হতে পারে, বাট নট ইন প্র্যাকটিকাল মেটিরিয়ালিস্টিক ওঅর্লড। এনি ওয়ে, আপনি বা আপনার চীফ যদি ভাব জগতে বিচরণ করে আনন্দ লাভ করেন, আমার আপত্তির কিছুই নেই। আপনাদের ভাবের বোঝা আমাদের ঘাড়ে না চাপালেই আমরা খুশি হব। যাই হোক, আপনার শেষ প্রশ্নটার উত্তর দিয়েই আমি উঠব। অনিলের মা-র সঙ্গে যে ব্যবহার করতে আমরা বাধ্য হয়েছি, সেটা আমাদের দোষ মনে করলে আপনি মস্ত ভুল করবেন। অনিল যা করেছে সেটা করার আগে তার একবার মায়ের কথা ভাবা উচিত ছিল। চলি। দেখা হবে।'

চলে গেলেন রঞ্জন চৌধুরী। এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। স্নেহ মায়া মমতা ঢুকতে পারবে না ওখানে, এমনই কড়া পাহারা। অ্যাশট্রেতে টিপে মারল রানা চারমিনারটা। অনিল সম্পর্কে কিছুই বলেননি চৌধুরী, তবু কয়েকটা টুকরো কথার তাৎপর্য মনে মনে বিচার না করে পারল না সে। বোঝা যাচ্ছে, অনিলের নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে এরা পরিষ্কার ভাবে ওয়াকিফহাল। এটা ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাপার–স্বীকার করেছেন চৌধুরী। নিজের পায়ে কুড়োল মেরেছে অনিল, এখন আর কারও কিছু করবার নেই। ভাবনার কথা। মনে মনে স্থির করল রানা, এদের হয়তো করবার কিছুই নেই, কিন্তু আমার করবার কিছু থাকতেও পারে। আশাবাদী হওয়াই ভাল।

মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্সের কল্যাণ দাশগুপ্তের কাছে গিয়েও ঠিক একই রকম ধাক্কা খেলো রানা। একটি কথাও বের করা গেল না। অনিলের ব্যাপারে কিছুই জানে না তারা। ঠেসে ধরায় বলল খোঁজ খবর নিয়ে সপ্তাহ খানেক পরে জানাবার চেষ্টা করবে। উঠে আসবার আগে উপদেশ দিল–'আমার মনে হয় তোমার এ ব্যাপারে নাক না গলানোই ভাল। এ থেকে দূরে

থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অনিল সম্পর্কে কিছুই যদি না জানবে তাহলে এই উপদেশ কি করে দিচ্ছে জিজ্ঞেস করায় লজ্জিত হাসি হেসে বলেছে—তোমার যা খুশি ভাবতে পারো, আমি এর বেশি আর কোন সাহায্য করতে পারছি না, রানা।'

ইন্টেলিজেন্সের ডি.আই. জি. সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তার অজান্তে দু'একটা তথ্যের ভাঙা অংশ উদ্ধার করা গেল মাত্র, আর বিশেষ কিছুই উপকার হলো না।

সবারই ইঙ্গিত যেদিকে, সেটা মেনে নিতে কেমন যেন দ্বিধা হচ্ছে রানার। অনিলকে বিশ্বাসঘাতক, রাষ্ট্রদ্রোহী ভাবতে পারছে না কিছুতেই। সত্যেন বাবু স্বীকার করেছেন যে অনিলের মা-র পিছনে গোয়েন্দা লাগানো হয়েছে। কিন্তু কেন? পাসপোর্ট যখন আটকে দেয়া গেছে তখন মিসেস অরুণা চ্যাটার্জী যে দেশের বাইরে যেতে পারছেন না সেটা নিশ্চিত। তাহলে কি ওরা সবাই আশা করছে গোপনে অনিল দেখা করবে ওঁর সঙ্গে? কি হয়েছে অনিলের? ধরা পড়েছে কারও হাতে, নাকি আনুগত্য পরিবর্তন করেছে? কার্ডটার কথা ভাবল রানা—আটকে গেছি, ছুটতে পারছি না। শরীরটাও খারাপ। এর মানে কি? হয় বন্দী হয়েছে, নয় লুকিয়ে আছে কোথাও ভেনিসের কাছাকাছি। খুব সম্ভব আহত অবস্থায়। অথচ ভারতীয় এমব্যাসীতে গিয়ে উঠতে পারছে না সাহায্যের জন্যে। রানার কাছে সাহায্য চাওয়া যায়, কিন্তু তার নিজের দেশের সরকারের কাছে সাহায্য চাওয়া যায় না। কেন?

নানান কথা ভাবতে ভাবতে ফিরে এল রানা হোটেলে। ঘরে ঢুকেই থমকে গেল রানা। একটা সোফায় বসে পায়ের উপর পা তুলে আরাম করে বসে সিগারেট ফুঁকছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার শ্রীমান হাত-কাটা সোহেল। রানা থমকে দাঁড়াতেই এক চোখ বন্ধ করে সিগারেটটা ধরল সে রানার বুক লক্ষ্য করে।

'হ্যান্ডস্ আপ। এক চুল নড়লেই তোমার মাথার খুলি...' রানাকে তেড়ে আসতে দেখে এক লাফে সোফাটা ডিঙিয়ে ওপারে গিয়ে দাঁড়াল। চোখমুখ পাকিয়ে সিগারেটটা ধরে রেখেছে সে এখনও রানার বুকের দিকে। 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

'তোর তাতে কি রে, শালা? তুই চোরের মত ঢুকেছিস কেন আমার ঘরে?'

'চোপরাও, ইতর কাঁহিকে। এটা তোর ঘর? জানিস তুই তোর সমস্ত হোটেলের বিল কাকে পে করতে হয়? এই বান্দাকে। এ ঘর আমার।'

'সে তো খুব ভাল কথা, তবে আর সোফার আড়ালে কেন? সামনে এসো না চাঁদ।'

'মারবি না তো?'

'ঠিক আছে, মাপ করে দিলাম। যা বলবার সংক্ষেপে বলে দূর হয়ে যা। কাজ আছে মেলা।'

আশ্বাস পেয়ে আবার সোফা টপকে এপারে চলে এল সোহেল। বসল দুজন। ইন্ডিয়া কিং-এর প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল সোহেল রানার দিকে। পুরো প্যাকেটটাই মেরে দেবার ইচ্ছে ছিল রানার, কিন্তু খুলে দেখল মাত্র একটা সিগারেট রয়েছে ওর মধ্যে। রানাকে নিরাশ হতে দেখে হাসল সোহেল, আঙুল দিয়ে দেখাল নিজের ফুলে থাকা বুক পকেট। আগেই সব সিগারেট বের করে পকেটে রেখেছে সে। রানা সিগারেট ধরিয়ে নিতেই কাজের কথায় এল সোহেল।

'আমাকে পাঠানো হয়েছে তোর বস্ হিসেবে তোকে একটু ধমক-ধামক দেয়ার জন্যে। আজকের ফ্লাইট ক্যান্সেল করলি কেন? নিজের কাজ ফেলে কি গোলমাল পাকাতে শুরু করেছিস তুই এখানে বল্ তো?'

'কি করেছি?'

'এমন একটা ব্যাপারে অনর্থক নিজেকে জড়াতে যাচ্ছিস যার সঙ্গে তোর বা বাংলাদেশের কোন সম্পর্ক নেই। তোকে সাবধান করে দেয়ার হুকুম হয়েছে আমার ওপর।'

'তাই নাকি?' ধীরে সুস্থে ধরাল রানা সিগারেটটা। 'তা কে পাঠাল তোকে?'

'বুড়ো।'

বিস্মিত হলো রানা। 'কি বললি?'

'বুড়ো।' একই সুরে পুনরাবৃত্তি করল সোহেল। 'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ মেজর জেনারেল রাহাত খান। এইবার ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করা গেছে?' একটু থেমে আর একটু ব্যাখ্যা করল সোহেল। 'আমি এসব কিছুই জানি না, সন্ধ্যার ফ্লাইটে দিল্লী যাওয়ার কথা, হঠাৎ আধঘণ্টা আগে বড় সাহেবের মেসেজ এল। খুব সম্ভব রঞ্জন চৌধুরী যোগাযোগ করেছিল ঢাকায় বড় সাহেবের সঙ্গে। ওদের ধারণা তুই অনর্থক তোর নোংরা নাক গলাচ্ছিস ওদের ঘরোয়া ব্যাপারে। বিরক্তিকর মাছির মত ভনভন করছিস ওদের চারপাশে। ওরা চায় তুই যেন তোর দামী মাথাটা অন্যখানে গিয়ে ঘামাস।'

হাসির ভঙ্গি করল রানা। 'ঠাট্টা করছিস?'

'তোর ভগ্নিপতি হিসেবে সে রাইট আমার আছে, কিন্তু ঠাট্টা নয় দোস্ত, প্রয়োজন হলে গাঁট্টা চালাবে এরা। অত্যন্ত সিরিয়াস ব্যাপার।' কথাগুলো বলতে বলতেই টের পেল সোহেল ক্রমে কঠোর হয়ে যাচ্ছে রানার চোখ-মুখ। বিপদসংকেত টের পেয়ে চট করে যোগ করল, 'দ্যাখ, রানা, তুই ভাল করেই জানিস, তোকে বিরত করবার উপায় নেই। কিন্তু দুই দেশের সম্পর্কের কথাটাও তো ভাবতে হবে। আমার যা মনে হচ্ছে ব্যাপারটার মধ্যে প্যাঁচ আছে, খুবই উঁচু লেভেলের ব্যাপার। এ ব্যাপারে তোর আগ্রহ দেখে এরা ভয়ানক ভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেছে—ঠিক ভীমরুলের

চাকে ঢিল পড়ার মত অবস্থা।'

'কোন্ ব্যাপারে আমার এত আগ্রহ দেখতে পাচ্ছে এরা?' যেন রীতিমত অবাক হয়ে গেছে এমনি ভাব করল রানা। বুঝতে পেরেছে সে, এখন ভান না করলে কথা আদায় করা যাবে না সোহেলের কাছ থেকে।

বার কয়েক চোখ মিটমিট করল সোহেল।

'তুই জানিস না কোন্ ব্যাপারে কথা হচ্ছে?'

'অনিল বলে একটা ছেলেকে চিনি। তার মা এসেছিলেন আজ। ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। কথা দিয়েছি সম্ভব হলে খোঁজ করে বের করবার চেষ্টা করব ওকে। ব্যস, এই। কেন যে এতে রঞ্জন চৌধুরী বা মেজর জেনারেলের এত হাঁসফাঁসানি শুরু হয়ে গেছে বুঝতে পারছি না।'

'তোর জানা নেই যে অনিল চ্যাটার্জী সিক্রেট সার্ভিসের লোক?'

'তাতে কি এসে গেল? সিক্রেট সার্ভিসের লোক বিপদে পড়ে না? টোকিয়ো থেকে তোকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসিনি একবার?'

'আমি দেশদ্রোহী ছিলাম না।' স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সোহেল রানার চোখের দিকে।

'অনিল চ্যাটার্জী দেশদ্রোহী?'

'তা আমি জানি না। সব কথা আমাকে ভেঙে বলার প্রয়োজন বোধ করেননি মেজর জেনারেল। তবে যেটুকু আঁচ করছি, চৌধুরী তাঁকে তাই বুঝিয়েছে। খুব সম্ভব ধরা পড়েছে সে কোন ইন্টারেস্টেড পার্টির হাতে। অথবা যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে স্বেচ্ছায়। চৌধুরীর কাছে দুটোই সমান। অনেক গোপন তথ্য বেরিয়ে পড়বে অনিল মুখ খুললে। আমার বিশ্বাস মুখ খুলেছে অনিল।'

খানিক চুপচাপ সিগারেট টানল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল,

‘অতএব?’

‘অতএব বুঝতেই পারছ। তোমার উবগারের উৎসাহ একটু দমন করতে হবে। এটা অফিশিয়াল অর্ডার। যদি ভায়োলেট করো, নিজ দায়িত্বে করবে। আর বিদেশে যদি কোন বিপদে পড়ো, দৌড়ে গিয়ে যে এমব্যাসীতে উঠবে, সেটা চলবে না। ইটালির কোথাও বাংলাদেশ বা ভারতীয় এমব্যাসীতে আশ্রয় মিলবে না তোমার।’

উঠে দাঁড়াল সোহেল। হাত বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

‘কি জানাব বুড়ো মিঞাকে? কবুল?’

‘জানিয়ে দিস, ভেবে দেখব আমি। এটাও বলিস, এক অসহায় মা সাহায্য চেয়েছিল রানার কাছে তার সন্তানের মহা বিপদের সময়।’

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই বন্ধু চেয়ে রইল পরস্পরের চোখের দিকে। ইস্পাতের মত দৃঢ় দুই পুরুষ। মেজর জেনারেল রাহাত খানের নিজ হাতের গড়া বাংলাদেশের দুই সোনার টুকরো। সোহেলের ডান চোখটা সামান্য একটু ছোট হয়েই আবার সমান হয়ে গেল। হাত ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে এগোল সোহেল লম্বা পা ফেলে। কোটের একটা হাত দুলছে কেবল, আরেকটা হাত ঝুলে আছে স্থির হয়ে।

ছোট্ট একটা ভাড়াটে বাড়ি, পশুপতি বসু লেনের শেষ মাথায়। সন্ধের একটু আগে পৌঁছল রানা। ট্যাক্সি বিদায় করে দিয়ে কড়া নাড়ল।

দরজা খুলেই রানাকে দেখে মধুর হাসি ফুটে উঠল মায়ের মুখে।

‘এসো বাবা, এসো, ভেতরে এসো।’

সাদামাঠা একটা ড্রইং-রূমে রানাকে বসিয়ে এক্ষুণি কাজটা

সেরে আসছি বলে চলে গেলেন ঠাকুর ঘরের দিকে। রানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ঘরটা, দেয়ালে ঝোলানো অনিলের বাবার ছবি, বুকশেল্‌ফ্‌ ভর্তি বিপ্লবাত্মক বই, খটখটে টেবিল-চেয়ার, সবকিছুতেই মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাপ। রাজনৈতিক চেতনা এবং আদর্শবাদের ছাপও টের পেল রানা।

বৃদ্ধা এসে বসলেন। মনে মনে গুছিয়ে নিল রানা।

‘তেমন কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারিনি, কিন্তু কয়েকটা তথ্য জানতে পেরেছি। ঠিক কতটা আপনাকে বলা উচিত বুঝতে পারছি না।’

‘আমি সহ্য করতে পারব, বাবা। যা জেনেছ বিনা দ্বিধায় বলতে পারো।’

রানা বুঝল মনটা শক্ত করে নিয়ে বসলেন বৃদ্ধা ঋজু ভঙ্গিতে। ভরসা পেল। শুরু করল, ‘কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা করে জানতে পারলাম, ও গুপ্তচর বিভাগের কর্মচারী হিসেবেই গিয়েছিল রোমে। এবং একটা কিছু অঘটন ঘটেছে।’

চোখ বুজে এক সেকেন্ড টিপে রেখে আবার খুললেন বৃদ্ধা। ‘সত্যিই তাহলে বিপদের মধ্যে আছে অনিল। ধরা পড়েছে, তাই না?’

একটু ইতস্তত করে রানা বলল, ‘সেটা কেউ বলতে রাজি নয়। তবে আমার মনে হয় ধরা পড়েনি ও। ধরা পড়লে কার্ডটা পাঠাতে পারত না। কিন্তু কার্ডটা নকলও হতে পারে, কিংবা ওকে দিয়ে জোর করে লেখানো হয়ে থাকতে পারে আমাদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাবার জন্যে। যদি কার্ডটা নকল না হয়, কিংবা গায়ের জোরে লেখানো না হয়ে থাকে তাহলে আমার বিশ্বাস এখনও মুক্ত আছে ও, খুব সম্ভব লুকিয়ে আছে কোথাও।’

‘এরা কোনরকম সাহায্য করবে না অনিলকে?’ নিজের হাতের দিকে চেয়ে বললেন বৃদ্ধা।

‘মনে হয় না। আমিও যেন কোনরকম সাহায্য করতে না পরি, সেজন্যে অনিলের ব্যাপারে খোঁজ খবর করতে দেখেই এরা ঢাকায় আমার হেড অফিসের সাথে যোগাযোগ করেছে। আমার ওপর হুকুম হয়েছে যেন নিজের কাজ সেরে ফিরে আসি। যেন অনিলের ব্যাপারে নাক না গলাই।’

‘এ রকম ব্যবহারের নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে? আমার পিছনেও পুলিস লাগানো হয়েছে। তোমার কি মনে হয় অনিল এদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?’

‘আমি আপনার কাছে এসেছি আজ বিশেষ করে এই কথাটাই জানাবার জন্যে।’ সরাসরি চাইল রানা বৃদ্ধার মুখের দিকে। ‘অনিলকে আমার চেয়ে অনেক ভাল করে চেনেন আপনি। আপনার কি মনে হয় ওর দ্বারা একাজ করা সম্ভব?’

থমকে গেলেন বৃদ্ধা কয়েক সেকেন্ড।

‘বড় কঠিন প্রশ্ন করলে, বাবা। কোন মাকে তার নিজের ছেলের সম্পর্কে এ প্রশ্ন করতে নেই। তবু তুমি যখন জানতে চাইছ, আমি সততার সাথে তোমার এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করব।’ খানিকক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলেন বৃদ্ধা মাথা নিচু করে, তারপর চাইলেন রানার চোখে। ‘না। একাজ অনিলের পক্ষে অসম্ভব। ও যে পরিবারের ছেলে, যে আদর্শের ছত্রছায়ায় মানুষ হয়েছে, কখনোই ও একাজ করতে পারে না।’

মস্ত বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। ‘আপনি বাঁচালেন আমাকে। কথা যখন দিয়েছিলাম, আমার সাধ্যমত করতে আমাকে হতই। কিন্তু এখন জানলাম, আমি অন্যায় কিছু করছি না, সত্যের জন্যেই কাজ করছি। দ্বিধা রইল না আর।’

‘আমার কথা বিশ্বাস করলে তুমি?’

‘নিশ্চয়ই।’

‘এরা বাধা দেবে তোমাকে, সাহায্য করতে চাইলে। তাছাড়া

তোমার হেড আপিসের হুকুম...’

‘অমান্য করব।’ হাসল রানা। ‘আমাকে আমার অফিস সে লাইসেন্স দিয়েছে। ওদিক থেকে কোন অসুবিধে হবে না।’

‘এদিক থেকে?’

‘হতে পারে। আবার না-ও হতে পারে। আগে থেকে কিছুই বলা যাচ্ছে না। যা হয় হবে।’

‘ভারতের হয়ে অনিল যে কাজ করত, তুমি কি বাংলাদেশের হয়ে সেই কাজই করো, বাবা?’

একটু থমকে গেল রানা। তারপর হাসল।

‘অনেকটা। হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?’

‘সেজন্যেই তোমার সাহায্য চেয়েছিল অনিল। বুঝতে পারছি। কাজটা যে অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাও বুঝতে পারছি। হঠাৎ মনে হচ্ছে, স্বার্থপরের মত কাজ করছি না তো আমি? নিজের ছেলেকে সাহায্য করার জন্যে আরেকজনের ছেলেকে অনুরোধ করছি বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে, সেটা কি উচিত হচ্ছে? আমার কাছে অনিল যতটা মূল্যবান, তোমার মায়ের কাছে তুমি তার চেয়ে কোন অংশে কম মূল্যবান নও, বাবা।’

হেসে ফেলল রানা। ‘ও, এই কথা? এ নিয়ে কিচ্ছু ভাববেন না আপনি। আমার মা-ই নেই, তার আবার মূল্য! কোন মূল্য নেই আমার।’

রানার হাসি মুখের দিকে চেয়ে হাসি হাসি হয়ে উঠেছিল বৃদ্ধার মুখটাও, কথা শুনে মিলিয়ে গেল হাসিটা। অদ্ভুত একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বেপরোয়া ছেলেটার দিকে। কথা বলেই চলল রানা।

‘অনিলের বিরুদ্ধে কি প্রমাণ রয়েছে এদের হাতে জানা নেই আমার। কেউ কোন কথা বলছে না। সব জায়গাতেই ঢাক ঢাক গুড় গুড়। এখন একমাত্র উপায় দেখছি ভেনিসে গিয়ে খোঁজ খবর

করা। কাল রওনা হচ্ছি আমি ভিয়েনার উদ্দেশ্যে। ঠিক তিনদিন পর পৌঁছব ভেনিসে। ওখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ খবর শুরু করব আমি। ওখানে ওর পরিচিতদের দু'একজনের নাম বলতে পারবেন?'

খানিক চিন্তা করে বললেন বৃদ্ধা, 'ঠিক মনে তো পড়ছে না, বাবা। একটু বসো, আমি অনিলের কয়েকটা চিঠি নিয়ে আসি। জুলি মাযিনি বলে একটা মেয়ের কথা প্রায় চিঠিতেই লিখত। আসছি।'

চিঠিগুলি ঘেঁটে জানা গেল সান মার্কোর কাছে একটা গ্লাসফ্যাক্টরিতে কাজ করে মেয়েটা। মালিকের নাম গিয়াকোমো পাসেল্লী। ওখানে যাতায়াত ছিল অনিলের। আঁচ করা গেল মেয়েটার ব্যাপারে কিছুটা দুর্বলতাও হয়তো ছিল। আরও জানা গেল ভেনিসে গেলে মডার্নো হোটেলে উঠত সে। রিয়াল্টো ব্রিজের কাছাকাছি কোথাও হোটেলটা। এছাড়া আর বিশেষ কিছুই নেই চিঠিতে।

'আচ্ছা, বছর খানেকের মধ্যে তোলা অনিলের একটা ছবি দিতে পারবেন?'

'আছে।'

উঠতে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধা, রানা বলল, 'আর একটা কথা, ইচ্ছে করলে ছেলেকে একটা চিঠি দিতে পারেন। ওকে যদি খুঁজে পাই, আপনার লেখা একটা চিঠি পেলে খুবই ভাল লাগবে ওর।'

টলমল করে উঠল বৃদ্ধার চোখ দুটো, কিন্তু উঠে দাঁড়ালেন সামলে নিয়ে। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'বড় ভাল ছেলে তুমি, বাবা। সমুদ্রের মত বিরাট তোমার মনটা। ধন্য তোমার স্বর্গবাসিনী মা!'

দশ মিনিট পর চিঠি আর ফটোগ্রাফ পকেটে পুরে উঠে দাঁড়াল রানা। মৃদু হেসে বিদায় নিল। কিছুটা হেঁটে বাগবাজার স্ট্রীটে উঠে ট্যাক্সি নিল। ড্রাইভারকে বলল, 'সোজা চলো কন্টিনেন্টাল

হোটেলে।'

রঞ্জন চৌধুরীর কথাগুলো মনে এল রানার। নিজের পায়ে কুড়োল মেরেছে অনিল। এখন আর কারও কিছুই করবার নেই। অনিল যা করেছে সেটা করার আগে তার একবার মায়ের কথা ভাবা উচিত ছিল।

কি করেছে অনিল?

চার

সান ম্যারিয়া ডি লা স্যালুটের গম্বুজের পেছনে ডুবে যাচ্ছে সূর্যটা। গ্র্যান্ড ক্যানেলের নীলাভ জলে হাল্কা গোলাপী আলোর ঝিলিমিলি। অপূর্ব।

একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ভাবছে রানা। ভেনিসে পৌঁছেই টের পেয়েছে সে, কি অসম্ভব দুঃসাধ্য কাজে হাত দিয়েছে সে এবার। একটা ফটোগ্রাফ, একটা মেয়ের নাম, একজন কাঁচ ব্যবসায়ীর নাম, আর একটা হোটেলের ঠিকানা—এই রানার সম্বল। গিজগিজ ট্যুরিস্টে ঠাসা এই বন্দর নগরীতে এত সামান্য তথ্যের ভিত্তিতে কাউকে খুঁজে বের করা খড়ের গাদায় সুঁই খোঁজার চেয়েও দুঃসাধ্য। সে সুঁই যদি ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে বেড়ায় তাহলে তো আরও।

যাই হোক, কাজ শুরু করে দিলে দেখা যাবে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে গ্লাস ফ্যাক্টরিতেই যাবে বলে ঠিক করেছে রানা। মেয়েটাকে পেলে তার কাছ থেকে হয়তো কিছু জানা যাবে।

দুই হাতে দু'কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল গিলটি মিঞা। রানার হাতে একটা কাপ ধরিয়ে দিয়ে ফড়াৎ করে চুমুক দিল নিজের কাপে।

'শহরটা নেহাত মন্দ নয়, কি বলেন, স্যার? অবশ্য ক্যালক্যাটার পায়ের কাচেও লাগে না। একটু পয়-পরিষ্কার, এই যা। মানুষগুনোও ফর্সা। তবে লাজলজ্জার বালাই নেই, রাস্তায় ডেঁড়িয়ে ব্যাটাছেলে মেয়েছেলেতে চুমু খায়। বিচ্ছিরি কারবার!'

'এই দুদিন খাওয়া-দাওয়া কোথায় করেছ?'

'উই উদিকের এক হোটেলে। ছোঃ! এক্কেবারে যাতা। মুকে দোয়া যায় না। বললুম একপ্লেট গরম ভাত আর একবাটি সর্ষেইলিশ লিয়ে এসো—পরিষ্কার বাংলা কতা বোজে না শালারা, কি সব কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং লিয়ে এল। ওসব কি খাবার হলো? আশেপাশের টেবিলে দেকি তাই গিলচে সবাই গোগ্রাসে। ধরতে গেলে দুটো দিন প্রায় খালি পেটেই আচি স্যার, পানি খেয়ে ভরিয়ে রেকেচি পেটটা টই-টম্বুর করে। একটু নড়লেই ঢক-ঢক করে।'

'শহরের গলিঘুঁজি সব চিনে নিয়েছ?'

'চিনে লিয়েচি মানে? মুখস্ত করে লিয়েচি। যেখানে খুশি লিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিন না, গুট-গুট করে হেঁটে ফিরে আসব এই বাসায়। গাড়ি ঘোড়াও নেই যে চাপা পড়ে মারা যাব।'

ভিয়েনায় পৌঁছেই এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে রানা গিলটি মিঞাকে একটা ছোটখাট বাড়ি ভাড়া নিয়ে ঘুরে ফিরে শহরটা দেখে তৈরি হয়ে থাকার জন্যে। ওকে বিদেশে আনার আসল উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েনা সম্মেলনে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে সেটা দেখানো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা বিভাগের নব আবিষ্কৃত আধুনিক কলাকৌশল ব্যাখ্যা করে দেখানোর কথা ছিল প্রদর্শনীতে। রানা-এজেন্সির প্রধান সহকারী হিসেবে এসব গিলটি মিঞার কাজে লাগবে মনে করে নিয়ে এসেছিল রানা ওকে সঙ্গে করে। এসব ছাড়াই অবশ্য আশ্চর্য প্রতিভা বলে কয়েকটা জটিল কেসের সমাধান করে গিলটি মিঞা

ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে ফেলেছে, তবু বিদেশের কলাকৌশলের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে অনেক উপকার হত ওর, উৎসাহিতও হত—কিন্তু কি একটা গোলমাল বাধায় প্রদর্শনীর পরিকল্পনা বাদ দিতে হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। তাই পাঠিয়ে দিয়েছে ওকে রানা ভেনিসে। বাংলা ছাড়া আর কোন ভাষা জানা নেই গিলটি মিঞার, আকারে ইঙ্গিতে কিভাবে কি বুঝিয়েছে কে জানে, লাইবেরিয়া ভেচিয়ার কাছে গ্র্যান্ড ক্যানেলের ধারে স্যান জর্জিও দ্বীপপুঞ্জের দিকে মুখ করা চমৎকার একটা ছোট্ট বাড়ি ভাড়া করে দিব্যি গ্যাঁট হয়ে বসে আছে সে এখানে। ঘণ্টাখানেক আগে পৌঁছেচে রানা, স্নান সেরে কাপড় পরে তৈরি হতে না হতেই চা করে এনেছে গিলটি মিঞা।

চা শেষ করে কাপটা নামিয়ে রাখল রানা একটা টেবিলের ওপর।

'কোতাউ চললেন নাকি, স্যার?' রানাকে মাথা নেড়ে সায় দিতে দেখে বলল, 'তা খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্তা করা যায়? আপনি ওসব ছাইপাঁশ খাবেন, না দুটো চাল ফুটাব? সারা শহর ঘুরে খুঁজেপেতে বাজার করে এনেচি আজ।'

'ওসব থাক, আমি ঘুরে আসছি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই। তারপর তোমাকে নিয়ে গিয়ে একটা হোটেলে বাঙালী খাওয়া খেয়ে আসব। ততক্ষণ ওই রাস্তার পাশে ফলের দোকান থেকে কিছু ফলমূল কিনে এনে খাও।'

বেরিয়ে পড়ল রানা। ভিড় ঠেলে এগোল পিয়াযা সান মার্কোর দিকে। ডি ফ্যাব্রি গলি দিয়ে শর্টকাট করল রানা রাস্তাটা। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পেয়ে গেল গিয়াকোমো পাসেল্লীর ফ্যাক্টরি। সরু লম্বা দোকানটা, ঝকমক করছে বিচিত্র ডিজাইনের অসংখ্য জিনিসপত্রে। পায়ে পায়ে ভিতরে ঢুকে এল রানা। ছাতে ঝুলছে সারি সারি ঝাড়বাতি, শো-কেসে রঙবেরঙের কাঁচের

আসবাব, খেলনা, পুতুল। বেশির ভাগই ঘর সাজাবার সরঞ্জাম। উজ্জ্বল আলোয় ঝিকমিক করছে পুরোটা দোকান।

দোকানের শেষের দিকে একটা লম্বা বেঞ্চে বসে কাজ করছে কালো ইউনিফরম পরা তিনজন মেয়ে কর্মচারী। তিনটে গ্যাসবার্নার জ্বলছে তিনজনের সামনে, রঙিন কাঁচের লম্বা রড আগুনে গলিয়ে চমৎকার ছোট ছোট জন্তু জানোয়ার তৈরি করছে ওরা ব্যস্ত হাতে। অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ওদের দক্ষ হাতের দ্রুত কাজ দেখল রানা।

একটা মেয়ে চোখ তুলে দেখল রানাকে। কালো ডাগর দুই চোখ স্থির হয়ে রইল রানার চোখের ওপর তিন সেকেন্ড, তারপর আবার ব্যস্ত হয়ে গেল কাজে। ক্যাঙারু তৈরি করছে মেয়েটা একটার পর একটা। হাতের ক্যাঙারুটা ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে নামিয়ে রেখে আবার চাইল মেয়েটা রানার চোখের দিকে। এই কি জুলি মাযিনি? প্রশ্ন করতে গিয়েও সতর্ক হয়ে গেল রানা। মেয়েটার চোখে কি সতর্কবাণী দেখতে পেল সে? ভুরু জোড়া একটু কাঁপল বলে মনে হলো না? দৃষ্টিটা সরে গেল। একটা লাল কাঁচের রড হাতে তুলে নিয়ে বার্নারের আগুনে নরম করল, তারপর আশ্চর্য ক্ষিপ্র হাতে ওটা বাঁকিয়ে একটা ডিজাইন তৈরি করল তিন সেকেন্ডের মধ্যে। ধক করে উঠল রানার বুকের ভেতরটা, যখন দেখল বাঁকাচোরা ডিজাইনের ঠিক মাঝখানটায় পরিষ্কার বাংলা লেখা আছে—অনিল। একটা লতা এঁকেবেঁকে জড়িয়ে ধরে আছে প্রত্যেকটা শব্দকে, কিন্তু লেখাটা পড়তে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। দুই সেকেন্ড, তারপরই আগুনের ওপর একবার বুলিয়ে নিয়ে ওটাকে ক্যাঙারুতে পরিণত করল মেয়েটা দশ সেকেন্ডে। ব্যাপারটা এতই দ্রুত ঘটে গেল যে হঠাৎ রানার মনে হলো চোখের ধাঁধা নয়তো? ঠিকই দেখেছে সে অনিলের নাম?

যাই হোক, একটা ব্যাপার বুঝতে ভুল করল না রানা, মেয়েটাকে সে চিনতে পেরেছে এরকম কোন আভাস দেয়া চলবে না এখন।

‘আপনাকে কি সাহ্যায্য করতে পারি?’

তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠস্বরে চমকে গিয়ে পাশ ফিরল রানা। লম্বা একজন ইটালিয়ান। পিঠটা সামান্য কুঁজো, শরীরের ওপরের অংশটা ঝুঁকে আছে সামনে, তবু রানার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি বেশি লম্বা লোকটা। তেমনি চিকন। নাকটা চিলের চঞ্চুর মত বাঁকানো। সরু গোঁফ, তার নিচে ঝকঝক করছে সাদা দাঁত ব্যবসায়ীসুলভ বিনীত হাসিতে। ‘কি চাই আপনার?’

‘একটা ঝাড়বাতি কিনতে চাই।’

‘বেশ তো, আসুন না এদিকে। কয়েক রকম ডিজাইন দেখাচ্ছি, যেটা পছন্দ হয় নেবেন।’

লোকটার সঙ্গে একটা ছোট্ট অফিসরূমে এসে ঢুকল রানা। রানাকে বসিয়ে একটা ডিজাইনের খাতা ওল্টাতে শুরু করল লোকটা ব্যস্ত হাতে।

‘আপনিই কি সিনর গিয়াকোমো পাসেল্লী?’

থেমে গেল ব্যস্ত হাতটা। পরমুহূর্তে আবার চালু হলো।

‘আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার দোকানের সুনাম করেছে বুঝি কেউ?’

‘হ্যাঁ। আমার এক বন্ধু। আপনারও বন্ধু।’

‘তার নামটা, সিনর?’ ঝাড়বাতির কয়েকটা ডিজাইন খাতা থেকে বের করে এগিয়ে ধরল গিয়াকোমো রানার দিকে হাসিমুখে।

রানার চোখ দুটো স্থির হলো গিয়াকোমোর মুখে। বলল, ‘অনিল চ্যাটার্জী।’

একটু যেন চমকে উঠল লোকটা। হাসিটা জমে গেল বরফের মত। ভাবলেশহীন রক্তশূন্য মুখ। হাত থেকে খসে পড়ে গেল

কয়েকটা ডিজাইন। নিচু হয়ে ঝুঁকে তুলছে সে ওগুলো মাটি থেকে। অবাক হলো রানা লোকটার প্রতিক্রিয়া দেখে। অনিলের নাম শুনেই এমন আঁৎকে উঠল কেন লোকটা?

যখন সোজা হলো লোকটা তখন আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে মুখটা। ফিরে এসেছে প্র্যাকটিস করা হাসি। বলল, 'আচ্ছা! সেই ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক? হ্যাঁ। উনি আমাদের গুণগ্রাহীদের একজন। খুবই মিষ্টভাষী ভদ্রলোক। তা বহুদিন ওঁর সঙ্গে দেখা নেই, আছেন কোথায় উনি?'

'এখন কোথায় আছেন জানি না। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বেশ কয়েক মাস আগে যখন ভারতে গিয়েছিলাম, তখন। ভেনিসে বেড়াতে আসব শুনে আপনার ঠিকানাটা দিলেন, বললেন উনিও এই সময়ের দিকে ভেনিসে থাকবেন, কিন্তু কোন্ ঠিকানায় থাকবেন সেটা আপনাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারব। আপনি জানেন না কোথায় আছেন উনি?'

'না তো!' রানা বুঝল পরিষ্কার মিথ্যে কথা বলছে লোকটা। বলল, 'সিনর চ্যাটার্জী হয়তো প্ল্যান পরিবর্তন করেছেন, এমনও হতে পারে। আমার মনে হয় কয়েক মাসের মধ্যে ভেনিসে আসেননি উনি। বহুদিন দেখা নেই আমাদের।' হঠাৎ সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসল লোকটা, 'আপনি কি ভারতীয় নন?'

'না। আমি বাংলাদেশের লোক।'

একটু যেন স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল গিয়াকোমোর মুখে। একটা ডিজাইন পছন্দ করল রানা, কোথায় পাঠিয়ে দিতে হবে সে ঠিকানা দিল, তারপর বেরিয়ে এল অফিস কামরা থেকে। পিছু পিছু এল লম্বা লোকটা।

থেমে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'ওর তো আরও বন্ধুবান্ধব আছে ভেনিসে, তাদের দু'একজনের ঠিকানা দিতে পারবেন?'

মাথা নাড়ল গিয়াকোমো। 'এই দোকানে মাঝে মাঝে

আসতেন বলেই যা পরিচয়, অন্যান্য বন্ধুর কথা আমি কিছুই বলতে পারছি না। দুঃখিত।'

হেসে ফেলল রানা। 'না, না। অত দুঃখ পাওয়ার কি আছে? যদি এর মধ্যে এসে হাজির হয় তাহলে আমার ঠিকানাটা ওকে দিলে সুখী হব। হপ্তাখানেক আছি ভেনিসে।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

রানা চেয়ে দেখল তেমনি ব্যস্ত ভাবে কাঁচের খেলনা তৈরি করে চলেছে ওরা তিনজন। কেউ মুখ তুলে চাইল না। ওদের দিকে ইঙ্গিত করে রানা বলল, 'বেশ রাত পর্যন্ত কাজ হয় বুঝি আপনার এখানে?'

'হ্যাঁ। সিজন চলছে কিনা, এগারোটার সময় বন্ধ করি আজকাল।'

'ও বাবা! অনেক রাত। তখন আমি হয়তো ফ্লোরিয়ানে ক্যাবারে দেখছি।' মেয়েটি যাতে শুনতে পায় সেজন্যে গলাটা একটু চড়িয়ে দিল রানা শেষের দিকে। 'আচ্ছা, চলি, আবার দেখা হবে।'

চোখ না তুলেই ছোট্ট করে একটু মাথাটা নাড়ল মেয়েটা। ইঙ্গিতটা এতই অস্পষ্ট যে ওর বক্তব্য বুঝতে পারল কিনা ভাল করে ঠাহর করতে পারল না রানা। গিয়াকোমোর প্রতি ছোট্ট একটা নড করে বেরিয়ে পড়ল দোকান থেকে।

বিশেষ কিছুই জানা যায়নি, কিন্তু খেলার প্রথম চালটা দিয়েছে সে। দেখা যাক এখন কি হয়। মেয়েটার গোপনীয়তার মানে কি? গিয়াকোমো কি প্রতিপক্ষের লোক? ইচ্ছে করেই ওকে নিজের ঠিকানাটা দিয়ে এসেছে সে। এতে বিপদের আশঙ্কা আছে ঠিকই, কিন্তু দ্রুত কাজ সারতে হলে নিজেকে প্রকাশ করতে হবে শত্রুপক্ষের সামনে, এছাড়া কোন উপায় নেই। রানা এক চাল দিয়েছে, এখন ওদের চালের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

মডার্নো হোটেলেও একটু খোঁজ খবর করে বাসায় ফিরবে ঠিক করল রানা। সেখানেও হয়তো যোগাযোগ হয়ে যেতে পারে কারও সঙ্গে।

ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগোচ্ছে রানা। ফ্যাক্টরির দরজায় এসে দাঁড়াল গিয়াকোমো। কালো হ্যাট, কালো স্যুট পরা মোটাসোটা একজন বেঁটে লোককে আবছা একটা ইঙ্গিত করল সে। একটা দোকানের শো-কেসের সামনে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দাঁত খুঁটছিল লোকটা, ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র চলতে শুরু করল রানার পিছু পিছু।

ফনডামেন্টার কাছে ক্যানালের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে ছিল একজন সাদা স্যুট ও সাদা হ্যাট পরা একহারা, লম্বা লোক। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বুড়ো আঙুল দিয়ে রানাকে দেখাল বেঁটে লোকটা। তন্দ্রালু দৃষ্টিতে দেখল লোকটা রানাকে, তারপর আড়মোড়া ভেঙে হাঁটতে থাকল পিছন পিছন।

এসবের কিছুই টের পেল না রানা। উদ্বিগ্ন চিত্তে হাঁটছে সে মর্ডানো হোটেলের দিকে।

পাঁচ

এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিটে পৌঁছল রানা ফ্লোরিয়ানে। এত রাতেও লোকজনের কমতি নেই। জায়গা পাওয়া মুশকিল। তার ওপর ক্যাবারে দেখতে গেলে একেবারে ভিতরে ঢুকতে হয়, ওখান থেকে চত্বরের দিকে লক্ষ রাখা যাবে না।

ঘুরে ফিরে দেখে কাফেতে একটা খালি টেবিল পেয়ে বসে পড়ল রানা। ক্যাবারের বাজনা ভেসে আসছে কানে, বিচিত্র সব ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে দেশ-বিদেশের ট্যুরিস্টরা, দূর থেকে স্টীমার আর লঞ্চের ভেঁপু ভেসে আসছে মাঝে মাঝে

এইসব বিশৃঙ্খখল শব্দ ছাপিয়ে। সবটা মিলিয়ে এক মহা জগাখিচুড়ি। এক পেগ ব্র্যান্ডির অর্ডার দিয়ে টেবিলের নিচ দিয়ে লম্বা করল রানা পা দুটো। সিগারেট ধরাল একটা।

মর্ডানো হোটেলে কিছুই জানা যায়নি। অনিলকে চিনতে পারল ম্যানেজার, কিন্তু কোন খোঁজ দিতে পারল না ওর। এ-ও বলল, ভেনিসে এলে ওর হোটেল ছাড়া কোথাও উঠবে না অনিল চ্যাটার্জী—যখন উঠেনি, তার মানে সে ভেনিসে আসেনি।

অথচ রানা জানে ভেনিসেই আছে অনিল। কার্ড জাল হলে অবশ্য অন্য কথা, কিন্তু ওটা জাল নয় বলেই ওর ধারণা। তাই যদি হবে তাহলে সরাসরি অরুণা চ্যাটার্জীর ঠিকানায় পাঠানো হলো না কেন সেটা? কেন মামা বাড়ির ঠিকানায় পাঠানো হলো এস.ও.এস? কেন রানার সাহায্য চাওয়া হলো?

যাই হোক, সবকিছু নির্ভর করছে এখন এই কাঁচ ফ্যাক্টরির মেয়েটার ওপর। মেয়েটা যদি আসে, এসে পৌঁছলেই অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাইরে পিয়াযার দিকে চেয়ে খুঁজল রানা মেয়েটাকে জনারণ্যে। বুঝতে পারল এই ভিড়ে মেয়েটাকে খুঁজে বের করা ওর পক্ষে অসম্ভব। ওকেই খুঁজে নিতে হবে মেয়েটার। ক্যাবারের কথা বলে এসেছে সে, সেখানে ঢোকার মুখে পাহারায় বসে আছে সে দারোয়ানের মত। এখন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই ওর।

পাশের টেবিল ছেড়ে উঠে গেল একজন গর্দান মোটা বেঁটে লোক বিল চুকিয়ে দিয়ে।

সাদা স্যুট ও সাদা হ্যাট পরা একজন লম্বা লোক একটা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বসল খালি টেবিলটায়। এক পেগ হুইস্কি অর্ডার দিয়ে সান্ধ্য পত্রিকা মেলে ধরল সামনে অলস ভঙ্গিতে।

ভুরু জোরা সামান্য কুঁচকে গেল রানার। মর্ডানো হোটেল

থেকে বেরোবার সময় লোকটাকে দেখেছে না সে? হঠাৎ মনে পড়ল গিলটি মিঞাকে নিয়ে খাওয়া সেরে বাসায় ফিরবার সময়ও একটা ব্রিজের ওপর দেখেছে সে লোকটাকে এক নজর। এখানেও সেই একই লোক। ব্যাপার কি? অনুসরণ করছে? চেহারাটা একটু ভাল করে দেখে রাখা দরকার। সামান্য একটু কাত হয়ে বসল রানা যাতে অলক্ষ্যে লক্ষ্য করা যায় লোকটাকে।

লম্বা একহারা চেহারা, কিন্তু এক নজরেই বুঝল রানা প্রয়োজনের সময় দুর্ধর্ষ হয়ে উঠতে পারে এই লোকটা। একেবারে পেটা শরীর। শক্ত চোয়াল, ধূর্ত চোখ। হাতের কব্জি দেখলেই বোঝা যায় অসুরের শক্তি আছে লোকটার গায়ে। সেই সঙ্গে রয়েছে চিতাবাঘের দ্রুততা।

সতর্ক হয়ে গেল রানা। কড়া মাল। বেকায়দা অবস্থায় এর হাতে পড়লে দুঃখ আছে কপালে।

পিয়াযার দিকে চোখ বুলাল রানা আবার। ঘড়ি দেখল। সোয়া এগারোটা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই অর্ধেক পথ এসে গেছে মেয়েটা। পৌঁছে যাবে সাড়ে এগারোটার মধ্যেই। ফরমোজা গলি দিয়ে যদি শর্টকাট করে তাহলে পৌঁছবে পাঁচ মিনিট আগেই।

সাদা হ্যাট পরা লোকটা একবারও চাইল না রানার দিকে। একেবারে ডুবে আছে খবরের কাগজে। সন্দেহটা অমূলক কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আসতে শুরু করল রানার মধ্যে। মিছেমিছিই অতি সতর্ক হতে যাচ্ছে সে? হতে পারে আজ সন্ধ্যে থেকে বারতিনেক দেখেছে সে এই লোকটাকে অথবা এর মতই অন্য কোন লোককে। তাতে কি? একটা লোককে তিনবার দেখলেই ভয় পাওয়ার কি আছে? হয়তো ওই লোকটাও সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে ইতিমধ্যে রানাকে, তাই অত মনোযোগ দিয়ে পড়ছে খবরের কাগজ, ভাবছে, সন্ধ্যে থেকে তিন-তিন বার দেখা হলো কেন এই ব্যাটার সঙ্গে, গুণ্ডা বদমাশ নয়তো?

যাই হোক, সাবধানের মার নেই। ঠিক এগারোটা পঁচিশ মিনিটে বিলের জন্যে ডাকল রানা বেয়ারাকে। বিল এবং টিপ্‌স্ দিয়ে সহজ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল।

রানার এই উত্থানে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না লোকটা। বেয়ারার দিকে চেয়ে খালি গ্লাসটা নাড়ল, আর এক পেগ হুইস্কির অর্ডার দিল।

ঠাসাঠাসি করে রাখা টেবিল চেয়ারের গায়ে ধাক্কা না দিয়ে অতি সাবধানে বেরিয়ে এল রানা কাফে থেকে এঁকেবেঁকে। বাইরে বেরিয়ে একটা থামের আড়ালে এমন ভাবে দাঁড়াল যেন কাঁচের জানালা দিয়ে সাদা হ্যাট পরা লোকটার গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়।

ভ্রূক্ষেপও করল না লোকটা। একবার চেয়েও দেখল না কোন্ দিকে গেল রানা। এমন মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে যে মনে হয় এটাই তার একমাত্র নেশা ও পেশা, এরই ওপর নির্ভর করছে ওর জীবন-মরণ। সন্দেহ প্রশমিত হলো রানার।

বেশ কিছুটা দূরে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে রানার দিকে চেয়ে রয়েছে একজন কালো হ্যাট, কালো স্যুট পরা মোটাসোটা বেঁটে লোক।

রানার দৃষ্টিটা ছুটে বেড়াচ্ছে পিয়াযার জনারণ্যের ওপর।

হতাশ হয়ে পড়তে যাচ্ছিল রানা, এমনি সময় দেখতে পেল মেয়েটাকে। একটা আলোকিত দোকানের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা রানার দিকে চেয়ে। সেই কালো ইউনিফর্মটাই পরে আছে, কিন্তু মাথায় একটা স্কার্ফ এমন ভাবে জড়িয়েছে যেন মুখের খানিকটা অংশ ঢাকা পড়ে। তবু চিনতে কষ্ট হলো না রানার, এ মেয়ে সেই মেয়েই। ফিগারটা দেখে মনে মনে অনিলের রুচির প্রশংসা না করে পারল না সে।

ভিড় ঠেলে এগোতে শুরু করল রানা। বেশ কিছুদূর এগিয়ে একবার পেছন ফিরে তাকাল। যেন ওর গতিবিধির প্রতি কোন

লক্ষই নেই লোকটার, তেমনি নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে ডুবে আছে খবরের কাগজে। সন্দেহটা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল ওর।

বেঁটে লোকটাও দেখতে পেল মেয়েটাকে। একটু ঘুরে রওয়ানা হলো সে মেয়েটার দিকে। যেদিকটায় ভিড় কম সেদিকটা বেছে নিয়েছে সে, ফলে সে যে মেয়েটার দিকে এগোচ্ছে সেটা বোঝার উপায় নেই, তার ওপর ভিড় হালকা বলে রানার আগেই পৌঁছে যেতে পারবে সে মেয়েটার পেছনে।

এক মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটা। রানা ত্রিশ গজের মধ্যে এসে পড়তেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে মার্সেরিয়ার দিকে হাঁটতে শুরু করল সে।

রানা চলল পেছন পেছন।

বেঁটে মোটা লোকটা কমিয়ে দিল চলার গতি। রানার থেকে বেশ কিছুটা ডাইনে এবং কয়েক হাত পেছনে চলল সে।

খবরের কাগজের আড়াল থেকে দেখল লম্বা লোকটা, চলে যাচ্ছে রানা। বিল চুকিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। কাফে থেকে বেরিয়েই আঁচ করে নিল সে, কোন্‌দিকে চলেছে রানা। পেছনে পেছনে অনুসরণ না করে সোজা বাঁ দিকে রওয়ানা হলো, যাতে ঠিক সময় মত ওদের কাছাকাছি পড়া যায় বড় রাস্তায়।

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা মেয়েটাকে। একবারও পিছু ফিরে না চেয়ে হেঁটে চলেছে মেয়েটা। রানা ওকে ওভারটেক করবার চেষ্টা করল না। মেয়েটার সমান গতিতেই এগোচ্ছে সে। কারণ মেয়েটা ইচ্ছে করলেই থেমে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারে, তা যখন করছে না তখন নিশ্চয়ই সে চায় না, রানার সঙ্গে তার এই ব্যস্ত রাজপথে দেখা হোক। যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকে যাওয়াই ভাল।

আলোকোজ্জ্বল দোকান-পাটগুলো ছাড়িয়ে কিছুদূর এগিয়েই ডানদিকে একটা প্রায়ান্ধকার গলিতে ঢুকে পড়ল মেয়েটা। ঢুকে

পড়ল রানাও। বেশ কিছুদূর গিয়ে ঝট্ করে পেছনে ফিরল রানা একবার। কিন্তু তার আগেই সরে গেছে মোটা লোকটা একটা দেয়ালের আড়ালে। কান পেতে রানার পায়ের শব্দ শুনছে সে।

রানা বাঁয়ে মোড় নিতেই সাদা হ্যাট পরা লোকটা এগিয়ে এল।

'ওইদিক দিয়ে ঘুরে যাও তুমি,' বলল মোটা লোকটা। 'আমি যাচ্ছি পেছনে পেছনে।'

নিঃশব্দ পায়ে দৌড় দিল দু'জন দু'দিকে। সাদা হ্যাট পরা লোকটা রানা যে পথে চলেছে তার সমান্তরাল একটা গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল, ওদেরকে সামনে থেকে ধরার জন্যে।

মোড় নিয়েই দেখল রানা, গলিটা জনশূন্য। কেউ অনুসরণ করলে দূর থেকেই দেখা যাবে তাকে। বেশ কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে পদক্ষেপ দ্রুততর করল সে। ততক্ষণে আরেকটা মোড় ঘুরেছে মেয়েটা।

এই মোড়টা ঘুরেই দেখতে পেল রানা, কয়েক পা এগিয়ে থেমে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা ওর জন্যে।

'কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটা জানতে পারি?' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'মাসুদ রানা।' থেমে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল রানা। আপনি কে? জুলি মাযিনি?'

'হ্যাঁ।' অবাক হলো মেয়েটা সম্পূর্ণ অপরিচিত একজনের মুখে নিজের নাম শুনে। এদিক ওদিক চাইল। 'কেউ অনুসরণ করছে না তো আপনাকে, সিনর মাসুদ রানা?'

সাদা হ্যাট পরা লোকটার কথা মনে পড়ল রানার। একটু ইতস্তত করে বলল, 'মনে হয় না। অনিলের কি খবর? কোথায় আছে ও?'

'ভয়ানক বিপদের মধ্যে আছে অনিল। পাগলের মত খুঁজছে

ওরা ওকে। আপনাকেও খুব সাবধানে...'
'কারা?' প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রানা। 'কারা খুঁজছে ওকে?'
চট্ করে রানার হাত ধরল মেয়েটা। মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখটা।
'শুনতে পাচ্ছেন!'
কান খাড়া করল রানা। দ্রুত হালকা পায়ের শব্দ। যে গলিটা ছেড়ে ওরা এই গলিতে ঢুকেছে সেই গলিপথ ধরে এদিকে আসছে কেউ।
'আসছে!' চাপা ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল মেয়েটা। 'কে যেন আসছে এদিকে!'
'ভয় নেই,' বলল রানা। 'কেউ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অনিল কোথায়?'
'মনডোলো লেনের ৩৭ নম্বর...' আঁৎকে উঠে থেমে গেল জুলি। একজন কালো স্যুট পরা বেঁটেমত মোটা লোক এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।
রানার কব্জি খামচে ধরল মেয়েটা। বিবর্ণ মুখে একটা বাড়ির বারান্দার দিকে সরে গেল। রানাও সরল একটু লোকটাকে পথ করে দেয়ার জন্যে। গলিগুলো বড় বেশি সরু। ঢাকার তাঁতিবাজারকেও হার মানায়। রানা ভাবল, বহুদিনের পুরানো শহর বলেই হয়তো এ রকম।
কাছাকাছি এসেই হঠাৎ থেমে দাঁড়াল লোকটা। রানা প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় সদ্য প্যাকেট থেকে বের করা একটা সিগারেট দেখাল লোকটা ওকে। 'কিছু মনে করবেন না, সিনর। ম্যাচ আছে আপনার কাছে?'
'আছে।' লোকটাকে যত শীঘ্রি সম্ভব ভাগাবার জন্যে চট্ করে পকেটে হাত দিল রানা।

বিদ্যুৎবেগে এক পা এগিয়ে এল লোকটা, রানার হাতটা বের করে আনার আগেই প্রচণ্ড জোরে ঘুসি মারল রানার পেটে।
মুহূর্তের মধ্যে পেটের পেশীগুলো শক্ত করে না নিলে এই এক ঘুসিতেই লিভার ফেটে মারা যেতে পারত রানা। ব্যথায় কুঁচকে গেল রানার চোখ-মুখ, সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল শরীরটা। কিন্তু এক হাত পকেটে ভরা অবস্থাতেই দ্বিতীয় ঘুসি থেকে বাঁচার জন্যে ঝট্ করে মাথাটা সরিয়ে নিল সে একপাশে। থুতনি সই করে মারা ঘুসিটা চোয়ালে লেগে সাঁ করে বেরিয়ে গেল কানের পাশ দিয়ে।
বাঁ হাতে ঘুসি মারল রানা একটা। ঘুসিটা লাগল লোকটার পাঁজরের নিচে ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ বেরোল লোকটার মুখ দিয়ে। বেকায়দা অবস্থাতে চালানো রানার ঘুসির ওজন চমকে দিয়েছে ওকে। পিছিয়ে গেল এক পা। রানার ডান হাতটা বেরিয়ে আসছে কোটের পকেট থেকে, কাজেই আর কোন রকম সুযোগ না দেয়াই স্থির করল সে। দমাদম দুটো ঘুসি মারল রানার পাঁজরের উপর। এর কোন দরকার ছিল না, প্রথম ঘুসিতেই আসলে কাবু হয়ে গিয়েছিল রানা। টলটলায়মান অবস্থায় আরও দুটো ঘুসি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসল রানা, তারপর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। হাঁটুতে জোর নেই, ঠক-ঠক করে কাঁপছে পা দুটো। সেই অবস্থায় টের পেল পালিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা, দৌড়াচ্ছে প্রাণপণে।
দড়াম করে পড়ল শেষ ঘুসিটা চোয়ালের ওপর। মাত্র ছ'ইঞ্চি দূর থেকে মারা ঘুসিটা খেয়ে বন্ করে ঘুরে উঠল রানার মাথা। একরাশ সর্ষেফুল দেখা গেল। ছিটকে গিয়ে ওপাশের দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেলো রানা, তারপর ঝুপ করে পড়ে গেল মাটিতে। এবং জ্ঞান হারাল।

একটা সুরেলা নারী কণ্ঠ শুনে জ্ঞান ফিরল রানার।

'মারা গেছে নাকি মানুষটা?'

রানা অনুভব করল তার শরীরটা নেড়েচেড়ে দেখছে কেউ। একটা পুরুষ কণ্ঠ বলল, 'না, জ্ঞান হারিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করল রানা। মাথাটা এপাশ-ওপাশ নাড়ল বন্য জন্তুর মত। চোখ মেলল। দামী কাপড়-চোপড় পরা দুজন তরুণ-তরুণী। উদ্বিগ্ন দুজোড়া চোখ চেয়ে রয়েছে ওর মুখের দিকে। রানাকে চোখ মেলতে দেখে মনে হলো হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

'দয়া করে নড়াচড়া করবেন না এখন। এক আধটা হাড়গোড় ভেঙে গিয়ে থাকতে পারে।' নরম গলায় বলল লোকটা।

'না। ঠিকই আছি।' উঠে বসল রানা। চোয়ালটাতে হাত বুলাল। পাকস্থলীতে কেমন যেন একটা চাপা ব্যথা অনুভব করছে সে। কপালের একপাশ ফুলে আছে, টের পেল হাত দিয়ে ছুঁয়ে। ডান হাতটা ওপরে তুলল সে। 'একটু সাহায্য করুন।'

চট্ করে রানার হাত ধরল মেয়েটা। উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানাকে।

উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিতে খানিক সময় লাগল রানার। সারা শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে ফিরে আসছে আবার ওর শক্তি। গলিটার এপাশ থেকে ওপাশ চোখ বুলাল রানা একবার। তারপর বলল, 'নাহ্, কিছু হয়নি। ঠিকই আছি।' হাত-পা ঝাড়া দিল। 'কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন?'

'না। পথ হারিয়ে ঘুরছি আমরা। আপনার ওপর আর একটু হলে হুমড়ি খেয়েই পড়ছিলাম। সত্যিই ঠিক আছেন তো?'

'হ্যাঁ। কোন ভুল নেই তাতে। ধন্যবাদ।' পকেটে হাত দিল রানা। কোটের পকেট থেকে মানিব্যাগটা গায়েব। নিজের ওপরই চটে গেল রানা। এতবড় ভুল করল সে কি করে? সেই মেয়েটার

কপালে কি ঘটল কে জানে!

'ছিনতাই হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'সেই রকমই মনে হচ্ছে।'

রাগে ফেটে পড়ল মেয়েটার সঙ্গী। 'আশ্চর্য এই ইটালিয়ানগুলো! সব গুণ্ডা বদমাইশ। এখান থেকে সরে পড়া দরকার। আমরা হোটেল গ্রিটিতে উঠেছি। ইনি আমার ছোট বোন, লুইসা পিয়েত্রো। আমার নাম সিলভিও পিয়েত্রো। আমাদের যদি হোটেলে পৌঁছে দেন তাহলে দু'পেগ ভালো ব্র্যান্ডি খাওয়াতে পারি।'

'আহ্, সিলভিও, নিশ্চয়ই ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। আগে খানিকটা বিশ্রাম দরকার ওর।'

'না, ঠিক আছি।' মেয়েটার দিকে ছোট্ট একটু বো করল রানা। 'আমার জন্যে ভাববেন না। কোন অসুবিধে নেই এখন আর। আপনাদের রাস্তা চিনিয়ে দেব আমি, কিন্তু চেহারার যে হাল হয়েছে, এই অবস্থায় এখন হোটেলে না যাওয়াই ভাল। আমি বাসায় ফিরব। আমার নাম মাসুদ রানা।'

'মাসুদ রানা!' এক পা এগিয়ে এল মেয়েটা। রানার মুখটা পরখ করে দেখবার চেষ্টা করছে আবছা আলোয়। 'আমি তো চিনি আপনাকে! কোথায় যেন পরিচয় হয়েছিল আপনার সঙ্গে? ওমা, আজই তো আপনার সঙ্গে একই ট্রেনে ফিরলাম লিডো এয়ারপোর্ট থেকে। বান্ধবীকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম। আপনার পাশের সীটেই বসেছিলাম আমি। চিনতে পারছেন?'

রানার মনে পড়ল অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়ের পাশে বসে এসেছে সে লিডো থেকে ভেনিস। দু'এক টুকরো আলাপও হয়েছিল। কোন রকম ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করেনি সে কাজে আসছে বলে, কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করেছিল আশ্চর্য এক আমোঘ আকর্ষণে টানছে মেয়েটা ওকে। তাজা, উষ্ণ একটা আকর্ষণ আছে মেয়েটার

মধ্যে।

'চিনেছি এবার,' বলল রানা। 'কিন্তু আপনারা কি ইটালিয়ান নন?'

'বাবা ইটালিয়ান, কিন্তু মা ফরাসী। আমরা ফ্রান্সে মানুষ হয়েছি।' হাসল মেয়েটা। 'নব্বই ভাগ ফরাসী, দশ ভাগ ইটালিয়ান আমরা।'

'চলুন, এগোনো যাক,' বলল রানা। দুটোকে ভাগানো দরকার। ওর মাথায় একমাত্র চিন্তা এখন জুলি মাযিনি। কি হলো মেয়েটার? ধরা পড়ল শত্রুপক্ষের হাতে, নাকি কিছুক্ষণ আগের ব্যাপারটা সত্যিই একটা ছিনতাইয়ের ঘটনা? অনিলের সঙ্গে কোন যোগ নেই এর? কোন্‌টা ঠিক জানতে হবে রানাকে। খুব শীঘ্রি। 'আপনাদের বড় রাস্তায় তুলে দিয়ে যাই।'

উজ্জ্বল আলোয় এসে রানা দেখল, ভাই-বোনের প্রায় একই চেহারা। বোনের ওপর ভাইয়ের প্রভাব, না ভাইয়ের ওপর বোনের প্রভাব বোঝা গেল না। দুজনেই দেখতে ভাল। বাইশ থেকে সাতাশের মধ্যে বয়স। চকচকে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, মুখে কোমল একটা অমায়িক ভাব, সাজপোশাক সর্বাধুনিক, দামী।

হাত বাড়িয়ে দিল সিলভিও রানার দিকে। 'অসংখ্য ধন্যবাদ। ব্যাপারটা কি ঘটেছিল জানার জন্যে দারুণ কৌতূহল হচ্ছে। জানি জিজ্ঞেস করাটা অভদ্রতা, তাছাড়া এখন আপনার বিশ্রাম দরকার। পরে কোন একদিন যদি আপনার মুখে ঘটনাটা শুনতে পেতাম...'

'নিশ্চয়ই। আমি আছি আরও সাতদিন। এর মধ্যে একদিন আপনাদের হোটেলে গিয়ে শুনিয়ে আসব গল্পটা। ডেলা টলেটা বলে একটা প্যালাযোতে আছি আমি, স্যানসোভিনোর লাইবেরিয়া ভেচিয়ার কাছে। আপনারাও সময় পেলে একটা ফোন করে চলে আসতে পারেন যে কোন সময়। চলি এখন, কেমন?'

'আপনি দুর্দান্ত লোক, সিনর মাসুদ রানা,' বলল মেয়েটা।

'চোয়ালে-কপালে যে দাগ দেখছি তাতে আঘাতের পরিমাণ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। এতবড় আঘাত হজম করাটা সোজা কথা নয়!'

বিনীত হাসি হাসল রানা। 'ও কিছু নয়। অভিনয় করছি আসলে। বাসায় পৌঁছেই কান্নায় ভেঙে পড়ব। চলি, গুড বাই।'

দ্রুত পায়ে হেঁটে চলল রানা বাসার দিকে।

কলিংবেল টিপতেই দরজা খুলে দিল গিলটি মিঞা। অবাক হয়ে দেখল রানার বিধ্বস্ত চেহারা। এরকম মাঝেমধ্যে দেখে অভ্যাস আছে ওর। কোন প্রশ্ন করল না।

ঘরে ঢুকেই কাপড় ছাড়ল রানা প্রথমে। একটা নেভি ব্লু রঙের প্যান্ট, গাঢ় কালচে-সবুজ রঙের শার্ট, আর কালো চামড়ার জ্যাকেট পরল। জুতো জোড়া বদলে রবার সোলের একজোড়া মোকাসিন পায়ে দিল। সুটকেসের গোপন একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরোল একটা ফল্‌স্ ঘড়ি–ঘড়ির মত কাঁটা-ডায়াল সবই আছে কিন্তু ভিতরে কোন যন্ত্রপাতি নেই। ব্যান্ডটা খুললেই ভারী একটা ধারাল অস্ত্রে পরিণত হবে সেটা। একটা খাপে পোরা স্টিলেটো বেঁধে নিল রানা ডান ঊরুতে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে। প্যান্টের পকেটের নিচ দিকটায় সেলাই নেই, হাত ঢুকিয়ে অনায়াসে বের করে আনা যায় ছুরিটা দরকারের সময়। তালা খোলার জন্যে বার্গলার্স কিট বের করে রাখল রানা হিপ পকেটে। বাঁ পকেটে রাখল একটা শক্তিশালী টর্চ, ইচ্ছে করলে এর রশ্মিকে ছোট করে দশ ফুট দূরে একটা সিকির সমান আলো ফেলা যায়। হাজার লিরার গোটা কয়েক নোট শার্টের বুক পকেটে রেখে খাটের ওপর বসল রানা। সিগারেট ধরাল।

ধরে নিতে হবে, বেঁটে বক্সারটা অনিলের শত্রুপক্ষের কেউ। সাধারণ চোর বা গুণ্ডা হতে পারে, কিন্তু সতর্কতার খাতিরে ওকে বিরুদ্ধ-পক্ষের কেউ বলে ধরে নেয়া উচিত। তাহলে কি জুলি

মাযিনির পরিচয় জেনে গেছে ওরা? ধরে ফেলেছে ওকে? অত্যাচারের মুখে যা জানে বলে দিতে বাধ্য হবে জুলি তাহলে? ধরা পড়ে যাবে আত্মগোপনকারী অনিল?

নাহ্ বড় বোকামি হয়ে গেছে। আরও অনেক সতর্ক হওয়া উচিত ছিল ওর। কিন্তু অনুশোচনা করে কোন লাভ নেই। কিসের বিরুদ্ধে সতর্ক হবে সে? অচেনা শত্রুর কাছ থেকে সতর্ক থাকা যায় না। কাদের বিরুদ্ধে কি ধরনের ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়েছে অনিল, কে মিত্র, কে শত্রু কিছুই জানে না রানা—এই অবস্থায় কিভাবে সাবধান হবে সে?

তবে এবার আক্রমণ যেদিক থেকেই আসুক না কেন, অত সহজ হবে না ওকে কাবু করা। এখন একমাত্র ভয় পুলিসকে। এই সব যন্ত্রপাতি সহ পুলিসের হাতে ধরা পড়লে বারোটা বেজে যাবে ওর।

মনডোলা লেনের ৩৭ নম্বর বাড়ি—এর বেশি আর কিছুই জানা যায়নি মেয়েটার কাছ থেকে।

ওখানেই কি লুকিয়ে আছে অনিল? গলিটাই বা কোথায়? ভেনিসের অসংখ্য গলির কোন্‌টা মনডোলা লেন? কি করে খুঁজে পাবে রানা?

একটা ঘন ছাই রঙের শার্ট ও প্যান্ট পরে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে গিলটি মিঞা। প্রস্তুত। 'কোতাউ চললেন, স্যার? আমাকে নেবেন?'

রানা না নিলেও সে যে গোপনে অনুসরণ করবে ওকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মৃদু হেসে সায় দিল রানা। সুচইটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'বাতিটা নিভিয়ে দাও দেখি?'

ঘরটা অন্ধকার হয়ে যেতেই জানালার পাশে এসে দাঁড়াল রানা, পর্দাটা ফাঁক করল। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে রাস্তা।

রাত এখন সোয়া একটার কম নয়। কিন্তু এখনও দলে দলে

চলেছে ট্যুরিস্টরা সান মার্কোর দিকে। গতি অপেক্ষাকৃত শ্লথ, এই যা তফাৎ—লোকজন প্রচুর রাস্তায়।

মিনিট দুয়েক চেয়ে রইল রানা রাস্তার দিকে। তারপর এক টুকরো কঠোর হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। নিঃশব্দ, নিষ্ঠুর হাসি।

সান মার্কোর দিকে পিছন ফিরে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তন্দ্রালু, অলস দৃষ্টিতে ট্যুরিস্টদের দিকে চেয়ে রয়েছে একজন লম্বা লোক। পরনে তার সাদা স্যুট, সাদা হ্যাট।

ছয়

'মনডোলা গলিটা কোন্‌দিকে বলতে পারবে?'

'নিচ্চয়।' একগাল হাসল গিলটি মিঞা। 'ক্যাম্পো সান পোলোর কাচে।'

'সেটা কোথায়?'

'রিয়াল্টো ব্রিজের কাচে, স্যার। খালের ওপার। ভাঙাচোরা বাড়িঘর, নোংরা। তা ওদিকটাতেই চলেচেন বুজি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে একটা লোককে খসাতে হবে। সন্ধে থেকে পেছনে লেগে রয়েছে ব্যাটা।'

'সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন, স্যার। ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দেব শালাকে।'

'না। ক্যালকেশিয়ান ঘোলে চলবে না, ও ঢাকাই ঘোল খেতে চায়। যা করার আমিই করব। তোমাকে জানানোর উদ্দেশ্য হলো ওর উপস্থিতি টের না পাওয়ার ভান করতে হবে। ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না তুমি যে কেউ আমাদেরকে অনুসরণ করছে।'

'ঠিক আচে। তাই হবে। চলুন তাহালে রওনা দিই?'

পন্টি ডেলা প্যাগলিয়ার দিকে হাঁটতে হাঁটতে আড়চোখে দেখল রানা, থামের গায়ে ঠেলা দিয়ে সোজা হয়ে গেল লম্বা

লোকটা। আনমনে হাঁটছে ওদের পেছন পেছন।

'খুব সরু একটা গলিতে নিয়ে চলো দেখি প্রথমে। ব্যাটাকে খসাতে হবে আগে।'

বাঁ দিকের একটা গলিতে ঢুকে পড়ল গিলটি মিঞা। গোলক ধাঁধার মত গলিগুলো, একটা মিশেছে আরেকটায়, সেটা গিয়ে মিশেছে আরেকটায়, যেন শেষ নেই এর। রাস্তা নির্জন। একটা মোড় ঘুরেই পছন্দসই জায়গা পেয়ে গেল রানা। একটা বাড়ির তিন ফুট উঁচু বারান্দায় উঠে পড়ল সে। গিলটি মিঞাকে বলল, 'দুজনের পায়ের শব্দ করতে করতে এগিয়ে যাও।'

একগাল হেসে রওনা হলো গিলটি মিঞা। মিশে গেল সরু গলির প্রায়ান্ধকারে। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল রানা। ঠিক এক মিনিট পরই সাদা টুপি দেখা গেল।

সাবধানে মাথাটা সামনে বের করল অনুসরণকারী, কান পেতে শুনল পায়ের শব্দ, তারপর নিশ্চিন্ত মনে রওনা দিল গলিপথে।

দড়াম করে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি পড়ল লোকটার চোয়ালের ওপর। ভয়ানক ভাবে ঠুকে গেল মাথাটা পাশের দেয়ালে। এত জোরে শব্দ হলো যে ভয় পেল রানা খুলি ফেটে গেছে মনে করে। চট করে ধরে ফেলল লোকটার জ্ঞানহীন দেহটা, আস্তে শুইয়ে দিল মাটিতে।

নিঃশব্দ পায়ে ফিরে এল গিলটি মিঞা। মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি। 'বড় জবর মার মেরেচেন, স্যার। এক লাতেই কাত। পকেটে কিছু আচে কিনা দেকব?'

'দেখো।'

দ্রুত হাত চালিয়ে লোকটার সব পকেট সার্চ করল গিলটি মিঞা। কিছুই পাওয়া গেল না যা দিয়ে পরিচয় জানা যায়। বাঁ বগলের নিচে একটা খাপে পোরা থ্রোইং নাইফ। রক্তের চিহ্ন টের

পেল রানা ছুরির ব্লেডে।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। যতদূর মনে হচ্ছে, এখন ঘণ্টা খানেক নিশ্চিন্তে ঘুমোবে লোকটা।

'এবার চলো মনডেলোর দিকে। জলদি।'

মিনিট দশেক এ গলি ও গলি ধরে হাঁটার পর বড় রাস্তায় উঠল গিলটি মিঞা রানাকে নিয়ে। রানা দেখল সামনেই দেখা যাচ্ছে রিয়াল্টো ব্রিজ। মনে মনে গিলটি মিঞার গুণের প্রশংসা না করে পারল না সে। কিন্তু বড় রাস্তায় উঠে মিনিট তিনেক হাঁটার পরই কেমন যেন উসখুস শুরু করল গিলটি মিঞা। খানিক বাদে বলেই ফেলল, 'আরাকজন আচে বলে মনে হচ্চে, স্যার।'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'জানি। অত ব্যস্ত হয়ো না, এটারও ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

ব্রিজের মাঝামাঝি এসে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। জায়গাটায় বেশ ঘন ছায়া পড়ায় এটাই পছন্দ করল রানা।

'ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে যাও ডবল পা ফেলে।'

বেশ মজার খেলা পেয়েছে গিলটি মিঞা, একগাল হেসে এগোল সে সশব্দে দুজনের পা ফেলে ফেলে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা। এক মিনিট পার হয়ে গেল। কারও দেখা নেই। দুজনেরই সন্দেহে ভুল হতে পারে? তার নিজের মনটা সন্দেহপ্রবণ হয়ে রয়েছে, সন্ধে থেকে বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেছে বলে অতি সতর্ক হয়ে রয়েছে ইন্দ্রিয়গুলো, ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু গিলটি মিঞার ভুল হবে কেন? বত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে গিলটি মিঞার। ভয়ে ভয়ে, লুকিয়ে, পালিয়ে, সাবধানে কাটিয়েছে সে চোরের জীবন বত্রিশটা বছর। ওর সজাগ চোখ ভুল করতে পারে না। কাজেই অপেক্ষা করতে হবে। ধৈর্য ধরতে হবে। সামান্য ভুলে অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

দূরে গিলটি মিঞার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে এখনও আবছা ভাবে। ব্রিজের শেষ মাথায় চলে গেছে সে, এখনি পৌঁছে যাবে ওপারে। ঠিক মনে হচ্ছে দুজন লোক হেঁটে চলে যাচ্ছে।

আরও আধ মিনিট কাটল, তারপর হালকা পায়ের শব্দ শুনতে পেল রানা। বেশ কাছে। থামের গায়ে মিশে দাঁড়িয়ে রইল ও। গাঢ় রঙের কাপড় পরায় দেখা যাবে না ওকে সহজে, নিজের দিকে একবার চেয়ে নিশ্চিন্ত হলো রানা। খুব সাবধানে উঁকি দিল। কয়েক সেকেন্ড কিছুই দেখতে পেল না, তারপরই চোখ পড়ল ওর কালো স্যুট পরা একজন বেঁটে লোকের ওপর। কষ্ট হলো না চিনতে।

তার মানে লোকটা আচমকা অসাবধান পথিকের সর্বস্ব অপহরণকারী নয়। সাদা আর কালো মিলেমিশে কাজ করছে। খুব সম্ভব ওর পেছনে লাগানো হয়েছে এই দুজনকে গিয়াকোমো পাসেল্লীর দোকান থেকে বেরোবার পরপরই।

লোকটার পদক্ষেপে অতি সতর্কতার লক্ষণ টের পেল রানা। খুব সম্ভব সাদা সঙ্গীর রহস্যজনক অন্তর্ধানে যার পর নাই উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে সে ভিতরে ভিতরে। কিছুদূর এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা, চেয়ে রইল খালের দিকে। আসলে পায়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করছে সে। পনেরো সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলতে শুরু করল। পিছু ফিরে চাইল একবার, আবার এগোল।

রানা যে-থামের আড়ালে লুকিয়ে আছে সেটা পেরিয়ে গেল লোকটা প্রায় নিঃশব্দ পায়ে। খালের ওপারে গিলটি মিঞাকে দেখতে পেল সে এবার। বিচিত্র ভঙ্গিতে ওকে পা ফেলে এগোতে দেখে আঁৎকে উঠে থেমে দাঁড়াল। ঝট করে পিছন ফিরে চাইল একবার। তারপর সাঁৎ করে সরে গেল একটা থামের আড়ালে।

ছায়ার মত নিঃশব্দে এগিয়ে এল রানা। মন্ত্রমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে লোকটা গিলটি মিঞার দিকে। পেছন থেকে দুটো টোকা

দিল রানা লোকটার ঘাড়ে। 'কেঁউ' করে একটা ভয়ার্ত শব্দ বেরোল লোকটার গলা দিয়ে। এক লাফে সরে গেল তিনহাত তফাতে, এবং ঘুরে দাঁড়াল।

'কিছু মনে করবেন না, সিনর। ম্যাচ আছে আপনার কাছে?'

বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে উঠতে দুই সেকেন্ডের বেশি লাগল না লোকটার। চিতা বাঘের মত লাফ দিল রানার দিকে। ঝট করে বাঁ দিকে বাঁকা হয়ে পা চালাল রানা। এবার আর অসতর্ক নয় সে। লাথি খেয়ে চাপা একটা গোঙানি বেরোল লোকটার মুখ থেকে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল আবার। হাঁপাচ্ছে। শোলডার হোলস্টারে রাখা ছুরিটা বের করবার জন্যে চট্ করে চলে গেল ডান হাতটা কোটের ভিতর। ঠিক এই মুহূর্তটির সদ্ব্যবহার করল রানা। বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে এল এক পা, প্রচণ্ড জোরে ঘুসি চালাল লোকটার চোয়াল লক্ষ্য করে। যন্ত্রণায় চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে গেল লোকটার, কিন্তু অবাক হয়ে গেল রানা লোকটার সহ্যশক্তি দেখে, এই অবস্থাতেও বাঁ হাতটা চালাতে ভুল করল না। প্রচণ্ড একটা ঘুসি পড়ল রানার পাঁজরের ওপর। হেভিওয়েট বক্সার নাকি ব্যাটা? মনে হয় জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে লোকটার গ্লাভ্স পরা অবস্থায় রিং-এর ভিতর। বেকায়দা অবস্থায় ছোঁড়া ঘুসির ঠ্যালাতেই ফুস ফুস থেকে সব দম বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো রানার। চট্ করে ধরে ফেলল হাতটা। মুচড়ে ধরে পিছন ফিরে নিজের বাঁ কাঁধের ওপর ফেলল সে হাতটা চিৎ করে, তারপর মারল হ্যাঁচকা টান নিচের দিকে। তীব্র বেদনায় ককিয়ে উঠল লোকটা, পরমুহূর্তে শূন্যে উঠে গেল। রানার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল চারহাত তফাতে, প্রথমে গুঁতো খেলো থামের গায়ে, তারপর বালির বস্তার মত ধপাস করে পড়ল মাটিতে উপুড় হয়ে। কোনরকম নড়াচড়ার লক্ষণ না দেখে একটু ঘাবড়ে গেল রানা।

লোকটার পাল্‌স্‌ দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে সার্চ করল ওর প্রত্যেকটা পকেট। হিপ পকেট থেকে বেরোল রানার মানিব্যাগ। আর কোথাও উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া গেল না। হোলস্টারে থ্রোইং নাইফটা নেই দেখে রানার চোখ গেল লোকটার ডান হাতের দিকে। অজ্ঞান অবস্থাতেও ধরা আছে ছুরিটা ছুঁড়ে মারার ভঙ্গিতে।

মানিব্যাগটা নিজের পকেটে ফেলে আর একটু অন্ধকারে টেনে দিল রানা লোকটাকে। দ্রুত এগোল। খালের ওপারে একটা গলির মুখে গিলটি মিঞাকে দেখে এগিয়ে গেল সেইদিকে।

'এবার কোন্‌ দিকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আসুন আমার পিছু পিছু।'

গলিটা ধরে বেশ কিছুদূর গিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত সরু গলিতে ঢুকল গিলটি মিঞা। বলল, 'এইটেই।'

এ গলির দুই ধারে শত শত বছরের পুরানো ঝুর ঝুরে ভাঙা সব বাড়ি। মনে হয় এখুনি হুড়মুড় করে ঘাড়ের ওপর পড়বে বুঝি। একটি বাতি নেই কোন বাড়ির জানালায়। পকেট থেকে টর্চটা বের করল রানা।

'এসব বাসায় কোন লোক আচে বলে মনে হয় না, স্যার।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলল রানা নিচু গলায়। 'খুব সম্ভব সব ভেঙে আবার নতুন করে বাড়ি তোলা হবে বলে লোকজন সরিয়ে দেয়া হয়েছে।' একটা দেয়ালের গায়ে লেখা নম্বর দেখে এগোল রানা সামনে। 'সাঁইত্রিশ নম্বরটা আরও আগে বলে মনে হচ্ছে।'

তিনটে বাড়ি ছেড়েই পাওয়া গেল বাড়িটা। দোতলা বাড়ি। প্লাস্টার খসে যাওয়ায় দাঁত বের করে হাসছে লাল লাল ইঁট। ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজাটা নিঃশব্দে। এত নিঃশব্দে খুলল যে থমকে গেল রানা একটু। চট করে টর্চের আলোটা চলে গেল দরজার হিঞ্জে।

'তেল দোয়া হয়েচে স্যার,' বলল গিলটি মিঞা ফিসফিস

করে। 'মনে হচ্চে লোক আচে।'

ভিতরে আলো ফেলল রানা। একটা সরু প্যাসেজ দিয়ে কিছু দূর গিয়ে বাঁ পাশে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি।

'তুমি এখানেই অপেক্ষা করো, আমি ঢুকছি ভিতরে,' বলল রানা। 'চোখ কান খোলা রাখবে।'

'নিচ্চয়।'

দু'পা এগিয়েই বসে পড়ল রানা। কাঠের মেঝে, ধুলো জমে আছে পুরু হয়ে, তার ওপর অনেকগুলো পায়ের ছাপ। মেয়েমানুষের জুতোর ছাপ দেখতে পেল রানা একজোড়া। উঠে দাঁড়াল।

সাবধান করল গিলটি মিঞা। 'একটু সাবধানে পা ফেলবেন, স্যার। পচা কাটে পা পড়লে একেবারে ঝপাৎ করে পড়বেন পানিতে। নিচে পানি।'

পেছন ফিরে ভ্রূকুটি করল রানা, কিন্তু সেটা দেখতে পেল না গিলটি মিঞা। তাই চাপা গলায় বলল, 'চুপ করে থাকো, কথা বোলো না।'

সিঁড়ির পাশেই একতলায় ঢোকার দরজা। আস্তে করে হ্যান্ডেলে চাপ দিয়ে ঠেলা দিল রানা দরজাটা। ক্যাঁ...চ করে বিচ্ছিরি একটা শব্দ করে ফাঁক হয়ে গেল দরজা। চট্‌ করে ঘরের চারপাশে আলো বুলাল রানা। কেউ নেই ঘরে। অসংখ্য ঝুল, আর ধুলো। কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ এল নাকে। প্রকাণ্ড একটা মাকড়সা সড়সড় করে সরে গিয়ে একটা ঘুণে খাওয়া পচা তক্তার নিচে আত্মগোপন করল। দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে সিঁড়ির ধাপ পরীক্ষা করল রানা। ধুলো জমে আছে সিঁড়িতেও। পায়ের ছাপ দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল দু'এক দিনের মধ্যেই একাধিক লোক ওঠানামা করেছে এ সিঁড়ি দিয়ে। এক আধটা হাই হিলের ছাপও দেখা যাচ্ছে আবছা ভাবে।

সাবধানে কাঠের সিঁড়িতে কোন রকম আওয়াজ না করে উঠে এল রানা দোতলায়। দুটো দরজা দেখা যাচ্ছে।

কান পাতল রানা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল আধমিনিট। নাক ডাকা তো দূরের কথা কারও নিঃশ্বাস পতনেরও শব্দ নেই। নিঝুমপুরী। প্রথম দরজার হ্যান্ডেলে চাপ দিল সে। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা।

দরজাটা দুই ইঞ্চি ফাঁক হতেই হঠাৎ একটা শব্দ হলো ঘরের ভিতর। আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা। খচমচ করে কাগজ নাড়ার শব্দ হলো, তারপর মৃদু একটা ধুপ।

টর্চটা নিভিয়েই চট্ করে সরে গেল রানা দরজার সামনে থেকে। ডান হাতে বেরিয়ে এসেছে স্টিলেটো। দ্বিগুণ হয়ে গেছে বুকের ভিতর ঢিবঢিব শব্দ। আবার খচমচ আওয়াজ। আবার একটা মৃদু ধুপ শব্দ। পরমুহূর্তে কিচমিচ করে ডেকে উঠল ছুঁচো।

হাঁপ ছাড়ল রানা। ছুঁচোর কেত্তন।

পা দিয়ে কপাটের গায়ে একটা ঠেলা দিয়েই আলো ফেলল সে ঘরের ভিতর।

প্রকাণ্ড একটা ছুঁচো। থতমত খেয়ে গেল প্রথমটায়, তারপর ভয় পেয়ে ছুটে গেল দেয়ালের দিকে, লাফ দিয়ে ধাক্কা খেলো দেয়ালের গায়ে, ধুপ করে পড়ল মেঝেতে, তারপর বিদুৎবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘরের অন্ধকার কোণে।

ঘরের মাঝখানে ঢিবির মত উঁচু হয়ে আছে কি যেন। রানার টর্চের উজ্জ্বল আলোটা এসে স্থির হলো সেখানে।

পুরু ধুলোর ওপর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে জুলি মাযিনি। উলঙ্গ। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে ছাতের দিকে। বাঁ স্তনের নিচে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন।

মস্ত বড় একটা কদাকার মাকড়সা খুব সম্ভব রক্ত চাটছিল, রানাকে

এগোতে দেখে ভয় পেল। সড়সড় করে জুলির বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে লুকোবার চেষ্টা করল ঘাড়ের পাশে চুলের অন্ধকারে, জায়গাটা পছন্দ হলো না, চিবুক বেয়ে উঠে ওর নাক, মুখ আর খোলা চোখের ভিতর লোমশ পা ফেলে কপালে উঠল, সেখান থেকে একলাফে মেঝেতে পড়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল দুই তক্তার ফাঁকে একটা গর্তে। যেমন ছিল তেমনি শুয়ে আছে জুলি। স্থির।

চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে রানার কপালে। সারাটা ঘর ঘুরে এসে আবার স্থির হলো টর্চের আলোটা জুলির ওপর। ছুঁচোটা দৌড়ে পালাল খোলা দরজা দিয়ে। হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল রানা মেঝেতে।

শুধু ধর্ষণ নয়, সারা শরীরে জায়গায় জায়গায় সিগারেটের আগুন ঠেসে ধরার চিহ্ন দেখতে পেল রানা। যা জানার জেনে নিয়ে ছুরি মারা হয়েছে ওর হৃৎপিণ্ড বরাবর।

প্রচণ্ড ক্রোধ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল রানার মাথার ভিতর। বহু কষ্টে দাঁতে দাঁত চেপে আত্মসংবরণ করল রানা। আঙুলের উল্টো দিক দিয়ে মেয়েটার গাল ছুঁয়ে দেখল, এখনও গরম। বড়জোর আধঘণ্টা আগে মারা গেছে।

ওকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে নিশ্চয়ই পিছু ধাওয়া করে ধরেছিল জুলিকে ওরা দুজন। তারপর নির্যাতন করে জেনে নিয়েছে অনিলের ঠিকানা। এখানে নিয়ে এসে মেরে রেখে গেছে। অনিলকে এখানে পেয়েছিল ওরা? নিশ্চয়ই পাশের ঘরটায় ছিল অনিল? আছে?

ঘর থেকে বেরিয়ে এল রানা। দরজাটা বন্ধ করে সাবধানে চাপ দিল পাশের দরজার হ্যান্ডেল। দরজাটা এক ইঞ্চি ফাঁক করে সেখানে কান পাতল। কোন শব্দ নেই। তাহলে কি অনিলকেও...

আর এক ইঞ্চি ফাঁক করেই দরজার ফাঁকে টর্চ ধরল রানা। চট্ করে ঘুরিয়ে আনল আলোটা সারা ঘরে। এক নজরে বুঝতে

পারল এটাই অনিলের ঘর।

একটা ক্যাম্প খাটের ওপর দুটো কম্বল বিছানো, পাশেই একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর কিছু ফলমূল, ক্যান্‌ড ফুডের টিন, অর্ধেক মোমবাতি।

কেউ নেই ঘরে।

ঘরের ভিতর চলে এল রানা। মোমবাতিটা জ্বালল। চাইল চারদিকে।

ঘরের কোণে একটা এয়ার ব্যাগ। তার ভিতরের সমস্ত জিনিস ধুলো ভর্তি মেঝের ওপর ছড়ানো। খাটের নিচে একটা ব্রীফকেস। খোলা। ব্রীফকেসের গায়ে অনিলের নামের আদ্যাক্ষর লেখা। এ.সি.–অর্থাৎ অনিল চ্যাটার্জী। মেঝেতে পড়ে থাকা জিনিসগুলোর উপর চোখ বুলাল রানা। একটা বিস্কিটের টিন, রুমাল, গেঞ্জি, আন্ডারওয়্যার, জিলেট শেভিং কিট, পাসপোর্ট, টেক টুথব্রাশ, ফরহ্যান্স টুথপেস্ট, পামোলিভ সাবান। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ভালমত সার্চ করা হয়েছে অনিলের প্রতিটা জিনিস। তবু একবার ভাল করে খুঁজে দেখল রানা–কিছুই পাওয়া গেল না।

আর একবার চোখ বুলাল সারা ঘরে। কেন লুকিয়ে ছিল অনিল এই ঘরে? কারা খুঁজছে ওকে? ভারতীয় গুপ্তচরেরা, নাকি ইটালিয়ানরা, নাকি অন্য কেউ? কেন প্রাণ দিতে হলো জুলি মাযিনিকে? কি এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ফেঁসে গেল অনিল? কোথায় এখন ও? ধরা পড়ল? কাদের হাতে?

হঠাৎ দেখতে পেল রানা রক্তমাখা ব্যান্ডেজ। দরজার কোণে দলা করে রাখা। আহত হয়েছে অনিল? তাই পালিয়ে যেতে পারছে না, এখানে ওখানে লুকিয়ে ফিরছে, সাহায্য চাইছে?

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল রানা। এমন কিছু ফেলে যাওয়া চলবে না যাতে জুলির হত্যাকারী বলে ফেঁসে যেতে পারে অনিল। পুলিস যদি প্রমাণ করতে পারে যে এই ঘরের জিনিসগুলো অনিলের

তাহলে চার্জশীট দাখিল করবে অনিলেরই বিরুদ্ধে।

হঠাৎ মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন উদয় হতেই চমকে উঠল রানা। অনিলই খুন করেনি তো জুলিকে? কি প্রমাণ আছে রানার কাছে যে ওই সাদা আর কালো স্যুট পরা লোক দুজনই খুন করেছে ওকে? এমনও তো হতে পারে, সাবধান করতে এসেছিল জুলি এখানে, সেই সময় অনিল...

মাথা নেড়ে আজে বাজে চিন্তা দূর করে দিল রানা। এসব আবোল তাবোল ভাবনার শেষ নেই। খামোকা ভেবে লাভ হবে না। দ্রুত হাতে কিছু কিছু জিনিস তুলে ব্রীফকেসের ভিতর সাজিয়ে রাখতে শুরু করল রানা।

'পুলিস আসচে, স্যার!' ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর।

চমকে দরজার দিকে ফিরল রানা। নিঃশব্দ পায়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে গিলটি মিঞা।

'কোথায়? কতদূরে?' প্রশ্নটা করেই হুইসেলের শব্দ শুনতে পেল রানা। বেশ কাছেই।

'পুলের এ মাতায় এসে গেচে। আমার সন্দো হচ্চে এইদিকেই আসচে ওরা।'

নিজের অবস্থাটা পরিষ্কার টের পেল রানা। পাশের ঘরে ধর্ষিতা মৃতদেহ। এত রাতে এখানে কি করছে সে, তার কোন সন্তোষজনক জবাব নেই। পকেটে বার্গলার্স কিট। ধরা পড়লে সবকিছু চাপবে এখন ওরই কাঁধে। এই কেলেঙ্কারির দায় থেকে ছুটে বেরোনো সহজ হবে না।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল রানা। 'তুমি তোমার জায়গায় যাও, গিলটি মিঞা। ওরা এই বাড়িতে না-ও আসতে পারে।' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার বাজল হুইসেল। রানা বুঝতে পারল, এই গলিতেই ঢুকছে পুলিস। রানার মুখের দিকে চেয়ে রইল গিলটি মিঞা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে। রানা বলল, 'বাইরে থেকে দরজার বল্টু

লাগিয়ে দিয়ে লুকিয়ে পড়ো কাছাকাছি কোন বাড়িতে। যদি দেখো এ বাড়িতেই ঢুকছে পুলিস, তাহলে তোমার প্যাঁচার ডাকটা একবার ডেকে বাসায় ফিরে যাবে। যাও।'

একটু ইতস্তত করল গিলটি মিঞা রানার নিরাপত্তার কথা ভেবে, কিন্তু তর্ক করল না। দ্রুতপায়ে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। আধমিনিটের মধ্যেই ব্রীফকেস হাতে নামতে শুরু করল রানা সিঁড়ি বেয়ে।

ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছেই শুনতে পেল প্যাঁচার ডাক। বাকি কয়েক ধাপ প্রায় উড়ে নেমে এল সে। দড়াম করে খুলে গেল বাইরের দরজাটা। পাঁচ ছ'টা টর্চের উজ্জ্বল আলোয় দিনের মত আলোকিত হয়ে গেল সরু প্যাসেজটা।

সাঁৎ করে সরে গেল রানা। ভারী বুটের শব্দ এগিয়ে আসছে। একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে। 'দুজন থাকো গেটের সামনে। তোমরা এসো আমার সঙ্গে।'

সিঁড়ির পাশের দরজার হ্যান্ডেলে চাপ দিল রানা। ক্যাঁচ শব্দ করে খুলল একটা কবাট। ঢুকে পড়ল ভিতরে। দরজাটা বন্ধ করবার সাহস হলো না আর। দেয়ালের গায়ে সেঁটে সরে গেল দু'পা।

ঢিব ঢিব করছে বুকের ভিতর। টর্চের আলো এসে পড়ল ঘরে। একজন টর্চ হাতে ঢুকে আসছে।

'ওদিকে না,' বলল একজন। 'ওপরে।'

তবু খালি ঘরে একবার টর্চ বুলাল লোকটা। দেয়ালের গায়ে সেঁটে দম বন্ধ করে রেখেছে রানা। সরে গেল লোকটা দরজার সামনে থেকে। ধুপ ধাপ আওয়াজ আসছে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার।

আস্তে করে সরে এল রানা জানালার কাছে। পায়ের নিচে পচা কাঠ ভেঙে পড়বার উপক্রম হলো। চট্ করে জানালার হ্যান্ডেলটা

ধরে প্রায় ঝুলে পড়ল রানা শরীরের ওজন কমাবার জন্যে। মাথার ওপর কয়েক জোড়া বুটের শব্দ। আস্তে ছিটকিনি খুলে জানালা টপ্‌কে ওপারে চলে গেল রানা। ভিড়িয়ে দিল জানালা। কয়েক ফুট নিচে টলটল করছে পানি। মৃদু একটা ঝুপ শব্দ করে নেমে গেল সে পানিতে।

আন্দাজে ভর করে ব্যাক-স্ট্রোক দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে রানা। দাঁতে কামড়ে ধরে রেখেছে ব্রীফকেসটা।

চারদিকে নিকষ কালো অন্ধকার। আধঘণ্টা পর পৌঁছল ক্লান্ত রানা রিয়াল্টো ব্রিজের কাছাকাছি। মিনিট তিনেক বিশ্রাম নিয়ে উঠে পড়ল পারে। চিন্তা হলো, ফিরবে কি করে?

'ভিজে তো একেবারে জবজবে হয়ে গেচেন, স্যার!' গিলটি মিঞার মোলায়েম কণ্ঠস্বর।

'তুমি যাওনি এখনও?'

'না স্যার, ভাবলাম খেলাটা একটু দেকেই যাই। নুকিয়ে ছিলাম, লাশটা নিয়ে ওরা বিদেয় হতেই আবার গিয়ে ঢুকলাম ওই বাড়িটায়। আপনাকে কোতাউ খুঁজে না পেয়ে খাল ধরে ধরে এ পর্যন্ত এয়েচি। দেকি কুমীর দেকা যায়। তাই ডেঁড়িয়ে রইচি। মনে করলুম, নতুন মানুষ, এই শহরের গলিঘুঁচি চিনে বাসায় ফেরা কষ্ট হবে আপনার পক্ষে। এই ভেজা কাপড়ে কাউকে কিছু জিগেস করতে গেলেউ সন্দো করবে। তাছাড়া রাস্তায় লোক কোতায় যে জিজ্ঞেস...'

রানার কান খালি পেয়ে পেটের মধ্যে যত কথা আছে সব ঝেড়ে নামাবার উপক্রম করল গিলটি মিঞা। বকবকানিতে কান না দিয়ে দ্রুত কাপড় ছাড়ছে রানা। অনিলের শার্ট এবং প্যান্ট পরে নিল ও। লন্ড্রির চিহ্ন রয়েছে বলে নিয়ে এসেছে সে এগুলো ব্রীফকেসের মধ্যে করে। আঙুল বুলিয়ে চুলগুলো মোটামুটি ঠিক করে নিয়ে পাড় বেয়ে উঠে এল সে রাস্তায়।

দ্রুত পায়ে ফিরে যাচ্ছে ওরা বাসার দিকে। পথে আগাগোড়া সবটা ব্যাপার বলল রানা গিলটি মিঞাকে। সব শুনে গুম হয়ে গেল গিলটি মিঞা। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ চিন্তা করবার পর বলল, 'মস্ত গ্যাঁড়াকলে জড়িয়ে পড়েচেন, স্যার। এই বিদেশ বিভূঁইয়ে কারও সাহায্য পাওয়া যাবে না—না ইন্ডিয়া, না বাংলাদেশ। এদিকে কেসটার কোন সুরাহা হবার তো কোন হদিস দেকচি না। অনিল বাবুকে পেলে নাহায়...'

'পেতেই হবে আমাদের।'

'কোতায় খুঁজবেন? সূত্র যা ছিল সব তো ছিঁড়ে গেল। কোতায় পাবেন ওনাকে অন্দোকার হাতড়ে?'

'ঠিকই বলেছ। এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে ওই মেয়েটার আত্মীয়-স্বজনের কাউকে খুঁজে বের করা। তাদের কাছে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু তথ্য পাওয়া যাবে। হয়তো কোন পথ পাওয়া যেতে পারে এগোবার।'

সান মার্কোর পেটা ঘড়িতে ঠিক যখন তিনটে ঘণ্টা পড়ল তখন পৌঁছল ওরা বাসায়।

বিশ্রাম দরকার। গিলটি মিঞাকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকল রানা। প্রথমেই জামা-কাপড় ছেড়ে শাওয়ারের নিচে ভিজল সে মিনিট পাঁচেক, তারপর গা-হাত-পা মুছে পরে নিল ঘুমোবার পোশাক। খাটের কিনারে বসে একটা সিগারেট ধরাল। ভ্রূ কুঁচকে মেঝের দিকে চেয়ে রয়েছে সে।

বাঁ হাতে চোয়ালটা ডলতে ডলতে সন্ধে থেকে এ পর্যন্ত সবগুলো ঘটনা আগাগোড়া পর্যালোচনা করল সে মনে মনে। অনেক ঘটনাই ঘটল, কিন্তু কতটা এগোতে পেরেছে ও? এটুকু নিশ্চিত ভাবে জানা গেছে যে ভেনিসেই ছিল অনিল এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত। ব্যস। ওকে উদ্ধার করবার ব্যাপারে যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়েছে ও এখনও। এগোতে পারেনি এক পা-

ও।

বেঁচে আছে অনিল? নাকি মেয়েটার মত তাকেও শেষ করে ফেলা হয়েছে? কারা কাজ করছে ওর বিরুদ্ধে?

পুলিস খবর পেল কিভাবে? মহা ঝামেলা হয়ে যেত যদি ও ধরা পড়ত ওই বাড়িতে পুলিসের হাতে। ওকে ঝামেলায় ফেলার জন্যেই কি খবর দেয়া হয়েছিল পুলিসে? তৃতীয় কোন অনুসরণকারী ছিল, ওকে ওই বাড়িতে ঢুকতে দেখেই যে ফোন করেছে পুলিসে? নাকি পুলিসই জড়িত আছে এ ব্যাপারে?

চলতে চলতে হঠাৎ যেন একটা প্রকাণ্ড উঁচু প্রাচীরের সামনে হাজির হয়েছে রানা। এগোবার তো নয়ই, ভাবনারও কোন পথ পাচ্ছে না। খামোকা দেয়ালের গায়ে মাথা ঠুকে লাভ নেই। তার চেয়ে একটা ঘুম দিয়ে চাঙ্গা করে নেয়া দরকার শরীরটা।

শুয়ে পড়ল রানা। চোখ বুজতেই ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে জুলি মাযিনির লাশটা।

কেন প্রাণ দিতে হলো মেয়েটাকে?

সাত

জুলি মাযিনির ঠিকানা বের করবার একটা বুদ্ধি খেলেছে রানার মাথায়। কিন্তু নিজে গেলে চলবে না, চিনে ফেলবে, তাই শিখিয়ে পড়িয়ে বাইরে পাঠাল সে গিলটি মিঞাকে। আটটায় বেরিয়ে গেল গিলটি মিঞা, সাড়ে আটটার দিকে বেরিয়ে পড়ল রানাও। দেড়টা-দুটোর আগে ফিরবে না গিলটি মিঞা, ততক্ষণ চুপচাপ বসে না থেকে ভাবল একটু ঘুরে ফিরে এলে মন্দ হয় না।

গনডোলা স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছেই একটা মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে নিজের নাম শুনে থমকে দাঁড়াল রানা।

'সিনর মাসুদ রানা না?'

লুইসা পিয়েত্রো। ঝিকমিক করছে সকালের রোদে, যেন চকচকে সিকি। মুখে উজ্জ্বল হাসি, চোখে বিদ্যুৎ। মনে মনে নিজের কপালকে ধন্যবাদ দিল রানা। কিন্তু এখন ভজাতে পারলে হয়। মধুর হাসি হাসল রানা।

'আরে! আপনি! কি খবর?

'ভাল্লাগছিল না, চলে এলাম খানিকক্ষণ গনডোলায় চড়ে যেদিক খুশি ঘুরব মনে করে। আপনার চোয়ালের অবস্থা কি রকম?'

'সেরে গেছে প্রায়। বেদম ঘুমিয়েছি কাল সারারাত। তা আপনার ভাই কোথায়?'

'ও ব্যস্ত আছে ওর ব্যবসা নিয়ে। আমার করবার কিছুই নেই বলে বেরিয়ে পড়েছি। একবার ভাবছিলাম আপনার বাসায় গিয়ে দেখি আপনি ব্যস্ত আছেন কিনা, তারপর আবার ভাবলাম কি আবার মনে করবেন আপনি...'

'কি মনে করব আবার? এ তো আনন্দের কথা। চলুন না?'

'দেখা তো হয়েই গেল। কোথায় চলেছিলেন? কাজে?'

'নাহ্, আমারও আপনার মত একই সমস্যা। সময় কাটছিল না বলে চলেছিলাম কলিওনির স্ট্যাচু দেখতে। যাবেন নাকি? গনডোলা চড়াও হবে, একটা মহৎ সৃষ্টিও দেখে আসা যাবে।'

রাজি হয়ে গেল মেয়েটা। এত সহজে রাজি হয়ে যাওয়ায় রানা চট করে ভেবে নিল একবার, ভুল হয়ে গেল কিনা। বাসায় নিয়ে যেতে পারলে সবচেয়ে ভাল হত, বলা যায় না, হয়তো রাজিও হয়ে যেতে পারত। যাই হোক, বড়শিতে যখন গাঁথা গেছে, খানিক খেলালেই উঠে আসবে ডাঙায়। অতি আগ্রহ দেখালে একেবারে ফসকে যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে। নিজেকে প্রবোধ দিল সে, ধীরে, বন্ধু ধীরে।

মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করল প্রকাণ্ড চেহারার একজন

গনডোলিয়ার। উনিশ বিশ বছরের ছোকরা, কিন্তু তার পেশী দেখলে হিংসের উদ্রেক হবে যে কোন পাকাপোক্ত বডি-বিল্ডারের। হাত ধরে গনডোলায় উঠতে সাহায্য করল রানা লুইসাকে। একটু যেন বেশি মাত্রায় ভয় পেল মেয়েটা গনডোলাটা দুলে ওঠায়, প্রায় জড়িয়ে ধরল রানাকে, বসে পড়ল একেবারে ওর গা ঘেঁষে।

'ইল ক্যাম্পো ডেই সান্তি গিয়োভানিই পাওলো,' বলল রানা গনডোলিয়ারকে।

গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল মাঝি। ছেড়ে দিল গনডোলা।

'আপনার ভাই কিসের ব্যবসা করেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কাঁচের। সারা ইউরোপে বত্রিশটা ফ্যাক্টরি আছে আমাদের। ফ্রান্সেরটা বাবাই দেখেন, অন্যান্যগুলো দেখে সিলভিও।' হাসল লুইসা। 'বছরে দুবার করে আসতে হয় ওকে ভেনিসে। আমার অবশ্য এই প্রথম।'

'কাঁচের ব্যবসা করে আপনার ভাই?'

'অবাক হচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে? পিয়েত্রো গ্লাস ফ্যাক্টরির নাম শোনেননি?'

শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো রানার মধ্যে। মেয়েটার ঊরুর উষ্ণ স্পর্শে, না কাজল চোখের মদির চাহনিতে, নাকি কথায়? মনের কোণে কোথায় যেন টুং-টাং করে একটা সাবধানী ঘণ্টা বেজে উঠল।

'সত্যি শুনিনি। একজন বিদেশীর পক্ষে...'

'তা ঠিক। ক্যালকাটায় আমাদের একটা শাখা আছে। বাংলাদেশে নেই। কাজেই আমাদের নাম না জানারই কথা আপনার।'

আরও সতর্ক হয়ে গেল রানা। যেন কথার কথা আলাপ করছে এমনি ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কলকাতাতেও যেতে হয় নাকি আপনার ভাইকে?'

‘না। গোড়ার দিকে দুবার-একবার যেতে হয়েছিল, এখন ওখানকার কর্মচারীরাই দেখাশোনা করে।’
‘এখানে ভেনিশিয়ান কাঁচ কিনতে এসেছেন বুঝি?’
‘হ্যাঁ। গিয়াকোমো পাসেল্লী এখানে আমাদের একটা এজেন্ট। এর নামও নিশ্চয়ই শোনেননি আপনি?’
ভিতর ভিতর ডিগবাজি খেয়ে উঠেছে রানা। মাথা নাড়ল নিরুৎসুক ভঙ্গিতে। ‘মনে পড়ছে না। দুঃখিত।’
টুকিটাকি কথা হলো কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়ল রানা। ‘আচ্ছা, জুলি মাযিনি নামে একটা মেয়ে বোধহয় কাজ করে পাসেল্লীর দোকানে?’
‘ঠিক বলেছেন। ওকে চিনলেন কি করে?’ অবাক দুচোখ মেলে ধরল লুইসা রানার চোখের দিকে।
‘আমার এক বন্ধুর মুখে নাম শুনেছি। প্রেম আছে দুজনের।’
‘কার কথা বলছেন আপনি? অনিল চ্যাটার্জী?’
‘চেনেন নাকি ওকে?’ বিস্ফারিত রানার চোখ।
‘চিনি মানে? আমার ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। খুবই অমায়িক ভদ্রলোক।’
নিজের অজান্তেই সামনে ঝুঁকে এল রানা কিছুটা।
‘কবে শেষ দেখা হয়েছে আপনাদের ওর সাথে?’
‘দিন তিনেক আগে। কেন?’
হঠাৎ আড়চোখে গনডোলিয়ারের দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। কি শুনছে লোকটা? বৈঠাটা শূন্যে ধরা, বাইতে ভুলে গেছে, সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁ করে শুনছে ওদের কথা। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল ওর দিকে রানা। বলল, ‘কিছু বলবে তুমি?’
সংবিৎ ফিরে পেয়ে সোজা হয়ে গেল ছেলেটা, মাথা নেড়ে নিষেধ করে আবার মন দিল কাজে।
‘কি নাম তোমার?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘বাতিস্তা।’ গম্ভীর মুখে নামটা উচ্চারণ করেই অন্য দিকে মুখ ঘোরাল সে। বোঝা গেল আর কোন আলাপে সে আগ্রহী নয়। এটাও বোঝা গেল, একটি শব্দও এড়াবে না ওর কান। সরল ঔৎসুক্য!
নিশ্চিন্ত হয়ে আবার মন দিল সে লুইসার প্রতি।
‘যাক, ভেনিসেই আছে তাহলে।’ হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। ‘বেশ অনেকদিন দেখা নেই ওর সঙ্গে। আমি যে ভেনিসে এসেছি জানে না ও। চমকে দেয়া যাবে ওকে। আছে কোথায় ও?’
‘তিনদিন আগে এখানে ছিল,’ একটু যেন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে লুইসার চোখ-মুখ। ‘ওকে দেখে বেশ ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম এবার আমি আর সিলভিও। মনে হলো কোন বিপদের মধ্যে আছে ও।’
‘বিপদ? তার মানে?’
‘এমন তাড়াহুড়ো করে চলে গেল, কেমন একটু অপ্রকৃতিস্থ মনে হলো আমার কাছে। সিলভিওকে বললাম, ও বলল, ও-ও লক্ষ করেছে ব্যাপারটা। অস্বাভাবিক চঞ্চল দেখাচ্ছিল ওকে।’
‘তাড়াহুড়ো করে কোথায় চলে গেল?’
‘প্যারিস। তিনদিন আগে প্যারিসে চলে গেছে অনিল।’
নিরতিশয় হতাশ হলো রানা। ‘ধুশ শালা, দেখা হলো না তবে এবার।’ গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে গনডোলা। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল রানা। ‘এই যে এসে গেছি।’ হাত ধরে নামাল লুইসাকে। ছেলেটাকে বলল, ‘তুমি অপেক্ষা করবে, না ভাড়া নিয়ে বিদায় হতে চাও?’
‘অপেক্ষা করব।’ গম্ভীর মুখে নৌকোটা বাঁধছে ছেলেটা।
ইকোয়েস্ট্রিয়ান-স্ট্যাচুর ওপর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিল রানা। মনের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে চলেছে অন্য চিন্তা। মুখে সে

অনর্গল বলে চলেছে কলিওনি কে ছিল, কেমন ভাবে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির গুরু ভেরোশিও তৈরি করেছিল এই মূর্তি। জানাল, পৃথিবীতে এই অপূর্ব মূর্তির সমকক্ষ আর একটি মাত্র মূর্তি আছে, সেটা হচ্ছে ডোনাটেলোর গাটামেলাটা।

মনের মধ্যে চিন্তা চলেছে, অনিলের প্রসঙ্গ উঠে পড়া একটা দৈব-সংযোগ, না ইচ্ছাকৃত ব্যাপার? গনডোলা স্টেশনে হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে লুইসার সঙ্গে, না এ দেখাটা পূর্ব-পরিকল্পিত? গত রাতে পথ হারিয়ে রানাকে অজ্ঞান অবস্থায় খুঁজে পেয়েছিল দু'ভাই বোন, নাকি সেটাও সাজানো? এরা কি অনিলের শত্রুপক্ষ, না বন্ধু? লুইসাকে কি পাঠানো হয়েছে রানাকে চোখে চোখে রাখার, কিংবা ভুলিয়ে অন্য কিছুতে ব্যস্ত রাখার জন্যে?

নাহ্ বড় বেশি ভাবছে সে। এসব ভাবনার কোন কূল কিনারা নেই। সতর্ক থাকলে আপনিই বেরিয়ে আসবে সব কিছু। সর্বদা সতর্ক, প্রস্তুত থাকতে হবে ওকে। বড় বেশি জটিল হয়ে উঠেছে সবটা ব্যাপার ক্রমে। স্রোতে ভেসে যেতে হবে এখন বেশ কিছুদূর, নইলে বোঝা যাবে না নদীর জল ঠিক কোন্‌দিকে বইছে, কোথায় ঘূর্ণিপাক।

গির্জাটাও দেখল ওরা ঘুরে ফিরে। কখন যে রানার হাতে ধরা পড়েছে ওর হাতটা খেয়াল করেনি লুইসা, কিংবা খেয়াল না করার ভান করেছে; কখন যে হাঁটতে হাঁটতে নির্জন জায়গায় চলে এসেছে লক্ষ করেনি, লক্ষ করতে হলো যখন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল রানা ওর চোখে চোখ রেখে। সংবাদটা ঠিকই পৌঁছল ওর মনের গভীরে, রানার চোখে যে মদির আকর্ষণ দেখতে পেয়েছে তার অর্থ ব্যাখ্যা করে নিতে ভুল করল না। রানার বাঁ হাতটা জড়িয়ে ধরেছে ওর ক্ষীণ কটি। চোখে কপট শাসানি ফুটিয়ে তুলে ঠোঁটে লাজুক হাসি হাসল লুইসা। অমোঘ আকর্ষণে সেঁটে গেল রানার গায়ে। চিবুকটা একটু উঁচু করে প্রস্তুত হলো দুটি তৃষিত অধর।

চোখ দুটো ভেজা ভেজা।

গোরস্থানের পিছনে বেশ কিছু জায়গা ঝোপঝাড়। মাঝে মাঝে বেঞ্চ পাতা। নির্জন। যেন কি এক ঘোরে পড়ে চলে এল ওরা জঙ্গলের ধারে। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেল লুইসা, থমকে দাঁড়াল।

'এখানে না, প্লীজ।'

'কোথায়?'

'তোমার বাসায়।'

লুইসার চোখে চোখ রেখে হাসল রানা। আনত হলো লুইসার দৃষ্টি, রানার কোটের একটা বোতাম খুঁটছে। চিবুক ধরে মুখটা উঁচু করল রানা।

'কবে? কখন?'

জবাব দিল না লুইসা। বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরল রানার কনুই, টানল গনডোলার দিকে।

চলতে শুরু করল দুজন। ঘাড় বাঁকিয়ে রানার মুখের দিকে চাইল লুইসা।

'রাগ করোনি তো, রানা?'

উত্তর না দিয়ে হাসল রানা।

'রাগ করারই কথা অবশ্য। ইটালিয়ান আইন কি বলে জানো?'

'কি বলে?'

'এই যে একটু আগে বারণ করলাম, এই অপরাধে আমার এক বছরের জেল হয়ে যেতে পারত, যদি আমি তোমার স্ত্রী হতাম।'

'যাহ্!'

'সত্যি। জেল হোত তুমি নালিশ করলে।'

'স্বামী না হয়েও যদি নালিশ করে বসি?'

হা-হা করে হাসল লুইসা। 'তাহলে তোমার জেল হবে। ভালই হবে।'

গনডোলায় উঠে পড়ল দুজন। লুইসার লিপস্টিক মুছে যাওয়া ঠোঁটের দিকে চেয়ে চোখ সরিয়ে নিল ছোকরা গনডোলিয়ার। এর ফলে সচকিত হয়ে উঠল লুইসা। চট্ করে হ্যান্ডব্যাগ খুলে ছোট্ট একটা আয়না বের করে দেখল নিজেকে। কপট রাগের ভঙ্গিতে ভ্রূকুটি করল রানার প্রতি।

'কী অবস্থা করেছে! দস্যু কোথাকার!'

একটা ছোট্ট রুমাল বের করে ঠোঁট মুছে নিয়ে নিজেকে আবার মেরামতের কাজে লাগল লুইসা।

তিনদিন আগে প্যারিস চলে গেছে অনিল—কথাটা চমকে দিয়েছে আসলে রানাকে। যদি সত্যি হয়, তাহলে ও মিছেমিছেই খুঁজে মরছে ওকে এখানে। কিন্তু কথাটা কি সত্যি? ভুল খবর জেনেছে লুইসা, নাকি মিথ্যে কথা বলছে?

ভেবেচিন্তে দেখে অনিলের প্রসঙ্গটা আবার তোলার সিদ্ধান্ত নিল রানা। সিগারেট ধরাল একটা।

'বড় খারাপ লাগছে একটুর জন্যে অনিলকে মিস করে। ও থাকলে ভেনিসের ছুটিটা খুব জমত।'

'হ্যাঁ। খুবই ভাল লোক। আমাদের সাথে খুবই সুন্দর একটা সম্পর্ক গড়ে নিয়েছে। অনেকটা পারিবারিক বন্ধুও বলতে পারো। নিয়মিত আসা যাওয়া, খোঁজ খবর করা, ক্রিস্‌মাসে উপহার দেয়া, সব দিক থেকে যথার্থ বন্ধু যাকে বলে। তাছাড়া সৎ লোক। ভুলেও কোনদিন আমার প্রতি আবছা ইঙ্গিতেও কোন রকম আগ্রহ প্রকাশ করেনি।' গলাটা খাটো করে বলল, 'তোমার মত নয়।'

হাসল রানা। বলল, 'ওর তো জুলি মাযিনি আছে। আমার কে আছে? অভাবে স্বভাব নষ্ট।' আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল চট করে। 'প্যারিসে চলে গেছে, ঠিক জানো তুমি?'

'জানি। আমরা দুজন ওকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছিলাম। এমন তাড়াহুড়ো করতে দেখিনি আর ওকে কোনদিন। মনে হচ্ছিল যেন কেউ তাড়া করছে ওকে, ও পালাচ্ছে। ভীত সন্ত্রস্ত একটা ভাব।'

'কি হয়েছে জিজ্ঞেস করোনি ওকে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল লুইসা।

'করেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই বলল না। সিলভিও-ও বারকয়েক জিজ্ঞেস করল, যে-কোন বিপদ ঘটে থাকুক না কেন সাধ্যমত সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দিল, কিন্তু কিছুতেই মুখ খুলল না ও। বলল, এটা এমন একটা ব্যাপার যা আমাদের না জানাই ভাল। জানলে নাকি আমরাও বিপদে পড়তে পারি। প্যারিসে পৌঁছতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ওর অবস্থা দেখে আমরাও আর বেশি চাপাচাপি করলাম না। আমরা একটা পার্টিতে যাচ্ছিলাম, এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই ছাড়ল না আমাদের, জেদ ধরল ওকে স্টেশনে পৌঁছে দিতেই হবে। খুব সম্ভব পথে কোন রকম আক্রমণের ভয় পাচ্ছিল ও। আমরাও বেশি তর্ক না করে পৌঁছে দিলাম ওকে স্টেশনে। সেই থেকে মনটা খারাপ হয়ে আছে সিলভিওর।'

'অদ্ভুত ব্যাপার,' বলল রানা। 'কতদিন ধরে ভেনিসে আছে ও? রোমে ইন্ডিয়ান এমব্যাসিতে কাজ করত না অনিল?'

'হ্যাঁ। তবে কাজটা ঘোরাঘুরির। যেসব মাল ভারত আমদানী করে সেসব সরেজমিনে পরীক্ষা করার কাজ ছিল ওর। সেই সূত্রেই তো সিলভিওর সাথে বন্ধুত্ব। পিয়েত্রোর প্রচুর মাল যায় ভারতে। দিন পাঁচেক আগে আমরা ভেনিসে এসে দেখলাম ও এখানে।'

'প্যারিসে কোথায় উঠেছে ও বলতে পারবে?'

'হ্যাঁ। টেলিফোনে আলাপ করতে পারো ওর সঙ্গে। হোটেল

আলফ্রেডো। পৌঁছেই চিঠি দিতে বলেছিলাম আমরা, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন চিঠি পাইনি। এখানকার কাজ শেষ হলেই আমরা প্যারিসে যাচ্ছি। তোমার কথা বলব ওকে।'

'প্রথম যখন দেখা হলো তখনই ওকে অস্বাভাবিক মনে হলো, না উৎকণ্ঠা ভাবটা পরে এসেছে ওর মধ্যে?'

'পরে। আমরা যখন পৌঁছলাম, স্টেশনে রিসিভ করল ও আমাদের। বরাবরের মত হাসি খুশি, ভাল মানুষ। কোথায় উঠেছে জিজ্ঞেস করায় বলল বন্ধুর বাসায়। কোন্ বন্ধু সেকথা আমরাও জিজ্ঞেস করিনি, ও-ও বলেনি। রাতে একসাথে ডিনার খেলাম বেশ হৈ-চৈ করে। পরদিন সকালে আসার কথা ছিল ওর, কিন্তু এল না। ওই সময়েই কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছিল খুব সম্ভব। তিনদিন আগে আমরা পার্টিতে যাওয়ার জন্যে বাইরে বেরোচ্ছি, এমনি সময়ে এসে হাজির হলো, চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা, ভয়। ওর চাপাচাপিতে বাধ্য হলাম আমরা ওকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে।'

'তারপর থেকে আর কোন সংবাদ নেই ওর?'

'না।'

'হোটেল আলফ্রেডোতে উঠেছে ও সেটা জানলে কি করে?'

'ও-ই বলেছে। আমরা এখান থেকে প্যারিস যাচ্ছি শুনে ওই হোটেলে দেখা করতে বলল।'

প্রসঙ্গটার ইতি টানল রানা। 'যাক, কপাল খারাপ, দেখা হলো না। আবার কবে যে দেখা হবে কে জানে।'

'টেলিফোনে কথা বলতে পারো,' বুদ্ধি দিল লুইসা। 'তোমার কথা শুনলে ও হয়তো চলেও আসতে পারে।'

'ঠিক,' বলল রানা। 'একটা ফোন করব একসময়।'

চতুর্থ বারের মত আড়চোখে লক্ষ করল রানা গনডোলিয়ারের ঔৎসুক্য। হাঁ করে গিলছে ওদের সব কথা।

চটুল গল্পে মেতে গেল রানার এবার। হালকা রসিকতায় হেসে খুন হয়ে গেল লুইসা, ঢলে পড়ল রানার গায়ে। হাসতে হাসতে নামল ওরা গনডোলা থেকে। ছোকরা গম্ভীর।

ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল রানা ওকে, 'কিছু বলবে, বাতিস্তা?'

প্রবল ভাবে মাথা নাড়াল ছেলেটা। 'না।'

মোড়ে এসে থেমে দাঁড়াল লুইসা। কেটে পড়ার মতলব টের পেয়ে চোখ পাকাল রানা।

'খবরদার। কোর্টে নালিশ ঠুকে দেব কিন্তু।'

'ভয় নেই, পালাচ্ছি না। তুমি যাও লক্ষ্মী, আমি আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে। সিলভিওকে বলে আসি যে তোমার সাথে লাঞ্চ খাচ্ছি। নইলে হারিয়ে গেছি মনে করে মহা চিন্তায় পড়ে যাবে ও।'

চোখে চোখে চেয়ে হাসল দুজন।

গ্রিটি হোটেলের দিকে চলে গেল লুইসা। বাসার দিকে রওনা হলো রানা। ভাবল, ভালই হলো। এখুনি ট্রাঙ্ক-কলটা সেরে নেবে ও। অনিল সত্যি প্যারিসে আছে কিনা জেনে নেয়া দশ মিনিটের কাজ। যদি থাকে, ওর সঙ্গে কথা বলার পর পরবর্তী কর্মসূচী ঠিক করা যাবে। কিন্তু সত্যিই কি আলফ্রেডোতে পাওয়া যাবে ওকে? লুইসা যা বলছে তা যদি সত্যি হয়, যদি সত্যিই তিনদিন আগে প্যারিসে চলে গিয়ে থাকে অনিল, তাহলে গত রাতের এতসব ঘটনা কিসের জন্যে? ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে কেন? কেন খুন করা হলো জুলিকে?

এর একমাত্র ব্যাখ্যা হচ্ছে, আত্মগোপন করার প্রয়োজনে কৌশল অবলম্বন করেছিল অনিল। হয়তো আক্রমণ আসতে পারে ভেবেই লুইসা এবং সিলভিওকে নিয়ে গিয়েছিল স্টেশনে। ট্রেনেও উঠেছিল, কিন্তু পরের স্টেশনে নেমে আবার ফিরে গিয়ে লুকিয়ে

ছিল মনডেলো লেনের সেই ভাঙা বাড়িতে। এইভাবে শত্রুপক্ষের চোখে ফাঁকি দিয়ে ভেনিসেই থাকতে চেয়েছিল হয়তো অনিল। বেঁটে-মোটা আর সরু-লম্বার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যেই এই কৌশল? কিন্তু এ কৌশল দিয়ে ওদের চোখে ধুলো দেয়া সম্ভব হয়নি অনিলের পক্ষে। ওরা বের করে ফেলেছে, জুলি মাযিনি জানে কোথায় লুকিয়ে আছে অনিল, ওর উপর নির্যাতন করে বের করে নিয়েছে ঠিকানাটা। তারপর ধরে ফেলেছে অনিলকে। নাকি পালিয়ে গেছে আবার অনিল?

ব্যান্ডেজের কথাটা মনে আসতেই পালাবার সম্ভাবনাটা নব্বই ভাগ বাতিল করে দিল রানা। ধরে নিতে হবে, ধরা পড়েছে অনিল, এখন বের করতে হবে, কাদের হাতে ধরা পড়ল। কারা এরা?

বাসায় পৌঁছে দেখা গেল ফেরেনি এখনও গিলটি মিঞা। রানা আশা করছে পুলিস নিশ্চয়ই যাবে জুলির কাজের জায়গায়, জিজ্ঞাসাবাদ করবে গিয়াকোমো পাসেল্লীকে, জানাজানি হয়ে যাবে জুলির মৃত্যুর খবর। ওর মৃত্যুতে ফ্যাক্টরি ছুটি হোক বা না হোক, সহকর্মিনীরা যে একবার জুলির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের কাছে যাবে সহানুভূতি জানাতে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওদের পিছু নেয়ার আশায় ঘুরঘুর করবে গিলটি মিঞা আশেপাশে কোথাও, চিনে আসবে বাড়িটা।

ভালই হলো। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরে না এলেই বাঁচা যায়।

আট

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে কানে ধরল রানা।

'আপনার প্যারিসের কল, সিনর। কথা বলুন।'

'ধন্যবাদ। হ্যালো, আলফ্রেডো হোটেল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইয়েস, মশিয়ে। রিসেপশন ডেস্ক।' পরিষ্কার ইংরেজীতে উত্তর এল।

'আপনাদের ওখানে কি চ্যাটার্জী বলে কেউ উঠেছেন? মি.অনিল চ্যাটার্জী?'

'একটু ধরুন, দেখে বলছি।'

আধ-খাওয়া সিগারেটটা ফেলে দিল রানা অ্যাশট্রেতে। চট্ করে টেনে নিল একটা ছোট্ট সাদা প্যাড, আর বলপেন। কয়েক সেকেন্ড পরই আবার শোনা গেল রিসেপশন ক্লার্কের কণ্ঠস্বর।

'হ্যালো, মশিয়ে? হ্যাঁ, আমাদের এখানেই উঠেছেন মি. চ্যাটার্জী।'

ভুশ করে আটকে রাখা দম ছাড়ল রানা। লুইসার কথা বিশ্বাস করেনি ও, আশা করেছিল জবাব আসবে–না, মশিয়ে, মি. চ্যাটার্জী বলে কেউ ওঠেননি আমাদের হোটেলে। একটু যেন হকচকিয়ে গেল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'উনি আছেন?'

'খুব সম্ভব আছেন। ওঁর রূমে কানেকশন দেব?'

'দিন। বলুন মাসুদ রানা কথা বলতে চান ওঁর সঙ্গে।'

'জাস্ট আ মোমেন্ট, প্লীজ।'

দশ সেকেন্ড চুপচাপ, তারপর ক্লিক করে রিসিভার তোলার শব্দ হলো। পরিষ্কার বাংলায় ভেসে এল, 'হ্যালো? অনিল বলছি।'

দেড় বছর আগে সাত দিনের পরিচয়। কথাবার্তা তেমন কিছুই হয়নি, দুজনই ব্যস্ত ছিল কাজে। গল্পের বন্ধুত্ব নয়, কাজের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল ওদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে। এত দূর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরটা তাই চিনতে পারল না রানা। চিনবার কথাও নয়।

‘আমি রানা বলছি,’ বলল রানা। ‘চিনতে পারছ, অনিল?’

খানিক চুপ, তারপর উত্তর এল, ‘পারছি।’

‘কেমন আছ, অনিল? বহুদিন পর, তাই না? কি বলো?’

‘হ্যাঁ। বেশ অনেক দিন। দিন যায়, দিন আসে–কি দাম সময়ের? তা কোথায় আছ তুমি? কোথা থেকে বলছ?’

একটি শব্দও যেন শুনতে ভুল না হয় সেজন্যে ঠেসে ধরে আছে রানা রিসিভারটা কানের ওপর। কিন্তু উত্তরটা কেন যেন পছন্দ হলো না ওর। কেমন যেন ছাড়া ছাড়া, কাটা কাটা কথা। সজীব প্রাণবন্ত নয়, কেমন মরা মরা। অস্বাভাবিক।

‘ভেনিস থেকে,’ বলল রানা। ‘তোমার মায়ের একটা চিঠি আছে আমার কাছে। তোমাকে লেখা। উনি ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছেন তোমার জন্যে।’

‘উদ্বিগ্ন? কেন?’

‘কেন উদ্বিগ্ন সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছ তুমি?’ রেগে গেল রানা। যার জন্যে এত কিছু, তার নিশ্চিন্ত কণ্ঠ বিরক্ত করে তুলেছে ওকে। ‘সপ্তাহে দুটো করে চিঠি লেখার কথা, সে জায়গায় গত দেড় মাসে একটা চিঠি নেই...উদ্বিগ্ন হবে না মানুষ? এতই ব্যস্ত তুমি যে মাকে দুটো লাইন লেখার সময় হয় না?’

কোন জবাব নেই। দশ সেকেন্ড পেরিয়ে গেল। প্যারিসের রাজপথে ব্যস্ত গাড়িঘোড়ার অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা। মনে হলো দ্রুত শ্বাস নেয়ার শব্দ শুনতে পেল সে আবছাভাবে।

‘হ্যালো? লাইনে আছ তুমি, অনিল?’

‘হ্যাঁ।’ ভাবলেশহীন কণ্ঠস্বর। ‘কি যেন বলছিলে?’

‘দেড় মাস কোন চিঠি না পেয়ে তোমার মা খুবই দুশ্চিন্তায় আছেন।’ গলাটা একটু চড়িয়ে দিল রানা।

‘দেড় মাস? নাহ্, এতদিন হবে কি করে? লিখেছিলাম তো! আমার মনে হচ্ছে চিঠি লিখেছি আমি।’

‘পৌঁছে যেটা দিয়েছিলে সেটা ছাড়া আর একটা চিঠিও পাননি উনি তোমার। লেখোনি বলেই পাননি। কি নিয়ে এত ব্যস্ত তুমি, অনিল?’

‘দেড় মাস...’ কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল কণ্ঠস্বর। আবার চুপ। প্যারিসের রাজপথে চলমান একটা ফোক্সওয়াগেন গাড়ির হর্নের আওয়াজ ভেসে এল। বিরক্ত হয়ে আবার কথা বলতে যাচ্ছিল রানা, এমনি সময় একটা আবছা শব্দ শুনে শির শির করে উঠল ওর বুকের ভিতরটা। মনে হলো ফোঁপাচ্ছে একটা পুরুষ কণ্ঠ। কাঁদছে অনিল!

‘অনিল!’ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রানা। ‘কি হয়েছে তোমার? তুমি অসুস্থ?’

খানিকক্ষণ চুপচাপ, তারপর ভাঙা গলায় উত্তর এল, ‘জানি না। আমি...আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছি, রানা। এখানে কেন আছি আমি জানি না। কি করছি আমি জানি না। দোহাই লাগে তোমার, রানা, বাঁচাও...বাঁচাও আমাকে!’

‘দাঁড়াও অনিল, শোনো! আমি আসছি। যেখানে আছ সেখানেই থাকো তুমি। ঘাবড়িয়ো না, কোন চিন্তা নেই। অ্যালিটালিয়ার ফ্লাইট না থাকলে প্লেন চার্টার করব আমি লিডো এয়ারপোর্ট থেকে। পাঁচ ছয় ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব আমি তোমার কাছে। যেখানে আছ সেখানেই থাকো, অন্য কোথাও যেয়ো না। আর যাই ঘটে থাকুক না কেন, সহজ ভাবে গ্রহণ করো সেটাকে। সব ঠিক হয়ে যাবে, কিচ্ছু ভেবো না। বুঝেছ?’

‘জলদি...জলদি এসো, রানা...আমি বোধহয় বাঁচব না, রানা!’ ককিয়ে উঠল অনিল।

চট করে ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল রানার। ওভার অ্যাকটিং! রানার সতর্ক কান এড়াল না সেটা।

‘এক্ষুণি আসছি আমি,’ বলল রানা। জানালা দিয়ে দেখতে

পেল দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে লুইসা পিয়েত্রো এই বাসার দিকে। অদ্ভুত সুন্দর ছন্দ মেয়েটার চলায়। নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। 'কিচ্ছু ভেবো না তুমি। সব ঠিক হয়ে যাবে। আসছি আমি, কেমন? রাখলাম।'

মাউথপিসটা বাঁ হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরে ডান হাতের নখ দিয়ে জোরে খড়খড় করে আওয়াজ করল রানা রিসিভারের গায়ে। যেন বন্ধুর বিপদে ব্যস্ত হয়ে নামিয়ে রাখল সে রিসিভার একটা কিছু ব্যবস্থা করবার জন্যে।

এয়ারপিস কানে চেপে ধরে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল রানা।

কাজ হলো কৌশলে। আবছা হাসির শব্দ শুনতে পেল রানা। একটা পুলকিত কণ্ঠস্বর ফরাসী ভাষায় বলল, 'শুধু টোপ না, বড়শি, ফাৎনা, এমন কি ছিপ পর্যন্ত গিলে ফেলেছে ব্যাটা!'

আরেকটা ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'শাট আপ! ইউ ব্লাডি সোয়াইন! রিসিভার নামাও!' ক্লিক করে কেটে গেল লাইন।

রিসিভার নামিয়ে রেখে কপালের ঘাম মুছল রানা। আরাম করে সোফায় হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাল।

'আসতে পারি?'

উঠে দাঁড়াল রানা, হাত বাড়িয়ে সামনে ঝুঁকে কেতাদুরস্ত আহ্বান জানাল।

'এসো, লা সিনোরিনা।' হাসল ওর মেয়ে ভুলানো হাসি। 'তোমারই অপেক্ষায় আছি।'

অবাক চোখে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল রানা লুইসাকে। 'এইটুকু সময়ের মধ্যে কাপড় বদলে ফেলেছ? অপূর্ব লাগছে কিন্তু।' এগিয়ে এসে চুম্বন করল রানা ওর ঠোঁটে, তারপর হাত ধরে নিয়ে এসে বসাল একটা সোফায়, নিজে বসল পাশে।

'তোমার জন্যে খবর আছে।'

'কি খবর?' অবাক আয়ত চোখ মেলে ধরল লুইসা রানার চোখে।

'আলফ্রেডো হোটেলে ফোন করেছিলাম। এই একটু আগে। কথা হয়েছে অনিলের সঙ্গে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ভয়ানক অসুস্থ মনে হলো ওকে। আজই দেখা করার জন্যে বায়না ধরেছে।'

'যাচ্ছ তুমি?'

'ভাবছি যাওয়া উচিত। তোমার কাছে যা শুনলাম, আর ওর সঙ্গে কথা বলে যা বুঝলাম, মনে হচ্ছে যাওয়া উচিত আমার। আমার মনে হয় নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে ওর। শেষের দিকে রীতিমত ফোঁপাতে শুরু করেছিল।'

'আহ্-হা! বেচারা!'

লুইসার কণ্ঠে সহানুভূতি ঝরে পড়ল। অভিনয়টা এতই আন্তরিক যে খুঁত ধরবার উপায় নেই। বহু কষ্টে হাসি চাপল রানা।

'তুমি যাবে নাকি আমার সঙ্গে?' লুইসার একটা হাত তুলে নিল রানা নিজের হাতে। 'নারীর সহানুভূতি অনেক উপকারে আসত ওর এই বিপদের সময়। যাবে?'

'কিন্তু আজ আর কাল যে সিলভিওর দুটো বিজনেস পার্টি আছে। আমি না থাকলেই যে নয়।'

'তাহলে অবশ্য জোর নেই। কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না। ভেবেছিলাম ছুটির কটা দিনকে জীবনের স্মরণীয় দিন করে রাখব তোমাদের সাথে আনন্দে কাটিয়ে। বাধা পড়ে যাচ্ছে। যাব কিনা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তোমাকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেও ইচ্ছে করছে না। স্বার্থপর হয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে। কি

করি বলো তো?'

'আমার মনে হয় তোমার যাওয়াই উচিত। বেচারা এই বিদেশে একা কষ্ট করছে, দেখার কেউ নেই, একটু সহানুভূতি দেখাবারও কেউ নেই। এখন না যাওয়াটা অমানুষের কাজ হয়ে যাবে।'

মনে মনে রানা বলল...ওরে ছুঁড়ি। এ দেখছি সোফিয়া লোরেনকেও হার মানাবে। মুখে বলল, 'ঠিক আছে। তুমি যদি বলো, যাব আমি। কিন্তু চিরকাল দুঃখ থেকে যাবে আমার মনে। কোনদিন ভুলতে পারব না ওকে সাহায্য করতে গিয়ে তোমাকে হারিয়েছিলাম আমি।'

'আমাকে হারাতে হবে কেন?' একটু যেন অবাক হলো লুইসা।

'বারে, হবে না? প্যারিস থেকে আর ভেনিসে ফিরে আসতে পারব মনে করেছ? অবস্থা ভাল দেখলে অবশ্য আমার এক সঙ্গীর সাথে ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে ফিরে আসব আমি ভেনিসে। কিন্তু ওর অবস্থা যদি যা ভাবছি তাই হয়, তাহলে ওকে নিয়ে সোজা কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে তারপর নিস্তার পাব। তার মানে খুব সম্ভব আজই তোমার সাথে আমার শেষ দেখা।' কণ্ঠস্বরটা করুণ করে আনল রানা শেষের দিকে।

কাছে সরে এসে রানার কাঁধে মাথা রাখল লুইসা। এক হাতে রানার চুলে আঙুল বোলাতে বোলাতে বলল, 'এসো আজকের দিনটাকেই ইতিহাস করে রাখা যাক। এই হঠাৎ দেখা, হঠাৎ ভাল লাগা, আর হঠাৎ বিচ্ছেদকেই আমাদের জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা করে রাখি।'

বানানো কথা, কিন্তু শুনতে মন্দ লাগল না রানার। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র। কত মিথ্যা, কত প্রবঞ্চনা, কত ভুল, আর কত মায়া রঙিন করে রাখে জীবনটাকে। কোনটাই মূল্যহীন নয়।

আর একটু সরে এল রানা, আর একটু কাছে টেনে নিল ওকে। আদরে আদরে বুজে এল লুইসার চোখ।

রানার কানের লতিতে আস্তে একটা কামড় দিল লুইসা।

'কখন যাচ্ছ?'

'লিডো থেকে একটা এয়ার-ট্যাক্সি চার্টার করব। রওয়ানা হব ঠিক দুটোর সময়।'

এই খবরটুকুর জন্যেই মেয়েটার এখানে আগমন, রানা জানে। ওকে ভেনিস থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে এরা। রানা যে সত্যিই আজ প্যারিস রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এ খবরটা শুনে একটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল লুইসার চোখে মুখে। নিশ্চিন্ত হয়ে এবার দিনটা স্মরণীয় করে তোলার চেষ্টায় মন দিল। বিচ্ছেদের কথা ভেবে উথলে উঠল ওর প্রেম।

একসময় উঠে গিয়ে দ্রুতহাতে সবকটা জানালার কার্টেন টেনে দিল ওরা। আবছা আঁধার হয়ে গেল ঘরটা। পায়ে পায়ে চলে এল খাটের কাছে। ভুলে গেল স্থান, কাল, পাত্র।

কখন যে নিঃশব্দ পায়ে ঘরে ঢুকেছিল গিলটি মিঞা, আধ হাত জিভ কেটে 'না আউযুবিল্লা' বলে ছুটে পালিয়ে গেছে, টেরও পেল না কেউ।

ঠিক একটার সময় বাইরে থেকে লাঞ্চ খেয়ে আবার ফিরে এল ওরা আঁধার ঘরে।

'তোমাকে কোনদিন ভুলতে পারব না আমি, রানা।'

'আমিও না।'

'মিথ্যে কথা বললে। কতজন এসেছে তোমার জীবনে, আরও কত আসবে, আমি হারিয়ে যাব তাদের ভিড়ে।'

'তোমার জীবনে যারা আসবে, আমি হারাব তাদের ভিড়ে।'

'না।' কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে রানার ঠোঁটে আলতো করে চুমো খেলো লুইসা। 'এই প্রথম জানলাম, সত্যিকার প্রেম কাকে

বলে। বিশ্বাস করো, জানতাম না আমি। আরও কয়েকজন পুরুষ এসেছে আমার জীবনে, আজ বুঝতে পারছি, তারা সবাই স্বার্থপর। তোমাকে হারাতে হবে ভাবতে সত্যিই খারাপ লাগছে এখন।'

জবাব দিল না রানা। কথাটা বিশ্বাস করবে কি অবিশ্বাস করবে তা নিয়ে ভাবল না একটিবারও। এ মেয়ে শত্রুপক্ষের মেয়ে। জুলি মাযিনির নির্মম হত্যার পিছনে হাত আছে এরও–জেনে হোক, না জেনে হোক, একটি জীবনের নিষ্ঠুর পরিসমাপ্তির জন্যে দায়ী লুইসাও।

রানার প্রশস্ত বুকে মাথা রাখল লুইসা। 'না যদি পাও? যদি গিয়ে দেখো আলফ্রেডো হোটেল ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে অনিল, তাহলে? তাহলে আবার ফিরে আসবে আমার কাছে?'

'আসতে পারলে সুখী হতাম লুইসা। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে খুঁজে বের করতে হবে আমার ওকে। যেমন করে পারি। কিন্তু সে প্রশ্ন আসছে কেন? ওই হোটেলেই থাকতে বলেছি ওকে, ওখানেই পেয়ে যাব।'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল লুইসা। 'আমার সব কথাই তো শুনেছ, এবার তোমার কথা কিছু বলো। ঠিক কি ধরনের বিজনেস করো তুমি? প্রত্যেক বছরই বিদেশে আসতে হয়?'

ইনডেন্টিং ব্যবসার বানানো গল্প শোনাল রানা সবিস্তারে। বলল আগামীবার যখন ইউরোপে আসবে তখন যেমন ভাবে হোক খুঁজে বের করবে লুইসাকে। আবার মিলবে দুজন, আবার ভালবাসবে।

ঘড়ি দেখল রানা। এতক্ষণ কি করছে গিলটি মিঞা? এই মেয়ের কাছ থেকে যতটা জানার জেনে নিয়েছে সে, এখন দূর হলেই বাঁচে। কিন্তু সাপের সম্মোহনে আটকা পড়া ব্যাঙের মত নড়তে পারছে না মেয়েটা। সোয়া একটা বাজতেই উঠে বসল

রানা বিছানায়।

'সময় নেই হাতে। প্যাক করে তৈরি হয়ে নিতে হবে আমাকে দুটোর মধ্যে।'

'চলে যেতে বলছ?' করুণ দৃষ্টিতে চাইল লুইসা রানার চোখে।

'না, সিনোরিনা। আমাকে চলে যেতে হচ্ছে।'

'আর পনেরোটা মিনিট দেবে না আমাকে?' কাঙালের মত মাথা নাড়ল লুইসা। 'প্লীজ, রানা।'

রানা হাসতেই কৃতার্থ হয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লুইসা রানার বুকে। চুমোয় চুমোয় ভরে দিল সারা গা।

'জীবনে কারও জন্যে কাঙালেপনা করিনি আমি, রানা। বিশ্বাস করো। চলে যাবে মনে করলেই নিজেকে নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত মনে হচ্ছে। উহ্, কি করে বোঝাব তোমাকে আমার মনের অবস্থাটা?'

মিনিট দশেক চুপচাপ। তারপর ঝড়ের বেগে নিঃশ্বাস। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল লুইসা। দুই হাতে চোখ ঢেকে কাঁদল ঝরঝরিয়ে। অবাক চোখে দেখল রানা মেয়েটাকে।

দু'মিনিটেই সামলে নিয়ে উঠে বসল লুইসা খাটের ধারে। ব্যস্ত হাতে জামা ঠিক ঠাক করল। হাতের পোঁছায় চোখ মুছল বার কয়েক। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল রানার সামনে। রানার একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের গালের ওপর চেপে ধরল।

'ভায়া খণ্ডিওস্, মাই ডার্লিং, ভায়া খণ্ডিওস্।'

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল লুইসা। রানার হাত ছেড়ে দিয়ে হ্যান্ড-ব্যাগটা তুলে নিল সাইড টেবিলের ওপর থেকে। দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানার দিকে।

রানা দেখল, কোরবানির ছাগল জবাইয়ের আগের রাতে যেমন কাঁদে, তেমনি নিঃশব্দে কাঁদছে লুইসা পিয়েত্রো। দরদর

করে জল ঝরছে চোখ থেকে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে অব্যক্ত ব্যথায় গোঙাচ্ছে ওর ভিতরটা।

চলে গেল লুইসা পিয়েত্রো।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল রানা। এ কি করল সে? খেলা খেলা মজা করতে গিয়ে এ কী কাণ্ড বাধিয়ে বসল? খেলাতে গিয়ে নিজের জালে আটকে গেছে লুইসা পিয়েত্রো, অন্য কোন পরিস্থিতি হলে প্রাণ ভরে হাসত রানা, কিন্তু কেন যেন হাসি তো এলই না, কেমন একটা টনটনে ব্যথা অনুভব করল সে বুকের ভিতর।

একেই বুঝি মোহ বলে? রানা জানে, প্রেম নয়—মোহে পড়েছে মেয়েটা। কিন্তু এরও দাম আছে, জীবনের চলার পথে এটাও তুচ্ছ করবার ব্যাপার নয়। কোনকিছুই ফেলনা নয়। এসব মানুষেরই মনের অভিব্যক্তি। এখন এটাই সত্য।

হ্যাঁ। এ কান্নায় কোন ভেজাল নেই। অন্তর থেকেই আসছে এটা।

মাথা ঝাড়া দিল রানা। কেটে যাবে। কেটে যাওয়ার জন্যেই আসে মোহ। কিন্তু যদি কোনদিন প্রয়োজন হয়, এ মেয়েটার বুকে ছুরি ঢোকাতে পারবে ও? লুইসা পারবে ওর কপাল লক্ষ্য করে পিস্তল ছুঁড়তে? মানুষের সব কিছুতেই কী আশ্চর্য জটিলতা! প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে রানাকে বাঁদর নাচ নাচাতে এসেছিল মেয়েটা। দলের নেতা সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানাকে ভেনিস থেকে তাড়াতে হবে, এখানে রানার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়, তাই একে পাঠানো হয়েছে রানাকে ভুল পথে পরিচালনা করবার জন্যে। কর্তব্য সম্পাদন করেছে মেয়েটা, করতে গিয়ে আটকে গেছে মোহ জালে। এর কোনও ওষুধ নেই। জীবনের এ এক বিচিত্র খেলা। এ খেলার আদি অন্ত বুঝতে পারে না রানা।

খোলা দরজায় এসে দাঁড়াল গিলটি মিঞা।

'কোতাউ চললেন নাকি আবার?'

'হ্যাঁ। এসো। খোঁজ বের করতে পারলে?'

'নিচ্চয়। আমি হাত দিয়েচি, কিন্তুক হোইনি, কোন্ কাজটা আচে বলুন? একেবারে নাড়ী-নক্ষত্ত, সব বিত্তান্ত নিয়ে এসেচি। বাপের সাথে থাকত মেয়েটা। ল্যাংড়া বুড়ো। ছোট এক ভাই আচে।'

'থাকে কোথায়?'

'ফনডামেন্ট নোভে ওটিভিয়ানি রেস্তোরাঁর কাচেই ওদের একটা ছোট্ট বাসা আচে। দশ নম্বর বাড়ি।'

'বাপটা জানে যে মেয়ে মারা গেছে?'

'জানে। মাচির মত ভ্যান ভ্যান করছে পুলিস ওর চারপাশে। একেবারে পাথর হয়ে গেচে বুড়ো। মেয়ের আয়েই চলত সংসার। একোন্ আর উপার্জনের কেউ রইল না।'

'ওটিভিয়ানি রেস্তোরাঁটা ঠিক কোথায়?'

'রিও ডি প্যানাডার কাচে। চলুন না, যকোন বলবেন নিয়ে গিয়ে হাজির করব।'

'না। আমার একাই যেতে হবে। তুমি আজ প্যারিস চলে যাচ্ছ।' গিলটি মিঞার চোখ বড় হয়ে যেতে দেখে হাসল রানা। 'আমিও যাচ্ছি। পড়ুয়া পর্যন্ত। বসো, বলছি সব।'

রানাকে জিনিসপত্র গোছগাছ করে সুটকেসে তুলতে দেখে এগিয়ে এল গিলটি মিঞা।

'আমাকে দিন, স্যার। আমি গুচিয়ে দিচ্চি।'

'তুমি বসো ওই সোফায়। যা বলি মন দিয়ে শোনো।'

বসল না কিছুতেই গিলটি মিঞা। বলল, 'ধরে নিন বসেই আচি। বলুন, শুনচি মন দিয়ে।'

আজকের ঘটনা আগাগোড়া সবটা বলল রানা। চুপচাপ শুনে গেল গিলটি মিঞা, একটি কথাও বলল না। রানার বক্তব্য শেষ

হতে প্রথমে নাক চুলকাল, তারপর কান চুলকাল, তারপর মাথার পেছনটা।

'এই যদি অবস্তা হয়, তাহালে আর বেহুদা যাচ্চি কেন?'

'বলছি। আগে কি করতে হবে শুনে নাও। তুমি আলফ্রেডো হোটেলে গিয়ে খোঁজ করবে অনিলের। আমার যতদূর বিশ্বাস, কাউকে পাবে না ওখানে। কিন্তু যদি পাও,' পকেট থেকে অনিলের ছবি বের করে দিল রানা, 'এই ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নেবে। ছবিটা মিলে গেলে ওকে বলবে জরুরী তার পেয়ে আমি লন্ডনে চলে গিয়েছি, প্যারিসের চাথাম হোটেলে একটা স্যুইট ভাড়া করে থাকতে বলেছি তোমাদের দুজনকে, আমি আসছি আগামীকাল সন্ধ্যায়। যদি চেহারা না মেলে তাহলে ওদের বুঝতে দেবে না যে তুমি কিছু টের পেয়েছ, বলবে, জরুরী তার পেয়ে আমাকে লন্ডন চলে যেতে হয়েছে, দিন সাতেক পরে দেখা করব ওর সঙ্গে, তোমাকে পাঠিয়েছি ততদিন ওকে ওই হোটেলেই থাকবার অনুরোধ জানাবার জন্যে।'

'আর যদি কাউকে না পাই?'

'তাহলে ছবিটা দেখাবে রিসেপশন ক্লার্ককে। অনিলকে চিনতে পারে কিনা দেখবে। আমার মনে হয় পারবে না। সঠিক খবরটা জানা দরকার আমার।'

'আর ইতিমধ্যে এরা মনে করবে যে আপনি এ শহর ছেড়ে চলে গেচেন, অতচ নুকিয়ে নুকিয়ে এদের কাজকম্মো দেকবেন। এই তো?'

'ঠিক বলেছ, ওদের কাজকর্মও দেখব, নিজের কাজকর্মও করব। লিডো থেকে এয়্যার-ট্যাক্সি ভাড়া করব আমরা। ওখানে এদের লোক নজর রাখতে পারে, কাজেই আমিও উঠব তোমার সঙ্গে প্লেনে। পড়ুয়ায় নেমে ফিরে আসব আমি এখানে ছদ্মবেশে। সারাগাত হোটেলে উঠব। ওখানেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ

করবে তুমি।'

'আর এই বাড়িটা?'

'সাতদিনের ভাড়া দেয়া আছে, আমরা ফিরে তো আসছিই, তাছাড়া মালপত্রও সব নিচ্ছি না। ক্ষতি কি, থাকুক এটা পাঁচদিন খালি পড়ে।'

'আরাকটা কতা। টাকা আসচে কোত্থেকে? আপনার কাচে যা আচে সে তো পেলেন্ ভাড়া করতেই...'

'ও নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না, গিলটি মিঞা। সারাগাত ক্যাসিনোতে জুয়ো খেলব দরকার হলে।'

যে কোন ধরনের জুয়া খেলায় রানার আশ্চর্য ভাগ্যের কথা জানা আছে গিলটি মিঞার। তাই বিনা দ্বিধায় মেনে নিল রানার বক্তব্য। টাকার চিন্তা দূর হলো।

'এবার তোমার মালপত্র গুছিয়ে নাও। আমি ফোন করি এয়ারপোর্টে।'

নয়

জেটিতে ভিড়ছে ভ্যাপোরেটো। সান যাকারিয়া জেটি।

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা একহারা চেহারার এক ঈজিপ্শিয়ান ট্যুরিস্ট। গাঢ় নীল রঙের আধ-পুরানো স্যুট, মাথায় কালো ডেনহাম হ্যাট, গাল ভর্তি সুন্দর করে ছাঁটা দাড়ি, পিঠে বাঁধা একটা ক্যানভাসের রাকস্যাক। অবাক চোখে দেখছে সে ভেনিস নগরীর অপরূপ সান্ধ্য-সৌন্দর্য।

জনা ছয়েক আমেরিকান ট্যুরিস্টের পেছন পেছন নেমে এল রানা। এ বেশে ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবও চিনতে পারবে না ওকে। এখন ও পদব্রজে পৃথিবী পর্যটনরত এক ঈজিপশিয়ান যুবক।

ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল রানা। সান মার্কো পেরিয়ে

হাঁটছে সে সান মারিয়া ফরমোজার দিকে।

হঠাৎ আঁৎকে উঠল রানা ডানপাশের একটা গলি দিয়ে সাদা হ্যাট, সাদা স্যুট পরা লম্বা লোকটাকে বেরিয়ে আসতে দেখে। রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার নিরুৎসুক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল লোকটা। চিনতে পারেনি।

হাঁপ ছাড়ল রানা। সামান্য একটু কমিয়ে দিল চলার গতি, হাঁটতে থাকল লোকটার পিছু পিছু। মোড়ের কাছে একটা মদের দোকানে ঢুকল লোকটা। দরজার কাছাকাছি বসল একটা টেবিলে। রানা এসে দাঁড়াল দোকানের সামনে, ট্যুরিস্টসুলভ ইতস্তত করল একটু, তারপর ঢুকে পড়ল দোকানের ভিতর।

সাদা হ্যাট পরা লোকটা মুখ তুলে দেখল রানাকে, তারপর কাউন্টারে দাঁড়ানো মেয়েটাকে ইশারা করল কাছে আসার জন্য। কাছাকাছিই একটা টেবিলে বসল রানা।

মেয়েটা কাছে আসতেই অস্বাভাবিক জোরে বলে উঠল রানা, 'ভিনো রোজ। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে গেল মেয়েটার, বিদেশী বলে মাফ করে দিল, মাথাটা সামান্য ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল সামনের লোকটার কাছে। এক বোতল হোয়াইট শিয়ান্টি চাইল লোকটা।

একটা সিগারেট ধরিয়ে দরজা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল রানা।

রানার টেবিলে একটা বোতল আর গ্লাস নামিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল মেয়েটা সাদা হ্যাট পরা লোকটার টেবিলের দিকে।

'ইল সিনর গীয়ান এসেছিল আজ?' জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'আসার কথা ছিল।'

'না তো। আসেননি আজ।'

একটা সিগারেট ধরাল লোকটা। গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে রইল বোতলটার দিকে।

রাকস্যাক থেকে আল আহরামের একটা কপি বের করে চোখের সামনে মেলে ধরল রানা। মনোনিবেশ করল পড়ায়। গীয়ান কে? মোটা লোকটা?

বোতলটা আধাআধি খরচ হওয়ার আগেই একটা ছায়া পড়ল দরজার কাছে, ভেতরে ঢুকল কালো হ্যাট ও স্যুট পরা বেঁটে মোটা লোকটা। তাহলে এই ব্যাটাই গীয়ান। চট করে সরে এল রানার দৃষ্টি আবার কাগজের ওপর।

'দেরি হয়ে গেল, ওড্ডি।' একটা চেয়ার টেনে নিল গীয়ান, বসে পড়ল ধপাস করে। 'ঘাড়টা এখনও যা টনটন করছে না! নড়াতে পারছি না।'

'গুলি মারো তোমার ঘাড়। ঘাড়ের নিকুচি করেছি আমি। আমার চোয়ালটা তোমার ঘাড়ের চেয়ে কম ব্যথা পায়নি, সেই চোয়াল নিয়ে পনেরো মিনিট ধরে অপেক্ষা করছি আমি তোমার জন্যে।'

'তুমি মার খেয়েছ তোমার নিজের দোষে।'

'আর তুমি খেয়েছ পরের দোষে, নাকি?'

চোখমুখ বিকৃত হয়ে গেল গীয়ানের, হিংস্র একটা ভাব ফুটে উঠল চোখের দৃষ্টিতে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'পেয়ে নিই শালাকে! আর একটাবার!'

'তোমার জন্যে ঘাড় পেতে বসে আছে তোমার শালা। খোঁজ খবর রাখো না কিছু? দুপুরে চলে গেছে ব্যাটা প্যারিসে।'

'আসবে তো আবার। ঠক খেয়ে ফিরবে না? তখন...' দাঁতে দাঁত চাপল মোটা। ফুলে উঠল চোয়ালের শক্ত পেশী।

'তোমার আর শোধ নেয়া হবে না, চাঁদ। ও ফিরতে ফিরতে আমরা আমাদের কাজ শেষ করে ফিরে যাব দেশে।' হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল ওড্ডি। 'চলো ওঠা যাক। কাজ পড়ে রয়েছে।'

ঘাড়টাকে কষ্ট না দিয়ে কোমর থেকে ওপরের অংশটা ঘুরিয়ে রানার দিকে চাইল গীয়ান। পত্রিকার গায়ে আরবী আঁকিঝুঁকি দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে সোজা হয়ে বসল। 'দাঁড়াও, কয়েক ঢোক খেয়ে যাই।'

'উঁহুঁ, উঠে পড়ো। সময় নেই।'

উঠে পড়ল দুজন, বাঁ দিকে চলে গেল ওরা হাঁটতে হাঁটতে।

ওরা চোখের আড়াল হতেই বিল চুকিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল রানা। চারপাশে চাইতে চাইতে এগোল সে ওদের পিছু পিছু। সামনের মোড়ে পৌঁছে দেখতে পেল রানা ওদের। একটা দোতলা বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তালায় চাবি লাগিয়েছে লম্বা লোকটা, অর্থাৎ ওড্ডি।

একটু আড়ালে সরে গেল রানা। সবুজ পেইন্ট করা একটা দরজা খুলে গেল। ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল দু'জন। বাড়ির নম্বরটা পড়ল রানা–২২/এ, ক্যাম্পো ডি সালিযো। কাছাকাছি গিয়ে বাড়িটা ভাল করে পরীক্ষা করবার ইচ্ছেটা দমন করল সে। দোতলার কোন দরজা দিয়ে কেউ ওকে দেখে ফেললে ছদ্মবেশ ধরার উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ওটিভিয়ানি রেস্তোরাঁর দিকে হাঁটতে শুরু করল রানা গিলটি মিঞার নির্দেশিত পথে।

রিও ডি প্যানাডা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হলো না। জমজমাট ওটিভিয়ানি রেস্তোরাঁ পেরিয়ে এগিয়ে গেল রানা দুপাশের বাড়ির নম্বরগুলো পড়তে পড়তে।

একটা হুইল চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে আছে কুরিযো মাযিনি। ঘরের চারপাশে একনজর চোখ বুলিয়েই বুঝল রানা, নেহাত গরীবি চালে সংসার চালাতে হত জুলিকে। পাসেল্লী গ্লাস ফ্যাক্টরিতে নিশ্চয়ই তেমন কিছু বেতন পেত না মেয়েটা।

কোনমতে কায়ক্লেশে চলত সংসার। ঘরে আসবাবের মধ্যে খটখটে দুটো চেয়ার, আর একটা পুরানো আমলের ডবল-বেড খাট।

পাথরের মত বসে আছে কুরিযো মাযিনি। কঠোর একটা ভাব ফুটে রয়েছে ভাঁজ পড়া হলুদ মুখে, কপালে। সব আশা ভরসা নির্মূল হয়ে গেলে মানুষ যেমন বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায় দুনিয়ার সব কিছুর ওপর, তেমনি একটা ভাব বৃদ্ধের চোখের স্থির দৃষ্টিতে।

রানার মুখের দিকে নিশ্চলক চেয়ে রইল বৃদ্ধ কয়েক সেকেন্ড। তারপর বলল, 'আজ আমাকে মাফ করতে হবে, সিনর। কোন অভ্যর্থনা করতে পারব না আমি আজ আর। মেয়েটা মারা গেছে। আপনারা কি একটু নিরিবিলিতে থাকবারও সুযোগ দেবেন না আমাকে?'

কঠোর তিরস্কার শুনে একটু হকচকিয়ে গেল রানা প্রথমটায়। তারপর আমতা আমতা করে বলল, 'আপনার মেয়ের মৃত্যুর ব্যাপারেই এসেছি আমি। কিভাবে মারা গেল জুলি সে ব্যাপারে কিছুটা জানি আমি। আপনাকে জানানো দরকার বলে মনে করলাম।'

'কে আপনি? পুলিসের লোক?'

'না, আমি পুলিসের লোক নই। আমার নাম মাসুদ রানা। আমার নাম হয়তো আপনার মেয়ের মুখে শুনে থাকবেন...'

'মিথ্যে কথা!' প্রায় গর্জন করে উঠল একজন পাশের ঘর থেকে। পর্দা সরিয়ে ঢুকল এঘরে। 'মিথ্যে কথা বলছে লোকটা, বাবা। আমি চিনি ইল সিনর মাসুদ রানাকে। এ লোক সে লোক নয়।'

রানা দেখল ঘরে ঢুকল ঝাড়া সোয়া ছ'ফুট লম্বা গনডোলার সেই বডি-বিল্ডার ছোকরা মাঝি। আধ হাত লম্বা একটা ছোরা ওর হাতে। ঘরের ঠিক এমন জায়গায় এসে দাঁড়াল যেখান থেকে এক

লাফে রানার ঘাড়ে পড়া যাবে যদি ও পালাবার মতলব করে।

'আমি কিন্তু তোমাকে চিনতে পারছি, বাত্তিস্তা।' হাসল রানা। 'সকালে অবশ্য জানতাম না যে তুমিই জুলির ভাই। আমার গলা শুনে চিনতে পারছ না এখনও?'

কটমট করে চেয়ে রইল ছেলেটা রানার মুখের দিকে।

'না। চিনতে পারছি না!' সন্দেহ ফুটে উঠল ওর চোখে।

'বেশ তো, আমার দু'চারটে কথা শুনলেই চিনতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু তার আগে বসতে পারি?'

'বসুন।' সতর্ক প্রহরায় রইল বাতিস্তা।

বৃদ্ধের দিকে ফিরল রানা। 'আচ্ছা, অনিল চ্যাটার্জীকে চেনেন তো?'

সচকিত হয়ে ছেলের দিকে চাইল একবার বৃদ্ধ।

'নামটা পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তাতে কি?'

'অনিল আমার বন্ধু। এই ভেনিসে নিখোঁজ হয়েছে সে। গতকাল আমি এসেছি এখানে ওর খোঁজে। অনিলের মা আমাকে বলেছিলেন গিয়াকোমো পাসেল্লীর দোকানে কাজ করে জুলি মাযিনি বলে এক মেয়ে, তার কাছে অনিলের খোঁজ পাওয়া সম্ভব। কাল সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম ওই দোকানে। আপনার মেয়ে আমাকে চিনতে পেরে অনিলের নাম দিয়ে একটা কাঁচের ডিজাইন তৈরি করে ধরল আমার চোখের সামনে এমন ভাবে, যেন আর কেউ দেখতে না পায়। আমি বুঝতে পারলাম ও ওই দোকানে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। রাত সাড়ে এগারোটার দিকে ফ্লোরিয়ানের সামনে দেখা হলো আমাদের। কিন্তু ততক্ষণে আমার পেছনে গীয়ান আর ওড্ডি নামে দুই জন লোক লেগে গেছে, আমি টের পাইনি। আমাকে একটা গলিতে নিয়ে গেল জুলি, আমি আমার পরিচয় দিতেই ৩৭ নম্বর মনডোলো লেনে যেতে বলল। আর বেশি কিছু বলবার আগেই গীয়ান এসে হাজির হলো,

অপ্রস্তুত অবস্থায় মেরে অজ্ঞান করে ফেলল আমাকে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে আমি ওই ঠিকানায় গিয়ে হাজির হলাম। অনিলকে পেলাম না, আপনার মেয়েকে পেলাম হাত-পা বাঁধা, মৃত।'

হাত দুটো মুঠি পাকিয়ে চোখ বুজল বৃদ্ধ। ক্ষোভে দুঃখে ফ্যাকাসে হয়ে গেল বাতিস্তার মুখের চেহারা। এই ভয়ঙ্কর দুঃখের খবরটা সহ্য করে নেয়ার জন্যে কিছুক্ষণ সময় দিল রানা ওদের। সিগারেট বের করে ধরাল। আধমিনিট পর চোখ খুলল বৃদ্ধ।

'থামলেন কেন। বলুন। আরও কিছু বলবেন, সিনর?'

'আর বিশেষ কিছুই বলবার নেই। সেই থেকে আমার গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়েছে। আজ সকালে স্ট্যাচু দেখতে যাচ্ছিলাম, জুটে গেল একটা মেয়ে। আমাকে ভেনিস থেকে অন্যখানে সরাবার জন্যে পাঠানো হয়েছিল মেয়েটাকে। ও আমাকে মিথ্যে সংবাদ দেয় যে তিনদিন আগে অনিলকে প্যারিসের পথে ট্রেনে তুলে দিয়েছে। যে হোটেলের ঠিকানা বলল সে হোটেলে ফোন করে কথা বললাম আমি অনিলের সঙ্গে।'

'অনিল চ্যাটার্জীর সঙ্গে?' নিজের অজান্তেই জিজ্ঞেস করে বসল বাতিস্তা।

'নকল অনিলের সাথে। আমি ওদের বুঝতে দিলাম না যে টের পেয়ে গেছি ব্যাপারটা। অনিলের আহ্বানে আজ দুটোর সময় রওনা দিলাম আমি প্যারিসে, এয়ার-ট্যাক্সি চার্টার করে উঠলাম তাতে। পড়ুয়ায় নেমে ফিরে এসেছি আমি আবার। আমার তথ্য দরকার। শুধু যে অনিলকে উদ্ধার করতে চাই তা নয়, জুলির নির্মম হত্যার প্রতিশোধও নিতে চাই আমি। কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করবেন আমাকে?'

লম্বা দুই পা ফেলে এগিয়ে এল বাতিস্তা, নিচু হয়ে ঝুঁকে পরীক্ষা করল রানার মুখ, তারপর বলল, 'মনে হচ্ছে চিনতে পারছি এবার। ছদ্মবেশ নিয়েছেন আপনি, সিনর মাসুদ রানা।

ছুরিটা কোমরে গুঁজে রাখল সে কথাটা বলতে বলতে।

'নিতে বাধ্য হয়েছি। বসো, বাতিস্তা। আজ সকালে গনডোলায় কি যেন বলতে চেয়েছিলে তুমি আমাকে। কি সেটা?'

'যা বলতে চেয়েছিলাম তা আপনি নিজেই বের করে নিয়েছেন। বলতে চেয়েছিলাম, হয় মিথ্যে নয় ভুল কথা বলছেন ভদ্রমহিলা।'

'বলোনি কেন?'

'ভরসা পাইনি। সিনোরিনার সাথে আপনার যে রকম মাখামাখি দেখলাম, তাতে আর...'

'বুঝতে পেরেছি। বৃদ্ধের দিকে ফিরল রানা। 'আপনার সাহায্য দরকার আমার, সিনর মাযিনি।'

'আমি কি করে সাহায্য করব আপনাকে? খোঁড়া মানুষ। নড়তে পারি না। যদি পারতাম, আমার কাছে সাহায্য চাইতে হত না আপনার।'

'আমি সাহায্য করব আপনাকে,' বলল বাতিস্তা। 'জুলির হত্যাকারীকে নিজ হাতে খুন করতে না পারলে ঘুম আসবে না আমার চোখে।'

'মেয়েটা গেছে, ছেলেটাও যাবে,' উদাস কণ্ঠে বলল বৃদ্ধ। 'সবই শেষ হয়ে যাবে আমার। কিন্তু তাই বলে ওকে বারণ করবার উপায় আমার নেই। ওর বোনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতেই হবে ওকে, সিনর মাসুদ রানা। আমি সক্ষম হলে আমাকেও আটকাতে পারত না কেউ। কি করব, পোড়া কপাল, ল্যাংড়া হয়ে গেছি। বুড়ো বয়সে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে এ বাড়ি ও বাড়ি।'

'মরব না, বাবা। এখনও সেই ছোটটি আছি মনে করো কেন তুমি?' রানার দিকে ফিরল। 'জানেন সিনর, জুলিও তাই মনে করত। কিছুতেই কাজে লাগতে দেয়নি আমাকে। জোর করে ভর্তি করে দিয়েছে ইউনিভার্সিটিতে। কি কষ্টই না করত বেচারী!

কোনরকমে কায়ক্লেশে চালাত সংসার, কিন্তু জানেন, আজ পর্যন্ত এক মাসের বেতনও বাকি পড়েনি আমার।' গলাটা কেঁপে গেল বাতিস্তার। 'বলত, লক্ষ্মী ভাইয়া আমার, জেদ করে না, বাবার মত বিরাট পণ্ডিত হতে হবে তোমাকে। ও নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে ওর দুষ্টু ভাইয়া নাম লিখিয়েছে আজ গনডোলা স্টেশনে। ওর আত্মাটা নিশ্চয়ই কেঁদে কেঁদে...'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল বাতিস্তা। মুখ ঢাকল দুহাতে। ওর বাহুতে হাত রাখল রানা। দেখতে দেখতে রানারও দুচোখ বেয়ে নামল ঢল। আটকাতে পারল না কিছুতেই। অবাক হয়ে চেয়ে রইল বৃদ্ধ রানার মুখের দিকে। ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠল ওর শুকনো, কঠোর চোখ দুটো। তারপর তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার করে মুখ ঢাকল সে-ও। সারাদিন এক ফোঁটা কাঁদতে পারেনি বৃদ্ধ, পাথরের মত জমে গিয়েছিল, বিদেশী এক যুবকের সমবেদনায় পাথর গলে নামল ঝর্ণা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বাচ্চা ছেলের মত।

'কি সাহায্য চাও তুমি, সিনর?'

'কিছু তথ্য। আপনি জানতেন আপনার মেয়ের সাথে পরিচয় ছিল অনিল চ্যাটার্জীর?'

'জানতাম। ওরা ভালবাসত পরস্পরকে।'

'অনিল কি এখন ভেনিসে?'

'খুব সম্ভব,' বলল বৃদ্ধ। পালিয়েও গিয়ে থাকতে পারে। তবে আমার মনে হয় সেটা সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে।'

'কেন? ও কি জখম হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। গুলি খেয়েছিল। বাঁ কাঁধে। শরীরের মধ্যে রয়ে গেছে গুলিটা।'

'গুলি খেয়ে সাহায্যের জন্যে এসেছিল?'

'হ্যাঁ। সতেরো দিন আগে। আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দরজায় ঠক ঠক আওয়াজ। বাতিস্তা এক্সকারশনে গিয়েছিল, বাড়িতে আমি আর জুলি ছাড়া কেউ নেই। এঘরে এল জুলি, ওকে বারণ করলাম দরজা খুলতে। ততক্ষণে আর টোকার শব্দ নেই, মনে হচ্ছে কে যেন আঁচড়াচ্ছে দরজার গায়ে নখ দিয়ে। হয়তো মনটা আগাম দিয়েছিল, বারণ শুনল না জুলি, খুলল দরজা। হাতের কাছে কোন অস্ত্র পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করছি, এমন সময় দেখলাম অনিলকে ধরে নিয়ে আসছে জুলি ঘরের ভেতর। ক্লান্তির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল অনিল, প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে একেবারে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ার আগে কোন মতে বলল, ওর পিছু ধাওয়া করে লোক আসছে, ওকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেখেও থাকতে পারে। ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল জুলি, কোনমতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল ওকে পাশের ঘরে, শুইয়ে দিল ওর বিছানায়। সাত-আট দিনের ক্ষত, ইনফেকশন মত হয়ে গেছে। ক্ষতটা ড্রেসিং করতে শুরু করল জুলি, আমি জানালা দিয়ে বাইরে চোখ রেখে বসে রইলাম। দুজন লোককে দেখতে পেলাম এইদিকেই আসছে। এক জন লম্বা, অপরজন খাটো। এ বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেল লোকদুটো, বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।'

'ওদের একজনের মাথায় সাদা হ্যাট ছিল?'

'ছিল।' মাথা ঝাঁকাল বৃদ্ধ।

'ওরা দুজনই খুব সম্ভব খুন করেছে আপনার মেয়েকে,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা।

'জানি। আঁচ করতে পারছি। শাস্তি হবে না ওদের, সিনর?'

'হবে। এ নিয়ে ভাববেন না আপনি।' রানার মুখে দৃঢ় সংকল্প দেখতে পেল বৃদ্ধ। উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করল রানা কিছুক্ষণ,

তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'কতদিন ছিল ও এখানে?'

'একদিন। তাও কি থাকতে চায়? জখমটা ধুয়ে ড্রেসিং করে খানিকটা গরম দুধ খাওয়াতেই কিছুটা শক্তি ফিরে পেল অনিল। একটু সুস্থির হয়ে যখন বুঝতে পারল কতবড় বিপদের মধ্যে ফেলতে যাচ্ছে ও আমাদের, তখুনি চলে যাওয়ার জন্যে জেদ ধরল। পরদিন রোববার ছিল। অনেক বলে কয়ে সেদিনটা এখানে থাকতে রাজি করাল ওকে জুলি। সারাদিন খুঁজে পেতে কিছুদিন লুকিয়ে থাকার মত একটা জায়গা বের করে ফেলল, রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে গেল ওরা।'

'কেন পালিয়ে বেড়াচ্ছে বলেনি ও আপনাদের?'

'জুলিকে বলেছিল কিনা আমি জানি না। আমি জিজ্ঞেস করিনি। যেটুকু এমনিই জানতে পেরেছিলাম তা হচ্ছে, মস্ত বিপদে পড়েছে ও, একটা সংঘবদ্ধ দল রোম থেকে তেড়ে এখান পর্যন্ত এসেছে। পর পর তিনবার ওর প্রাণের ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। গুলি করেও ধরতে পারেনি ওরা ওকে। শেষ মুহূর্তে, যখন ধরা পড়ে পড়ে, তখন কোনমতে পৌঁছেছিল ও এ বাড়িতে।'

'কারা ওর পেছনে লেগেছিল সে ব্যাপারে কিছু জানতে পারেননি?'

'না। জিজ্ঞেসও করেনি। কারণ আমি জানি, এসব কথা না জানাই ভাল। নির্যাতনের মুখে কোন কথাই শেষ পর্যন্ত গোপন রাখা যায় না। আগে হোক পরে হোক, সত্যি কথাটা বেরোবেই।'

ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। যাই হোক, রোববার সারাদিন ছিল ও এখানে, তারপর কি হলো?'

'সন্ধের পর নিয়ে গেল জুলি ওকে মনডোলোর একটা নির্জন পরিত্যক্ত বাড়িতে। অনিলের ইচ্ছে ছিল, কিছুটা সুস্থ বোধ করলেই ভারতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করবে।'

'ভারতে?' অবাক হলো রানা। 'ভারতে ফিরে যেতে চেয়েছিল ও?'

'হ্যাঁ। ও বলেছিল যত শীঘ্রি সম্ভব দেশে ফিরে যাওয়া দরকার ওর।'

তাই যদি হবে তাহলে ওকে বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী হিসেবে চিত্রায়িত করবে কেন রঞ্জন চৌধুরী? কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকছে ব্যাপারটা রানার কাছে। অবশ্য মিথ্যে কথাও বলে থাকতে পারে অনিল। সত্য-মিথ্যা যাচাই করবার কোন উপায় নেই এখন। যাচাই ঠিকই করে নেবে রানা–সময় আসুক।

'তারপর কি হলো? কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠল?'

'না, সিনর। বরং খারাপের দিকেই যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। অনিল যে গুলি খেয়েছে সেটা জানা ছিল ওদের, ডাক্তার ডাকতে গেলেই ধরে ফেলবে, তাই ডাক্তারের সাহায্য নেয়া সম্ভব হয়নি। গুলিটা রয়ে গিয়েছিল শরীরের মধ্যে, পুঁজ হতে আরম্ভ করল ক্ষতস্থানে। গায়ে জ্বর। আমি দর্শন শাস্ত্রের লোক, যতটা পারি ডাক্তারী বই ঘেঁটে গ্যাংগ্রিন ঠেকাবার ওষুধ বাতলে দিই জুলিকে, ও গিয়ে যেমন ভাবে পারে প্রয়োগ করে সে ওষুধ অনিলের ওপর। কিন্তু কদিন পর সেটাও প্রায় বন্ধ হয়ে এল। তিনদিন পর সাদা হ্যাট পরা লোকটা গিয়ে হাজির হলো পাসেল্লীর দোকানে। আমার বর্ণনার সাথে মিলিয়ে চিনতে পারল জুলি ওকে। জুলির সাথে যে অনিলের আলাপ ছিল সেটা জানা ছিল পাসেল্লীর। ওরা বুঝে নিল এ বাড়ির কাছাকাছি এসে অনিলের হারিয়ে যাওয়ার রহস্য। আমাদের বাড়ির চারপাশে পাহারার ব্যবস্থা করা হলো, জুলিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, লোক লেগে গেল ওর পছনে। বহু কষ্টে ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে যেতে হত জুলিকে অনিলের কাছে। কখনও দুদিন কখনও বা চারদিন সম্ভব হত না যাওয়া। এমনি সময় ভিয়েনায় ইন্টারপোলের একটা কনফারেন্সের কথা কাগজে

দেখে আশার আলো জ্বলে উঠল অনিলের মনে। জুলিকে বলল, বাংলাদেশের এক দুর্ধর্ষ যুবক আসবে এই করফারেন্সে। ওর নাম মাসুদ রানা। শুনেছে সে, বিপদে পড়ে সাহায্য চাইলে শুধু হাতে ফিরিয়ে দেয়নি সে আজ পর্যন্ত কাউকে। যেমন সৎ, সাহসী, দেশপ্রেমিক, তেমনি বিরাট মহৎ হৃদয় আছে ছেলেটার মধ্যে। যদি কারও সাধ্য থাকে ওকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার...'

খুক খুক করে কাশল রানা। আসলে লজ্জা পেয়েছে ও। চট করে জিজ্ঞেস করল, 'মামা বাড়ির ঠিকানায় একটা পোস্ট কার্ড ছেড়ে দিল, এই তো?'

'হ্যাঁ। তোমার হাতে পৌঁছেছিল সেটা তাহলে ? সরাসরি মায়ের ঠিকানায় পাঠাতে সাহস পায়নি অনিল, পাছে ওটা পোস্ট করতে গিয়ে জুলি ধরা পড়ে যায় ওড্ডি বা গীয়ানের হাতে। যাই হোক এরপর তোমার জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না জুলির। যতই দিন যাচ্ছে ততই পাগলা কুকুর হয়ে উঠছে ওরা। এদিকে দিন দিন দুর্বল হতে হতে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে কারও সাহায্য ছাড়া নড়াচড়া করাও মুশকিল হয়ে পড়েছে অনিলের পক্ষে। হঠাৎ একরাতে গীয়ান এসে ঢুকল এ বাড়িতে। জুলি তখনও ফেরেনি। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজল লোকটা, কিছু না পেয়ে চলে গেল। একটি কথাও বলার প্রয়োজন মনে করল না আমার সঙ্গে। একা ছিলাম, পঙ্গু, কিছুই করতে পারলাম না। কিন্তু বুঝলাম, অবস্থা চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। জুলিকে বললাম সব, সাবধান করলাম, কিন্তু লাভ হলো না। গতকাল সকালে কাজে চলে গেল মেয়েটা, আজ ভোর রাতে পুলিস এসে জানাল মারা গেছে।'

'আপনার কথা শুনে যতদূর মনে হচ্ছে, পালাতে পারেনি অনিল। ধরা পড়েছে ওদের হাতে।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'কেন ওকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল ওরা সে সম্পর্কে কোন রকম ধারণাই হয়নি আপনার?'

'না, সিনর। কারণটা আমি জানি না।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, সিনর।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'এবার চলি আমি।'

রানার সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল বাতিস্তা পাহাড়ের মত দরজা আড়াল করে।

'বাবার সাহায্য নিয়েই উঠে পড়ছেন যে? আমার কি করতে হবে বলে যান।'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল রানা ছেলেটাকে। বয়স কম, উনিশ কি বিশ, কিন্তু ওর পেশীর মধ্যেকার অন্তর্নিহিত শক্তি চিনতে ভুল করল না রানার অভিজ্ঞ চোখ। ঘাড় ফিরিয়ে বৃদ্ধের দিকে চাইল সে। কুরিযো মাযিনির ঠোঁটে অদ্ভুত একটুকরো হাসি।

'ওকে আনডার-এস্টিমেট করো না, সিনর মাসুদ রানা। জুলির হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্মগত অধিকার আছে ওর। দয়া করে বঞ্চিত করো না ওকে।'

বাতিস্তার দিকে ফিরল রানা। 'সবচেয়ে ভাল পার কোন্ কাজ তুমি, বাতিস্তা?'

'মারামারি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল বাতিস্তা।

মৃদু হাসল রানা। 'ভাল। তোমাকে যদি বলি কোন লোক বা বাড়ির ওপর নজর রাখতে হবে...'

'একশোবার পারব। কোন্ লোক?'

'২২/এ ক্যাম্পো ডি সালিযোতে ওড্ডি আর গীয়ানকে ঢুকতে দেখেছি আমি কিছুক্ষণ আগে। জানি না, হয়তো ওরা ওই বাড়িতেই থাকে, কিংবা ঢুকেছে অন্য কাজে। যাই হোক, আগামী তিনটে ঘণ্টা নজর রাখতে হবে বাড়িটার ওপর। বিশেষ অসুবিধে

হবে বলে মনে হয় না, ওটার ঠিক সামনেই একটা কাফে দেখেছি। সেখান থেকে নজর রাখা যাবে অনায়াসে। আমি জানতে চাই এই তিন ঘণ্টায় কে ওই বাড়িতে ঢুকছে কিংবা ওখান থেকে বেরোচ্ছে। পারবে রিপোর্ট তৈরি করতে?'

'পারব না কেন? কঠিন কিছুই দেখছি না এর মধ্যে।'

'কঠিন ব্যাপারও আছে। সেটা হচ্ছে আত্মসংবরণ করা। ওড্ডি বা গীয়ানকে দেখলেই তাদের পিছু ধাওয়া করবার ইচ্ছেটা দমন করতে হবে তোমাকে কঠোর ভাবে। পারবে সেটা?'

'পারব।'

'গুড। ছদ্মবেশ নেয়ার দরকার আছে তোমার?'

'কি দরকার? আমাকে চেনে না ওরা কেউ। গতকাল সন্ধ্যায় ফিরেছি আমি এক্সকারশন থেকে।'

'ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে আপাতত ছদ্মবেশের কোন দরকার নেই। কিন্তু খেয়াল রেখো, কোন রকম আবেগ-প্রবণতা বা কৌতূহলের আতিশয্যকে প্রশ্রয় দিলেই ভণ্ডুল হয়ে যাবে সব। ভুলেও কাউকে অনুসরণ করবে না তুমি, ভুলেও ঢুকবে না ওই বাড়ির ভিতর। কারও গায়ে হাত তুলবে না। রাজি?'

'রাজি।'

'বেশ। ঠিক তিনঘণ্টা পর আমার সঙ্গে দেখা করবে সারাগাত হোটেলের ক্যাসিনোতে। অলরাইট?'

'অলরাইট। কিন্তু এতসব কন্ডিশন দিয়ে আমার হাত-পা বেঁধে একেবারে অথর্ব করে দিচ্ছেন আপনি।'

'ঠিক সময় মত তোমার হাত-পা খুলে দেব আমি, দেখব তখন কত জোরে চালাতে পারো ওগুলো। কিন্তু সে সময়টা নির্ধারণ করবার অধিকার আমাকে দিতে হবে। আমি সিদ্ধান্ত নেব কখন আমরা আক্রমণ করব, কখন পালাব। এর অন্যথা হলে বিপদে পড়ব দুজনই।'

'জানি। এই কাজে নানা মুণির নানা মত চলে না। একজনের নেতৃত্ব মানতে হয়। আপনাকে নেতা হিসেবে মেনে নিতে আমার কোন আপত্তি নেই। আপনার সব কথা মানতে আমি রাজি।'

'ভেরি গুড বয়। তুমিই তাহলে আগে বেরোও। আশেপাশে যদি সন্দেহজনক কাউকে দেখো ফিরে আসবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে। তুমি ফিরে না এলে আমি বেরোব নিশ্চিন্ত হয়ে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল বাতিস্তা।

পাঁচ মিনিট ধরে বৃদ্ধের সঙ্গে কি কথা হলো রানার জানতে পারল না সে।

ঠিক পাঁচ মিনিট পর বেরিয়ে এল রানা।

পঙ্গু বৃদ্ধের কঠোর দুচোখ থেকে ঝরছে তখন আশীর্বাদ।

দশ

ঠিক দশটার সময় ক্যাশ কাউন্টার থেকে প্লেকগুলো ভাঙিয়ে নিল রানা। কোটের দুই পকেটে ভরল পাঁচ হাজার লিরার নোটগুলো। ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে আর সবাই যারা বাজি ধরেছিল। তাক লাগিয়ে দিয়েছে ওদের রানার আশ্চর্য কপাল। ওদের ঈর্ষার কারণ রানার অস্বাভাবিক জয়, অথবা ওদের নিজেদের পরাজয় নয়। হারজিত আছে খেলাতে। খেলোয়াড় ও দর্শকদের মধ্যে এমন খুঁজলে হয়তো এক আধ জন পাওয়া যাবে যারা এর চেয়ে বেশি টাকা জিতেছে জীবনে কোন না কোন সময়। ঈর্ষার আসল কারণ রানার ঠিক সময় মত খেলা বন্ধ করা। জেতা টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে বা যেতে পারছে এটা কল্পনাও করতে পারে না ওরা। নেশায় পেয়ে যায় ওদের। বোর্ড থেকে তোলা টাকা বোর্ডেই রেখে যেতে হয় ওদের, বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য হয় না। হারতে হারতে জেদ চেপে যায়, হারিয়ে যায়

কাণ্ডজ্ঞান। তেমনি হয় জিততে জিততে। আশ্চর্য লোকটার সংযম! উঠে যাচ্ছে!

সবার জন্যে এক পেগ করে ব্র্যান্ডির অর্ডার দিল রানা। টেবিলে এসে দাঁড়াল আর সবার খেলা দেখবার জন্যে। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরপরই চোখটা চট করে ঘুরে আসছে লাউঞ্জের ওপাশের দরজার ওপর থেকে। ঘড়ি দেখল। দশটা পাঁচ। দেরি করছে কেন বাতিস্তা?

পাঁচজন বেয়ারা দ্রুত সার্ভ করছে সবার ব্র্যান্ডির গ্লাস। রানার এই অপ্রত্যাশিত আপ্যায়নে খুশি হলো সবাই। জিতে নিয়ে যাওয়ার বেয়াদবি মাফ করে দিল বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই। একজন বলেই বসল, আমার এই দশ হাজারী প্লেক দুটো আপনি নিজের হাতে একটু চেলে দেবেন, সিনর গামাল? হারলে আপনার কোন দোষ নেই, জিতলে অর্ধেক আপনার।'

হাসল রানা।

'অর্ধেক লাগবে না। রাখুন না, লালে রাখুন। আপনি নিজেই রাখুন।'

'না। আপনার হাতে।' প্রায় জোর করে গুঁজে দিল লোকটা প্লেক দুটো রানার হাতে।

হাতে কাঠি তুলে নিল আবার ক্রুপিয়ে ব্র্যান্ডির গ্লাসটা একজন বেয়ারার হাতে ধরিয়ে দিয়ে। ছোট্ট একটা নড করল রানার দিকে চেয়ে। প্লেক দুটো লাল ঘরে রেখে দিল রানা। ব্যস হিড়িক পড়ে গেল সবার মধ্যে লালে রাখার। হুড়মুড় করে যে যত পারল রাখল লালে। কালো ঘরে শুধু একটা লিরার প্লেক।

ঘুরল রুলেতের চাকা। ছোট্ট আইভরি বলটা ছুটে বেড়াতে লাগল থালার মধ্যে। উৎসুক চোখে চেয়ে রয়েছে সবাই ক্রমে থেমে আসা থালাটার দিকে। রানা চাইল লাউঞ্জের ওপাশের দরজার দিকে। আসছে না কেন এখনও? কোন বিপদে পড়ল?

নাকি গীয়ান বা ওড্ডিকে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে অনুসরণ করেছে? মাথা ঠিক রাখতে না পেরে ঢুকে পড়েনি তো বাড়িটার ভিতর?

কমে এসেছে চাকার গতি। সাদা বলটা ডাব্‌ল্‌ জিরো, অর্থাৎ সবুজ দুটো ঘরের একটায় জমে বসতে গিয়েও কেমন একটা পাক খেয়ে সরে গেল আবার। সব কজন দর্শকের পিলে চমকে উঠেছিল ওটার সবুজ প্রীতি দেখে, ভুশ করে দম ছাড়ল একসঙ্গে। সবুজে পড়লে কেউ পেত না একটি পয়সাও।

লাউঞ্জের ওপাশের দরজা দিয়ে ঢুকল বাতিস্তা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এগোল রানা সেদিকে। এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। সবাই যদি দানটা হেরে যায় তাহলে বিশ্রী একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। আর যদি জেতে তাহলে টানা-হেঁচড়া পড়ে যাবে ওকে নিয়ে, ছাড়তে চাইবে না কিছুতেই। প্রত্যেকটা চোখের দৃষ্টি আঠার মত লেগে আছে হাতির দাঁতের ছোট্ট সাদা বলটার গায়ে, দম বন্ধ করে লক্ষ করছে ওটার মতিগতি, এই সুযোগে কেটে পড়াই ভাল। ক্যাসিনোর কাঁচের দরজার কাছাকাছি এসে শুনতে পেল রানা ক্রুপিয়ের পরিষ্কার কণ্ঠস্বর:

'টোয়েনটি এইট–রেড–হাই অ্যান্ড ইভেন।'

'হো' করে এত প্রচণ্ড এক সমবেত উল্লাসধ্বনি উঠল যে রানার মনে হলো ক্যাসিনোর ছাতটা সাঁ করে উড়ে গিয়ে ঢাকায় পড়বে। শব্দের ধাক্কায় ছিটকে বেরিয়ে গেল সে দরজা দিয়ে। বাতিস্তাকে লিফটে ওঠার ইঙ্গিত করে নিজেও উঠে পড়ল। লিফট এসে থামল ছ'তলায়। লম্বা করিডর ধরে হেঁটে বাঁদিকে সবশেষের ঘরটায় নিয়ে গেল রানা ওকে।

'কি খবর, বাতিস্তা? বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে তোমাকে?' খাটের কিনারে বসে একটা গদি আঁটা চেয়ারে বসবার ইঙ্গিত

করল রানা ওকে।

'হ্যাঁ। বেশ গরম খবর আছে!' বসল বাতিস্তা।

'খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ। ওই রেস্তোরাঁয় বসেই সেরে নিয়েছি।'

'বেশ। শুরু করো তাহলে।' নড়েচড়ে বসল রানা।

পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করল বাতিস্তা। লিখে নিয়ে এসেছে। চোখ বোলাল নোটের ওপর।

'ঠিক আটটা সাতে দেখলাম গিয়াকোমো পাসেল্লীকে। হন হন করে হেঁটে এসে টোকা দিল দরজায়। ভেতর থেকে কে যে দরজা খুলে দিল, দেখতে পেলাম না। ও ভেতরে ঢুকে পড়তেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা।' আবার একবার নোটের দিকে চাইল বাতিস্তা। 'আটটা পঁয়তাল্লিশে তিনজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক ঢুকল বাড়িটায়। চেহারা আর চালচলনে বোঝা গেল ভয়ঙ্কর লোক এরা, কেউ কারও চেয়ে কম নয়। একজনের চেহারাটা চেনা-চেনা লাগলেও প্রথমে চিনতে পারিনি, এই হোটেলে আসার পথে মনে পড়েছে। মাস তিনেক আগে ওর ছবি বেরিয়েছিল কাগজে। সিসিলির দুর্ধর্ষ গুণ্ডা পপিনি। খুন করে ফেরারি রয়েছে সে, খুঁজছে পুলিস। যাই হোক, ওদের একজনের হাতে একটা সুটকেস ছিল। মনে হলো সদ্য এসে পৌঁছেচে ভেনিসে। দরজায় টোকা দিল, দরজা খুলল সাদা হ্যাট পরা সেই লোকটা, ওরা ঢুকে যেতেই আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা।'

রানার বাড়িয়ে ধরা সিগারেটের প্যাকেটের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে নিষেধ করল বাতিস্তা। খায় না। কাগজের ওপর চোখ বোলাল কয়েক সেকেন্ড, তারপর শুরু করল আবার।

'এরপর আধঘণ্টা কিছুই ঘটল না। তারপর বেরিয়ে এল গিয়াকোমো পাসেল্লী। মাথা উঁচু করে আত্মগরিমার ভঙ্গিতে ঢুকেছিল লোকটা বাড়িটায়, কিন্তু বেরিয়ে যখন এল তখন সম্পূর্ণ

আলাদা এক মানুষ। যেন বিধ্বস্ত এক অসুস্থ লোক, বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, ভাবলেশহীন মুখ, চলার ভঙ্গি শ্লথ, শিথিল। মনে হলো ভয়ঙ্কর কিছু দেখে বেরিয়ে এসেছে ও বাড়িটা থেকে। পরিষ্কারভাবে এত কিছু দেখতে পেয়েছি এই জন্যে যে সবুজ দরজা দিয়ে বেরিয়েই সোজা এই কাফের দিকে এগিয়ে এল পাসেল্লী। আমি চট করে একটা খবরের কাগজে মুখ আড়াল করলাম আমাকে চিনে ফেলবে মনে করে। কিন্তু তা না করলেও চলত। কোনদিকে চেয়ে দেখবার মত মানসিক অবস্থা ছিল না ওর। সোজা এসে একটা টেবিলে বসে ব্র্যান্ডির অর্ডার দিল পাসেল্লী। প্রায় ঢক ঢক করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিন পেগ ব্র্যান্ডি খেয়ে দাম দিয়ে কোনদিকে না চেয়ে কারও সঙ্গে একটি কথা না বলে উঠে গেল পাসেল্লী। পকেট থেকে যখন মানিব্যাগটা বের করল, লক্ষ করলাম থরথর করে কাঁপছে ওর হাতটা। দশ মিনিট চুপচাপ—তারপর আরও দুজন লোক ঢুকল বাড়িটায়। দুজনেরই পরনে দামী পোশাক-পরিচ্ছেদ। একজনের বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ মত হবে, ক্লিন-শেভড, দেখতেও দারুণ হ্যান্ডসাম, মাথায় সোনালী চুল, এক নজরেই বোঝা যায় খুবই ধনীলোকের ছেলে, মনে হয় কোনদিন খেলাধুলা বা শরীরচর্চার ধার কাছ দিয়েও যায়নি।'

রানা বুঝে নিয়েছে এ লোক সিলভিও পিয়েত্রো ছাড়া আর কেউ নয়। সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে বালিশে আধশোয়া হয়ে হেলান দিয়ে বসল। জিজ্ঞেস করল, 'সঙ্গের লোকটা?'

'এর সঙ্গের লোকটাকে ভেনিসের সবাই চেনে। ডক্টর আমানান্তি। বিরাট ডাক্তার। বড়লোকদের মধ্যে ওর দারুণ পসার।'

তড়াক করে উঠে বসল রানা।

'এই দুজন ঢুকল ওই বাড়িতে?'

'হ্যাঁ। ডাক্তারের হাতে ব্যাগ দেখে মনে হলো রোগী দেখতে এসেছে। ওই ঢুকল আগে, তারপর ঢুকল ছেলেটা। দেখে মনে হলো আগেও দেখে গেছে ডাক্তার এই রোগীকে এক আধবার। আমার মনে হচ্ছে সিনর চ্যাটার্জীকে ওই বাড়িতেই রাখা হয়েছে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বলল রানা। 'ডাক্তারের উপস্থিতি দেখে এই সন্দেহটা আসাই স্বাভাবিক। যাক, তারপর কি হলো?'

'দশটা বাজতে দশ মিনিটে বেরিয়ে এল ডাক্তার আমানান্তি, চলে গেল। আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে উঠে পড়লাম আমি। ঠিক সময়েই উঠেছিলাম, কিন্তু রাস্তায় পড়ে গেলাম একদল ট্যুরিস্টের ভিড়ে। ওদের ঠেলে ধাক্কিয়ে পথ করে নিয়ে এখানে এসে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল কিছুটা। যাই হোক, এবার আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম কি? আক্রমণ?'

ডান হাতের তালুতে গাল ঘষল রানা। চিন্তা করল মুখচোখ বাঁকিয়ে। তারপর বলল, 'এই মুহূর্তে কমপক্ষে কজন লোক আছে ওই বাড়িতে? তিন, দুই, পাঁচ, আর এক, ছয়। আরও থাকতে পারে। আমরা দুজন পারব না তা নয়, কিন্তু কষ্ট হবে। আর একজন হলে ভাবতাম না। তাছাড়া অনিলকে যদি ওখানে পাওয়া যায় তাহলে ওকে নিরাপদে বের করে আনার জন্যেও লোক দরকার। লোক যখন নেই তখন কিছু একটা কৌশল বের করতে হবে আমাদের। এক কাজ করা যায়—'

হঠাৎ এক লাফে উঠে দাঁড়াল বাতিস্তা। নিজের মনেই বলে উঠল, 'পাগলা ওস্তাদকে বললে কেমন হয়?'

'পাগলা ওস্তাদটা কে?'

'আমাদের ইউনিভারসিটির অ্যাথলেটিক কোচ। খুব সম্ভব সারা ইউরোপের সেরা কোচ ভদ্রলোক। মনে-প্রাণে স্পোর্টসম্যান। খুবই ভাল লোক। ওঁকে বললেই ঝাঁপিয়ে পড়বেন উনি সাহায্য করতে। খুবই ভালবাসেন আমাকে।'

‘ভদ্রলোককে বিশ্বাস করা যায়? নির্ভরযোগ্য?’
‘হানড্রেড পারসেন্ট।’
‘এই গোলমালের মধ্যে জড়াতে চাইবেন উনি? এসব ভয়ঙ্কর লোকদের বিরুদ্ধে যেতে চাইবেন?’
‘চলুন না, গিয়ে দেখা যাক?’
‘সাহায্য পাই বা না পাই, আজই আক্রমণ করতে হবে আমাদের। কাজেই তোমার চেহারাটা একটু বদলে দিই, এসো। তোমাকে এই শহরেই থাকতে হবে তো, আমি চাই না চিনে ফেলুক ওরা তোমাকে।’
দশ মিনিটের মধ্যে চমৎকার একজোড়া গোঁফ গজিয়ে গেল বাতিস্তার নাকের নিচে। পাল্টে গেল সিঁথি। গালে-কপালে কয়েকটা দাগ পড়তেই বয়স বেড়ে গেল আরও বিশ বছর। বিছানার চাদর দিয়ে ছোটখাট একটা ভুঁড়ি তৈরি হলো জুৎসই গোছের।
টেলিফোন করে ডেস্ক-ক্লার্ককে জানিয়ে দিল রানা, অতিরিক্ত জরুরী কোন দরকার না হলে যেন তাকে বিরক্ত করা না হয়, ঘুমাবে সে। কেউ কোন গোলমাল করলে আস্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।
দরজায় তালা মেরে ইমার্জেন্সি ফায়ার-এসকেপের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা নিচে। সবার অলক্ষ্যে বাঁ পাশের গলিপথ ধরে এগিয়ে পড়ল এসে রাস্তায়।

প্রচণ্ড শব্দে নাক ডাকছিল স্টেফানো মন্টিনির।
আস্তে করে ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা। রানা দেখল আধমনী একটা ভুঁড়ি উঠছে নামছে, থরথর করে কাঁপছে ঘরের আসবাব-পত্র। বিপুল বিক্রমে ঘুমাচ্ছে বাতিস্তার ওস্তাদ। প্রকাণ্ড মোটা। লম্বা হবে বড়জোর পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি, কিন্তু গোটা দশেক

রানাকে একসঙ্গে কষে বাঁধলেও ওর সমান মোটা হবে কিনা সন্দেহ। এক একটা বাহু রানার ঊরুর মত। মাথা ভর্তি টাক, কানের পাশ দিয়ে ঘাড়ের পেছন দিকে সামান্য চুলের আভাস পাওয়া যায়—পঁচাত্তর ভাগ পাকা। বয়স পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন। কাঁচা পাকা গোঁফ জোড়া ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে নেমে এসেছে নিচের দিকে, মিশেছে থুতনির কাছে গজানো ইঞ্চিখানেক লম্বা দাড়ির সঙ্গে।
পাশ ফিরল ওস্তাদ। ক্যাঁচম্যাঁচ করে মহা আপত্তি জানাল খাটের উৎপীড়িত স্প্রিং। সেদিকে মোটেই লক্ষ না দিয়ে হালকাভাবে শুরু হলো আবার নাসিকা গর্জন। ক্রমে বাড়তে বাড়তে উঠে যাবে চরম পর্যায়ে।
এর কাছে কতটা সাহায্য পাওয়া যাবে বুঝে নিয়েছে রানা, নিঃশব্দে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত করল সে বাতিস্তাকে। কিন্তু ততক্ষণে ডাক দিয়ে ফেলেছে বাতিস্তা।
‘ওস্তাদ।’
তড়াক করে উঠে বসল ওর ওস্তাদ। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল ওদের দুজনকে।
‘কি চাই?’ গম্ভীর গমগমে কণ্ঠস্বরে কেঁপে উঠল ঘরটা।
‘সাহায্য চাই, ওস্তাদ,’ বলল বাতিস্তা।
‘ওস্তাদ!’ অবাক হয়ে আবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল বাতিস্তাকে। ‘আমি তোমার ওস্তাদ না। এত সুন্দর একটা শরীরে যে ওই...ওই’...আঙুল দিয়ে বাতিস্তার ভুঁড়িতে খোঁচা দেয়ার ভঙ্গি করল স্টেফানো মন্টিনি, ‘ওই রকম একটা ভুঁড়ি গজাতে দেয়, আমি তার ওস্তাদ নই। কেউ হও না তুমি আমার। কোন্ ইয়ারে পাস করেছ?’ কটমট করে চাইল ওস্তাদ বাতিস্তার দিকে।
রানা দেখল এই গতিতে এগোলে পরিচয়পর্ব শেষ হতেই মেলা সময় লেগে যাবে। চট করে বলল, ‘বাতিস্তার বোনকে যারা

খুন করেছে তারা আমার এক বন্ধুকে আটকে রেখেছে একটা বাড়িতে...'

আঁৎকে উঠল স্টেফানো মন্টিনি। 'কি বললে! আমাদের বাতিস্তার বোনকে খুন করেছে? কোন্ শুয়োরের বাচ্চা?' এক লাফে নেমে পড়ল খাট থেকে। 'দাঁড়াও, আমি কাপড়টা পরে নিচ্ছি এক্ষুণি।'

বিনা দ্বিধায় ন্যাংটো হয়ে গেল পাগলা ওস্তাদ রানা ও বাতিস্তার সামনে। আলনা থেকে এমন একটা টাইট-ফিটিং জাঙ্গিয়া টেনে নিয়ে পরল যেটার পায়ের ফাঁক গলে ঢুকে যাবে আস্ত রানা। একটা হাফ প্যান্ট আর একখানা স্পোর্টস জ্যাকেট চড়িয়ে ফিরল রানার দিকে।

'তোমরা কে? মেরে ফেলেছে তারপর এসেছ খবর দিতে। মারার আগে আসতে পারোনি? বাতিস্তা কোথায়?'

'আমিই বাতিস্তা, ওস্তাদ। ইনি সিনর মাসুদ রানা, বাংলাদেশের লোক। আমরা দুজনেই ছদ্মবেশে আছি।' ওস্তাদের চোখ কপালে উঠতে দেখে চট করে যোগ করল বাতিস্তা, 'সব ভেঙেচুরে বলবার সময় নেই, ওস্তাদ, হাতে একেবারেই সময় নেই। দেরি হলে হয়তো ওদের আর পাব না। এখুনি আক্রমণ করতে হবে আমাদের। আপনি যাবেন কিনা বলুন।'

'যাব মানে? একশোবার যাব। কিন্তু... তুমিই ঠিক বাতিস্তা তো? আর ইউ শিওর? আমি কিন্তু একেবারেই চিনতে পারছি না।' বাতিস্তার কাপড়ের ভুঁড়িটা একটু টিপে দেখল ওস্তাদ।

'আমাদের দুজনের তুলনায় লোক একটু বেশি বলেই এত রাতে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি।' বলল রানা বিনীত ভাবে। 'পথে চলতে চলতে যতটা সম্ভব সংক্ষেপে আপনাকে জানাব আমরা ব্যাপারটা। রওয়ানা হওয়ার আগে আপনার একটা কথা জেনে রাখার দরকার, ওস্তাদ—কাজটা কিন্তু বিপজ্জনক। ওরা সশস্ত্রও

হতে পারে। আশা করছি ওই বাড়িতে জনাছয়েক লোক আছে, কিন্তু আসলে এর দ্বিগুণ লোকও থাকতে পারে। আমাদের কারও পক্ষেই প্রাণ নিয়ে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নাও হতে পারে। আপনি ইচ্ছে করলেই না করে দিতে পারেন, কিছুই মনে করব না...'

কটমট করে চাইল ওস্তাদ রানার দিকে। 'বড় বেশি কথা বলো হে তুমি, ছোকরা। কোন্ ইয়ারে পাস করেছ? ভুলেই গেছ আমাকে? চলো, আগে বাড়ো। দেখা যাবে আজ আমার ট্রেনিং কে কতটা মনে রেখেছ।' বাতিস্তাকে ঘর থেকে বেরোবার ইঙ্গিত করে বলল, 'আর বাতিস্তা, অবশ্য তুমি যদি সত্যিই বাতিস্তা হও, তোমার বোনের মৃত্যু সংবাদে আমি সত্যিই দুঃখিত। তোমার বোনই তো তোমার পড়ার খরচ চালাত, তাই না? আ-হা-হা। আমার যদি অনেক টাকা থাকত...'

'আপনার চেহারাটা একটু পাল্টে নিলে হত না, ওস্তাদ? আমি তো কাজ সেরে চলে যাব বাংলাদেশে, আপনাকে থাকতে হবে ভেনিসেই।'

'তিন হাজার অ্যাথলেট এসে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে আমি একটা ডাক দিলে।' হাসল ওস্তাদ। 'ভয় নেই, আমার কোন ক্ষতি করবার আগে তিন হাজার বার চিন্তা করবে যে-কোন লোক। চলো।'

শুনে তাজ্জব হয়ে গেল পাগলা ওস্তাদ।

'কি এমন জিনিস রয়েছে তোমার বন্ধুর কাছে যার জন্যে এতসব কাণ্ড করতে, এমনকি জুলির মত একটা নিরপরাধ মেয়েকে হত্যা করতেও বাধল না ওদের?'

গনডোলা ছেড়ে দিল বাতিস্তা।

'আমি জানি না, ওস্তাদ,' বলল রানা। 'সেইটাই জানতে হবে

আমাকে।’

‘তোমার বন্ধু কি কোন বে-আইনী কাজে লিপ্ত?’

‘তা-ও জানি না, ওস্তাদ। কিন্তু এটুকু জানি, যা-ই করে থাকুক অনিল চ্যাটার্জী, বিচার পাওয়ার অধিকার ওর আছে। এভাবে কুকুরের মত তাড়া খেয়ে মরতে দিতে পারি না আমরা ওকে বিদেশ-বিভূঁইয়ে।’

‘তা ঠিক। এবার কি প্ল্যান করছ বলো। বাড়িটার পেছন দিক থেকে ঢুকতে চাও?’

‘আগে দেখে নিই পেছনটা, তারপর কিভাবে কি করা যায় স্থির করা যাবে।’

লম্বা কালো গনডোলা নিঃশব্দে এগিয়ে চলল অন্ধকার ভেদ করে। সরু খাল, বাড়িটার পেছন ঘেঁষে চলে গেছে পশ্চিমে। প্রকাণ্ড একখানা চাঁদ আলো করে রেখেছে আকাশটাকে, কিন্তু লম্বা বাড়িগুলোর গায়ে আটকে যাওয়ায় খালে এসে পড়তে পারছে না ওটার আলো। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার বাড়িগুলো, ছাদের কার্নিসে কার্নিসে ভৌতিক আলোর খেলা। খুক করে গলা পরিষ্কার করল বাতিস্তা।

‘লণ্ঠনটা কমিয়ে দিন, সিনর। এসে গেছি।’

প্রায় নিভিয়ে দিল রানা মৃদু আলোটা। আধ মিনিটের মধ্যেই একটা দোতলা বাড়ির পেছনে থেমে দাঁড়াল গনডোলা। বৈঠা রেখে এগিয়ে এল বাতিস্তা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রানা বাড়ির পেছন দিকটা। আলোর আভাস মাত্র নেই। পনেরো ফুট ওপরে একটা ব্যালকনি দেখা যাচ্ছে, তার ফুট দশেক ওপরে মোটা গরাদ দেয়া ছোট একটা জানালা। ব্যালকনিতে আসার জন্যে নিশ্চয়ই দরজা আছে একটা, পাশে একখানা জানালা থাকাও বিচিত্র নয়, কিন্তু অনেকক্ষণ ঠাহর করে বোঝা গেল না পরিষ্কার। ওই ব্যালকনি

ছাড়া আর কোন জায়গা দিয়ে ভিতরে ঢুকবার উপায় দেখতে পেল না রানা।

‘একটা হুক আর কিছু দড়ি পেলে এই ব্যালকনি দিয়ে ঢোকা যায় ভেতরে।’ পকেট থেকে টর্চটা বের করল রানা, ‘জানালা-দরজা আছে কিনা দেখে নেয়া যাক।’

টর্চের মুখটা অ্যাডজাস্ট করে সূক্ষ্ম একটা রশ্মিতে পরিণত করল রানা আলোটাকে। একটা বন্ধ দরজার ওপরের অংশ দেখা গেল কিছুটা। একটা জানালারও সামান্য কিছুটা অংশ দেখা গেল, কিন্তু তাতে গরাদ আছে কিনা বোঝা গেল না।

‘রশি হুক আছে আমার কাছে, সিনর। উঠে যাব ওপরে?’

‘দাঁড়াও, এখন না। ওস্তাদ, গনডোলা চালাতে পারেন?’

‘পারি মানে? বাতিস্তাকে ইন্টার-ইউনিভারসিটি গনডোলা চ্যাম্পিয়ান বানাল কে?’

‘ভেরি গুড। চলো বাতিস্তা ওস্তাদকে বাড়ির সামনেটা একটু দেখিয়ে আনা যাক।’

নিঃশব্দে ঘুরল গনডোলা, কিছুদূর গিয়ে ঘ্যাস্‌স্‌ করে থামল একটা গলিমুখের কাছাকাছি। দু’তিনটে মোড় ঘুরে ক্যাম্পো ডেল সালিযোতে পড়ল ওরা। দূর থেকে আঙুল তুলে দেখাল রানা।

‘ওই যে সবুজ পেইন্ট করা দরজা দেখা যাচ্ছে, ওই বাড়িটা।’

কথাটা বলতে না বলতেই খুলে গেল দরজাটা। বেরিয়ে এল সিলভিও পিয়েত্রো। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল সিলভিও, এদিক ওদিক চাইল, তারপর সোজা হাঁটতে শুরু করল রানার দিকে। চট করে গলির ভিতর ঢুকে অন্ধকার থামের আড়ালে আত্মগোপন করল ওরা। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল না। কিছুদূর সোজা হেঁটে এসে ডান দিকের একটা গলিতে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল সিলভিও।

‘অনিল ছাড়া এখন রইল আর পাঁচজন। কমপক্ষে

পাঁচজন–আসলে আরও বেশি হতে পারে। কাজেই ওদের তাক লাগিয়ে না দিতে পারলে কাবু করা মুশকিল হবে। অনিল যদি এই বাড়িতে থাকে, তাহলে ওকে বের করে আনাও এক মহা সমস্যা হবে। ওকে এখান থেকে সরাতে হলে যদি স্ট্রেচারের দরকার হয় তাহলে তো বিকট ঝামেলা।' অনেকটা আপন মনে বলছিল রানা কথাগুলো, হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরল বাতিস্তার দিকে। 'তুমি ওস্তাদকে নিয়ে বাড়িটার পেছন দিকে চলে যাও। ব্যালকনি দিয়ে ঢুকে পড়ো বাড়ির ভেতর। এখন থেকে ঠিক দশ মিনিট পর সামনে দিয়ে ঢুকব আমি।'

'একা?'

'হ্যাঁ। সামনে পেছনে দুই দিক থেকে চমকে দিতে হবে ওদের। আমি না ঢোকা পর্যন্ত চুপচাপ থাকবে, কোন গোলমাল করবে না। আর একটা কথা, আমাদের প্রথম কাজ অনিলকে উদ্ধার করা, প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ আসবে পরে। কাজেই ওড্ডি বা গীয়ানকে যদি পাইও, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে এক সেকেন্ড বেশি সময় ব্যয় করব না আমরা। রাজি?'

'রাজি। কিন্তু, সিনর, জানালায় যদি লোহার বার থাকে, আর দরজা যদি ভেতর থেকে আটকানো থাকে তাহলে? আপনি একা ওই বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়লে কি উপায় হবে?'

'পেছন দিয়ে যদি ঢুকতে না পারো তাহলে যত তাড়াতাড়ি পারো সামনে চলে আসবে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'আর আমি?' এতক্ষণে কথা বলল পাগলা ওস্তাদ। 'আমার কি করতে হবে?'

'বাতিস্তা যদি ওই ব্যালকনি দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকতে পারে তাহলে আপনি গনডোলা নিয়ে ফিরে আসবেন এখন ওটা যেখানে আছে সেইখানে। তারপর সামনে দিয়ে ঢুকবেন বাড়িটায়। যদি

ওদের কাবু করতে পারি তাহলে সামনের দরজা দিয়ে বেরোতে হবে আমাদের অনিলকে নিয়ে। যান, রওনা হয়ে যান, ওস্তাদ।'

রানার কাঁধের ওপর একখানা আড়াইমনী হাত রাখল পাগলা ওস্তাদ। 'কাজটা তোমার জন্যে একটু বেশি বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে না? প্রথমে আমি সামনে দিয়ে ঢুকলে কেমন হয়?'

'দেখুন ওস্তাদ, আপনাকে আগেই বলেছি, এই খেলায় আমি ক্যাপ্টেন, আমার আদেশ মানতে হবে। ভুলই হোক আর ঠিকই হোক, আমি যা বলি তাই করতে হবে খাঁটি স্পোর্টসম্যানের মত। আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন না। দুই মত দুই পথ হয়ে গেলে অনর্থক তর্কাতর্কি করে সময় নষ্ট হবে। বুঝতে পেরেছেন?'

'পেরেছি বাবা, পেরেছি। আজকালকার ছেলে তো নয়, একেবারে পেরেক। আমার প্রস্তাব তুলে নিচ্ছি আমি।'

'তবু ভাল, কাজে নেমে তারপর প্রশ্ন তোলেননি, কাজ শুরুর আগেই উঠেছে কথাটা। ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ আছে আমার। আমাদের তিনজনের মধ্যে দুজন গনডোলা চালাতে জানে, একজন জানে না। একজনকে ওদের চিনে ফেলবার সম্ভাবনা আছে, দুজনকে চিনবে না। আমাদের কাজ হচ্ছে ওদের অবাক করে দিয়ে পরাস্ত করা, এবং অনিলকে গনডোলায় তুলে নিয়ে পলায়ন। তার জন্যে ওটাকে বাড়ির পেছন থেকে বেয়ে এ গলির মুখে নিয়ে আসা দরকার।' হাসল রানা। 'এবার রওনা হয়ে যান, ওস্তাদ, চিন্তা করে বের করুন দেখি আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তার মধ্যে কোন খুঁত পাওয়া যায় কিনা।'

ওদের বিদায় করে দিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা।

অপেক্ষা করতে ভাল লাগে না ওর। অপেক্ষার সময় যেন কাটতেই চায় না। নানান চিন্তা আসতে শুরু করল ওর মাথায়। পেছন দিয়ে ঢুকতে পারবে তো বাতিস্তা। যদি না পারে তাহলে সামনের দিকে ফিরে আসতে কত সময় লাগবে? ততক্ষণ পারবে

সে টিকে থাকতে? কজন লোক আছে এ বাড়ির ভিতর? অনিলকে পাওয়া যাবে তো এখানে? পাওয়া গেলে আপাতত খোঁজার শেষ। কিন্তু যদি না পাওয়া যায়? শেষ না দেখে পুলিসের সাহায্য নেবে না, স্থির করেছে সে। পুলিসের সাহায্য চাইলেই যে কতটা পাওয়া যাবে সে ব্যাপারেও সন্দেহ আছে ওর। কার কাছে খবর পেল পুলিস যে সেই ভাঙা বাড়িটায় জুলির লাশ পাওয়া যাবে?

রঞ্জন চৌধুরীর ব্যবহারটা কেমন যেন গোলমেলে ঠেকেছে রানার কাছে। এমন ভাব দেখাল যেন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে অনিল, ঢাকায় মেজর জেনারেলকে অনুরোধ করেছে, রানা যেন এ ব্যাপারে নাক না গলায় রানার ওপর সেরকম আদেশ জারি করতে। চারদিকে ঢাক ঢাক গুড় গুড়। অথচ অনিল সেই ভারতেই ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছে কেন? অনুতপ্ত? উঁহুঁ, মেলে না।

শেষ বারের মত ঘড়ি দেখল রানা। দেয়ালের গায়ে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। অন্ধকার গলি থেকে বেরিয়ে এল সে। দৃঢ়, লম্বা পদক্ষেপে এসে দাঁড়াল সবুজ দরজাটার সামনে। সিঁড়ি বেয়ে তিন ধাপ উঠে জোরে তিনটে টোকা দিল দরজার গায়ে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। কিন্তু আবার টোকা দেয়ার জন্যে রানা যেই হাত তুলল, ওমনি ঘটাং করে খুলে গেল দরজার বল্টু। দু'ফাঁক হয়ে গেল দরজা। চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে বেঁটে মোটা গীয়ান। ভুরু কুঁচকে চাইল রানার মুখের দিকে। মুহূর্তে চিনতে পেরেছে সে মিশরীয় ট্যুরিস্টকে।

'কি চাই এখানে?' কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল গীয়ান।

'ডক্টর আমানান্তির একটা জরুরী কল আছে।' কথাটা বলতে বলতে গীয়ানকে প্রায় ঠেলে ঢুকে এল রানা বাড়ির ভিতর। 'উনি এখানে আছেন শুনে এসেছি।'

'নেই। ছিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ আগে...'

কথাটা আর শেষ করতে পারল না গীয়ান, হুঁক করে একটা চাপা আওয়াজ বেরোল ওর মুখ দিয়ে, বাঁকা হয়ে গেল ভুঁড়ির ওপর প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে। পরমুহূর্তে চোয়ালের ওপর পড়ল রানার বজ্রমুষ্টির লেফট্‌হুক।

পা ভাঁজ হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেলল ওকে রানা। কানের কাছে মুখ নিয়ে মধুর কণ্ঠে বলল, 'তোমার নিজের দাওয়াই দিলাম একটু। কেমন বুঝছ, মটু মিঞা?'

ঘাড়ের ওপর একটা মাঝারি ওজনের রদ্দা মেরে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে শুইয়ে দিল রানা ওকে মেঝের ওপর। ওর শরীর ডিঙিয়ে এসে বন্ধ করে দিল সামনের দরজাটা। যাক, বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছে সে। দ্রুত চোখ বোলাল চারপাশে বাড়ির নকশাটা মোটামুটি বুঝে নেয়ার জন্যে।

সামনেই সিঁড়ি। ডানদিকে বেশ লম্বা একটা করিডর। করিডরের দুপাশে দুটো এবং শেষ মাথায় একটা বন্ধ দরজা দেখা যাচ্ছে। কম পাওয়ারের বাতি দিয়ে ম্লানভাবে আলোকিত প্যাসেজটা।

কান খাড়া করল রানা। শেষ মাথার ঘর থেকে কয়েকজনের কথাবার্তার আওয়াজ আসছে, তাছাড়া সব চুপচাপ।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠাই স্থির করল রানা। কিন্তু রওনা হতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। দোতলার কোন একটা ঘরের দরজা খুলে গেল। ঝট করে সরে এল রানা সিঁড়ির নিচে, ছায়ায়।

ধুপধাপ পায়ের শব্দ এসে থামল সিঁড়ির কাছে।

'গীয়ান? কে এল?'

রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে ওড্ডির মুখের একাংশ দেখতে পেল রানা। কুঁচকে আছে ভ্রূ।

সিঁড়ির নিচে অপেক্ষা করছে রানা। প্রস্তুত।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল ওড্ডি। অর্ধেক নেমেই দেখতে পেল সে গীয়ানের জ্ঞানহীন দেহটা। থমকে দাঁড়িয়ে ভাল করে লক্ষ করে দেখল সে।

নিচু গলায় কি একটা গালি দিল ওড্ডি, তারপর দুড়দাড় করে নেমে এল বাকি ধাপ কটা। নিচু হয়ে ঝুঁকে গীয়ানকে দেখল সে, কিন্তু সে শুধু এক সেকেন্ডের জন্যে, সিঁড়ির নিচে রানা সামান্য একটু নড়ে উঠতেই ঝট করে ফিরল এদিকে।

আধ সেকেন্ড পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে রইল ওরা। তারপর লাফ দিল রানা।

রানা আশা করেছিল বাঁ দিকে সরবে ওড্ডি, কিন্তু সরল ডানদিকে। একহাতে গলা টিপে ধরল রানা ওড্ডির, অন্য হাতে ঘুসি চালাল থুতনির নিচে। কিন্তু কোনটাই তেমন কার্যকরী হলো না লক্ষ্য সামান্য একটু ভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ায়।

হাড্ডির মত শক্ত ওড্ডির হাত। এক হাতে ঠেকিয়ে দিল রানার ঘুসি, সামান্য একটু কাত হয়ে দড়াম করে মারল রানার পাঁজরার ওপর প্রচণ্ড একটা হুক। এক পা পিছিয়ে গেল রানা, গলা থেকে হাত ছুটে গেলেও চট করে ধরে ফেলল ওর কোটের কলার, হ্যাঁচকা টান দিল।

শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল ওড্ডি। সাঁই করে লাথি মারল রানা ওর পায়ের কব্জিতে। হুড়মুড় করে পড়ল ওড্ডি মাটিতে, পড়েই বাঁ পা-টা রানার বুকে বাধিয়ে জোরে ধাক্কা দিল।

'ইউজিনো! রিক্কি! পপিনি!' তারস্বরে ডাক ছাড়ল সে রানাকে আবার বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে। উঠে বসতে যাচ্ছিল, শুয়ে পড়ল আবার প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে।

দুপাট খুলে গেল করিডরের শেষ মাথার দরজাটা। ইয়া লম্বা চওড়া এক লোক বেরিয়ে এল সরু প্যাসেজে। তার পেছনে তার চেয়েও প্রকাণ্ড আরও দুজন লোক। সামনের লোকটাকে এক

হাতে সরিয়ে দিয়ে নিজে আগে আসার চেষ্টা করছে পিছনের লোকটা। দ্রুত এগোচ্ছে ওরা।

কে কার আগে আসবে তাই নিয়ে সরু প্যাসেজে একে অন্যের বাধা সৃষ্টি করছে ওরা, এই সুযোগে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল রানা ওড্ডিকে ছেড়ে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল সে। পাগলের মত সামনের দিকে ঝুঁকে এল ওড্ডি। রানার বাঁ পা-টা দ্বিতীয় ধাপ ছেড়ে চতুর্থ ধাপে উঠতে যাবে, এমন সময় দুই হাতে খপ করে চেপে ধরল সে পায়ের কব্জি, মারল টান। হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা সিঁড়ির ওপর উপুড় হয়ে।

জোরে ঠুকে গেল কপাল, অন্ধকার হয়ে আসতে চাইল ওর চোখ। কিন্তু মন শক্ত করল রানা। এই অবস্থায় জ্ঞান হারানো মানে অবধারিত মৃত্যু। প্রাণপণ শক্তিতে অন্ধের মত পা ছুঁড়ল পেছন দিকে। ওড্ডির কাঁধের ওপর পড়ল লাথিটা! পা ছেড়ে দিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল সে প্রথম লোকটার পায়ের ওপর।

একলাফে ওড্ডিকে টপকে এগিয়ে এল দ্বিতীয় লোকটা। ভয়ঙ্কর চোখ মুখ। ধরে ফেলবার চেষ্টা করল রানাকে। সাঁৎ করে সরে গেল রানা, উঠে দাঁড়াল, এবং আচম্বিতে কনুই চালাল পেছন দিকে। সোলারপ্লেক্সাসের ওপর আচমকা গুঁতো খেয়ে ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল লোকটার মুখ, হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ল সিঁড়ির ওপর।

আছড়ে-পাছড়ে আরও তিন ধাপ উঠল রানা, এমন সময় খপ করে ধরে ফেলল একজন রানার বাঁ হাতের কব্জি। তৃতীয় লোকটা। মাথা ভর্তি লাল চুল। নিচু হয়ে সিঁড়ির এপাশে চলে এসেছিল সে, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে রেলিং-এর ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেছে।

হ্যাঁচকা টানে রেলিং-এর গায়ে ধাক্কা খেলো রানা। হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করল। আঙুল তো নয়, রানার মনে হলো লোহার

সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরেছে ওর কব্জি। আশ্চর্য শক্তি লোকটার গায়ে, ছাড়ানো গেল না হাত।

সিঁড়ির ওপর হামাগুড়ি দিয়ে বসে ব্যথায় কাতরাচ্ছে কনুইয়ের গুঁতো খাওয়া লোকটা, বন্য জন্তুর মত মাথা নাড়ছে এপাশ ওপাশ। এক লাফে ওকে ডিঙিয়ে উঠে এল প্রথম লোকটা। ঠোঁট সরে গেছে দাঁতের ওপর থেকে, দুই চোখে প্রতিহিংসার বিষ। প্রচণ্ড এক ঘুসি তুলল লোকটা রানার তলপেট লক্ষ্য করে। ওই এক ঘুসিই রানার জন্যে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু লাগাতে পারল না জায়গামত। আশ্চর্য ক্ষিপ্র বেগে শরীর বাঁকিয়ে সরে গেল রানা ছয় ইঞ্চি। দ্রাম করে পড়ল ঘুসিটা রেলিং-এর ওপর। কেঁপে উঠল সারা বাড়ি।

আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল লোকটার চোখ-মুখ। আরেকটা ঘুসি তুলল। ঠিক এমনি সময় বাতিস্তা এসে দাঁড়াল সিঁড়ির মাথায়, একবার চোখ বুলিয়েই বুঝে নিল অবস্থাটা, মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল। সিঁড়ির তোয়াক্কা না রেখে ঝাঁপ দিল বাতিস্তা, পা আগে, মাথা পিছনে।

উড়ে এসে পড়ল বাতিস্তা লোকটার বুকের উপর, দু'পা নেমে গেল লোকটা, হোঁচট খেলো হামাগুড়ি দেয়া লোকটার গায়ে পা বেধে, হুড়মুড় করে পড়ল নিচে সানের ওপর, ওর বুকের ওপর পড়ল বাতিস্তা।

ডান হাতে রেলিং-এর ওপর ভর দিয়ে এক লাফে টপকাল রানা ওটা। ধপাস করে লাল-চুলো দৈত্যটার কাঁধে বসে পড়ল। দুই পায়ে যত জোরে সম্ভব দমাদম উল্টো লাথি মারতে শুরু করল সে লোকটার পেটে। রানাকে কাঁধে নিয়ে হুড়মুড় করে দেয়ালের গায়ে গুঁতো মারার চেষ্টা করল লোকটা বার কয়েক, সেদিকে সুবিধে করতে না পেরে রানার মাথাটা চুর করে দেয়ার জন্যে হঠাৎ সানের উপর পড়ল সে চিৎ হয়ে। রানার দুই ঊরু চেপে

ধরে আছে বুকের ওপর যেন সে নড়াচড়া করতে না পারে। পতনের অর্ধেকটা পথ চুপচাপ থাকল রানা, লোকটা যেই সম্পূর্ণভাবে ভারসাম্য হারাল ওমনি জোরে এক মোচড় দিল। ঘুরে যাচ্ছে লোকটার দেহটা। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চট করে রানার ঊরু ছেড়ে দিয়ে নাক-মুখ ঠুকে যাওয়া থেকে বাঁচল লোকটা একহাতে মেঝে ধরে, অপর হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে নামিয়ে দিল রানাকে কাঁধ থেকে। পর মুহূর্তে ক্যাঁক করে চেপে ধরল রানার কণ্ঠনালী। দম বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো রানার।

বিনা দ্বিধায় ডান হাতের তর্জনীটা ঠেসে ধরল রানা দৈত্যটার বাঁ চোখে। চিৎকার করে উঠল লোকটা। আরও জোরে খোঁচা দিল রানা। কণ্ঠনালীর ওপর থেকে খসে গেল বজ্র আঁটুনি। পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে লোকটা। দড়াম করে হাঁটুর একটা গুঁতো পড়ল ওর তলপেটে, পরমুহূর্তে কাঁধের পাশে পড়ল কারাতের এক তীব্র রদ্দা। ছিটকে গিয়ে রেলিং-এর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে।

বাতিস্তাকে বুকের ওপর নিয়ে সিঁড়ির ওপর থেকে নিচের মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়েই জ্ঞান হারিয়েছিল লোকটা প্রচণ্ড জোরে মাথাটা ঠুকে যাওয়ায়, কিন্তু কোনরকম ঝুঁকি নিল না বাতিস্তা, সটান উঠে দাঁড়িয়ে ঝপাং করে পড়ল আবার ওর বুকের ওপর দুই হাঁটু ভাঁজ করে। মড়াৎ করে শব্দ এল রানার কানে।

উঠে দাঁড়িয়ে রানার দিকে ঘুরতে যাচ্ছিল বাতিস্তা, ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর ওড্ডি। রেলিং-এর গায়ে ছিটকে পড়া লোকটার কণ্ঠনালী টিপে ধরে এইদিকে চেয়েছিল রানা, পরিষ্কার দেখতে পেল বাতিস্তার খেলা। সেকেন্ড দশেক দমাদম ছোট ছোট ঘুসি মারল বাতিস্তা ওড্ডির নাকে-মুখে-বুকে-পেটে। প্রতিটা ঘুসি পড়ার সঙ্গে যেভাবে কেঁপে কেঁপে উঠল ওড্ডির শরীরটা, রানা বুঝল, ঘুসি তো নয়, আধমনী হাতুড়ির আঘাত পড়েছে ওর

ওপর। হঠাৎ একপাশে কাত হয়ে গেল বাতিস্তা, আঙুলগুলো সোজা রেখে দড়াম করে জুডো চপ মারল ওড্ডির নাভির ছয় আঙুল ওপরে। বাঁকা হয়ে গেল ওড্ডি, ব্যথায় বিকৃত ওর চোখমুখ। দড়াম করে আরেকটা জুডো চপ পড়ল ওড্ডির ঘাড়ের পেছনে। ঝুপ করে পড়ল মেঝের ওপর ওড্ডির জ্ঞানহীন দেহ।

কনুইয়ের গুঁতো খাওয়া লোকটা ছুরি বের করে ফেলেছে একটা। কণ্ঠনালী ছেড়ে দিয়ে এক লাফে রেলিং টপকাল রানা। বাতিস্তার বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়বার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে খপ করে ধরল রানা লোকটার কব্জি। বেকায়দা মত একটা চাপ পড়তেই ছুরিটা খসে গেল হাত থেকে। কিন্তু রানার কৌশলই ফিরিয়ে দিল লোকটা। বাম হাতের কনুই দিয়ে মারল রানার তলপেটে।

রানার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসছিল বাতিস্তা, এমনি সময় করিডরের ডান পাশের একটা দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন লোক। এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল বলে টের পায়নি কিছুই, ধাঁই-ধুঁই আওয়াজ বেড়ে যাওয়ায় বেরিয়ে এসেছে কি হচ্ছে দেখার জন্যে। চোখের সামনে এই প্রলয়ঙ্কর অবস্থা দেখে মুহূর্তে শক্ত হয়ে গেল ওর সর্বাঙ্গের পেশী। চাপা একটা হুঙ্কার ছেড়েই লাফ দিল সামনের দিকে। একলাফে এসে পড়ল বেচারা বাতিস্তার খপ্পরে। গোটা চারেক ঘুসি খেয়ে হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল লোকটা, বাতিস্তা পড়ল ওর ওপর।

সিঁড়ির ওপর লোকটা ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই সামলে নিল রানা। তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা, কিন্তু এখন এদিকে লক্ষ দিতে গেলে চলবে না। ডান হাতের জুডো হোল্ডটা ছাড়লেও চলবে না। সামনের দিকে ঠেলা দিয়ে লোকটার ভারসাম্য নষ্ট করে দিল রানা, তারপর দ্রুত দুই ধাপ নেমে এসে প্রাণপণ শক্তিতে থ্রো করল। রানার কাঁধের ওপর দিয়ে শূন্যে উঠে গেল লোকটার শরীর। ঠিক এমনি সময় দড়াম করে খুলে গেল সামনের দরজা। ঝড়ের বেগে

ঘরে ঢুকল পাগলা ওস্তাদ।

উড়ন্ত লোকটার দিকে একনজর চেয়েই বাতিস্তার দিকে ফিরল ওস্তাদ। ঘাড় গুঁজে ঝুঁকে রয়েছে বাতিস্তা নবাগতের ওপর, হাত দুটো পিস্টনের মত কাজ করে চলেছে দ্রুত। ছটফট করছে লোকটা প্রচণ্ড হাতুড়ির ঘা খেয়ে, দুর্বল হয়ে আসছে ক্রমে।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিরতিশয় দুঃখিত হলো ওস্তাদ। পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে, খেলাটা ধাপুড়-ধুপুড়-ধাঁই হয়েছে। নিয়ম কানুন মানেনি কেউ। আর সহ্য করতে না পেরে বলে উঠল, 'আহ্-হা। কী করছ বাতিস্তা! ফাউল হচ্ছে তো।'

রানার ছুঁড়ে দেয়া লোকটা মাটিতে পড়েই উঠে দাঁড়াল আবার। দমাদম কয়েকটা ঘুসি মেরে বসল ওস্তাদের ভুঁড়ির ওপর। করুণ ভাবে মাথা নাড়ল ওস্তাদ।

'এভাবে মারতে হয় না, বাছা। নিজের গার্ডটা রাখতে হয় সব সময়। নইলে...'

প্রচণ্ড এক থাবড়া পড়ল লোকটার নাকের ওপর। ছিটকে গিয়ে গীয়ানের শরীরে হোঁচট খেয়ে দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ল লোকটা, সেখান থেকে ঝুপ করে পড়ল মাটিতে। দু'পা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরল ওস্তাদ। একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে ছুরি তুলেছে গীয়ান গোক্ষুরের ফণার মত।

'ছুরির তো কথা ছিল না!' অবাক হয়ে গেল ওস্তাদ। 'নিরস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে ছুরি? কোন্ ইয়ারে পাস করেছ? তোমার কি আক্কেল বলতে কিছু নেই?'

ওস্তাদকে কটমট করে চাইতে দেখে একটু যেন থতমত খেয়ে গেল গীয়ান। সিঁড়ির ওপর থেকে লাফ দিল রানা। ঝট করে একটু সরে গিয়ে ছুরি চালাল গীয়ান। কব্জিটা ধরে ফেলল রানা ঠিক সময় মত, কিন্তু জুডো হোল্ডে ধরার আগেই ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিল গীয়ান ওর হাতটা। আঙুলগুলো সোজা রেখে সাঁই

করে মারল রানা কারাতে চপ নিচ থেকে ওপরে। নাকের নরম হাড়ের ওপর পড়ল আঘাতটা, গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল নাক দিয়ে। পরমুহূর্তে কারাতের কোপ পড়ল ওর কনুই থেকে ইঞ্চি তিনেক নিচের নার্ভ সেন্টারে, খসে গেল ছুরি।

'কী যা-তা মার মারছ!' এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল ওস্তাদ রানাকে। 'তোমাদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না। সবকিছু গুলিয়ে খেয়ে ফেলেছ! বাম পা-টা সামনে, ডান পা পিছনে রাখো, এই রকম। তারপর মারো নক আউট পাঞ্চ, এই রকম।'

করিডরের মাঝামাঝি গিয়ে লুটিয়ে পড়ল গীয়ান, আর উঠল না।

জ্ঞানহীন দেহটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বাতিস্তা, এগিয়ে এল এদিকে। হাঁপাচ্ছে হাপরের মত।

'কোথাও জখম হননি তো, সিনর?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল বাতিস্তা।

নিজের গলায় হাত বোলাল রানা। কয়েকটা আঁচড় লেগেছে নখের, জ্বলছে। বলল, 'না। তোমার?'

'ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে পিঠে সামান্য ব্যথা লেগেছে। তেমন কিছুই নয়।' এপাশ ওপাশ চাইল। 'এবার কি করতে হবে, সিনর?'

জ্ঞানহীন দেহগুলো টেনে এনে সিঁড়ির নিচে জমা করতে শুরু করেছে ওস্তাদ, প্রত্যেকের জখম পরীক্ষা করে দেখছে এবং ঝেড়ে গাল দিয়ে চলেছে রানা ও বাতিস্তাকে অপদার্থ, অমানুষ, হৃদয়হীন, পাষণ্ড এবং ফাউল-প্লেয়ার বলে। ধমকে উঠল বাতিস্তার দিকে চেয়ে।

'হাঁ করে কি দেখছ? দড়ি নিয়ে এসো লম্বা দেখে।'

রানার ইঙ্গিতে করিডরের দুপাশের দুটো এবং শেষ মাথার ঘর খুঁজে নাইলনের একটা শক্ত লম্বা রশি নিয়ে এল সে।

রানা বুঝল, নিচ তলায় নেই অনিল। যদি থাকে, ওপরে আছে। দরজায় বল্টু লাগিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল। বাতিস্তার পিঠে মৃদু চাপড় দিল।

'ওয়েল-ডান্। তুমি ওস্তাদকে সাহায্য করো, আমি ওপরটা দেখছি। দরজায় টোকা পড়লে খুলো না।'

একেক বারে তিন ধাপ করে উঠতে শুরু করল রানা সিঁড়ি দিয়ে। দোতলাতেও তিনটে ঘর। প্রথম দুটো ঘরে কেউ নেই। তৃতীয় ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। বাইরে থেকে বল্টু লাগানো এ ঘরে।

বল্টুতে হাত দিতেই ঢিব ঢিব শুরু হয়ে গেল রানার বুকের ভিতর। এ বাড়িতে যদি থাকে অনিল তাহলে এই ঘরে আছে। যদি তাই হয় তাহলে বলতে হবে খুব কম সময়ের মধ্যেই ওকে খুঁজে বের করতে পেরেছে সে। কিন্তু...কি অবস্থায় দেখবে সে অনিলকে? জীবিত, না...

বল্টু খুলে ঠেলা দিল রানা দরজায়।

ছোট একটা ঘর। দুটো মদের বোতলের মাথায় বসানো মোমবাতি জ্বলছে। একটা ক্যাম্পখাটে শুয়ে আছে একজন, একটা ফুলপ্যান্ট ছাড়া পরনে আর কিছুই নেই। ব্যান্ডেজ দেখা যাচ্ছে বাঁ কাঁধে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে। ভৌতিক ছায়া ফেলছে মোমবাতির কম্পমান শিখা।

দ্রুতপায়ে এগিয়ে মোমবাতিসুদ্ধ একটা বোতল তুলে নিল রানা হাতে। একবিন্দু নড়ল না শায়িত লোকটা।

মোমবাতি হাতে এগিয়ে গেল রানা বিছানার পাশে।

যদিও বহুদিন দেখা নেই, চিনতে একটুও কষ্ট হলো না রানার। সারা গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কিন্তু সেই মুখ, সেই চোখ, নাক–ভুল নেই তাতে। শুয়ে আছে অনিল চ্যাটার্জী। চারিত্রিক দৃঢ়তার ছাপ রয়েছে ওর চেহারায়। পাশেই টেবিলের

ওপর একটা পাত্রে কিছু রক্ত মাখা তুলো, ব্যান্ডেজ, আর একটা পয়েন্ট থ্রী এইট ক্যালিবারের বুলেট।

নিঃসাড় পড়ে আছে অনিল। ফ্যাকাসে রক্তশূন্য চেহারা। চোখ বন্ধ। হঠাৎ রানার মনে হলো অনিলের মৃতদেহের দিকে চেয়ে রয়েছে সে। পরমুহূর্তে সামান্য একটু উঁচু হলো বুক, নাকের কাছে দুটো আঙুল নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করল রানা মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাস।

পাল্স বিট দেখার জন্যে ওর বাম হাতটা তুলে নিয়েই চমকে উঠল রানা। অনেকগুলো খয়েরী পোড়া দাগ। সিগারেট ঠেসে ধরে নির্যাতন করা হয়েছে ওকে। এমন কিছু তথ্য আছে অনিলের কাছে যেটা সংগ্রহ করা শত্রুপক্ষের একান্তই দরকার। নির্যাতনের মুখে কি নতি স্বীকার করেছে অনিল?

অনিলের বুকের ওপর হাত রাখল রানা। নাড়া দিল মৃদুভাবে।

'অনিল। শুনতে পাচ্ছ?'

একটুও নড়ল না অনিল। বোঝা গেল না রানার কথা শুনতে পাচ্ছে কিনা। বুকের সামান্য ওঠানামা দেখেই বুঝতে হচ্ছে যে বেঁচে আছে এখনও।

ঘরে ঢুকল ওস্তাদ।

'পেলে ওকে?'

'হ্যাঁ। জুলির মতই ওর ওপরও নির্যাতন চালানো হয়েছে।'

'মরে গেছে?' এগিয়ে এল ওস্তাদ, অনিলের অবস্থা দেখে উল্টো শিস দিল ঠোঁট গোল করে। চট করে পালস্ বিট দেখে নিল একবার।

'মরেনি, কিন্তু আধ-মরা। এখান থেকে বের করি কি করে ওকে?' এদিক ওদিক চাইল রানা। 'যে করে হোক গনডোলা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে হবে ওকে।'

বাতিস্তা এসে ঢুকল ঘরে। লম্বা পা ফেলে এসে দাঁড়াল খাটের পাশে। বলল, 'আমি আর ওস্তাদ মিলে ওকে ধরে...'

'তোমাকে লাগবে না। আমি একাই পারব। তোশক দিয়ে মুড়ে নিলে সোজাই থাকবে। আমি নিচ্ছি, তোমরা দুজন গার্ড দাও আমাকে সামনে পিছনে। অবস্থা বেশি ভাল মনে হচ্ছে না।'

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চাইল রানা ওস্তাদের মুখের দিকে। উত্তর দিল বাতিস্তা।

'আরও একজন ছিল এ বাড়িতে। পালিয়ে গেছে। নিচের একটা ঘরের ওপাশের দরজা ভিড়ানো ছিল, ধাক্কা দিতেই খুলে গেল।'

তোশক দিয়ে মুড়ে কোলে তুলে নিল ওস্তাদ অনিলের অজ্ঞান দেহ। দ্রুত পায়ে নেমে এল ওরা নিচে।

সিঁড়ির নিচে শক্ত করে বেঁধে ফেলে রাখা ছ'জনের কারও হুঁশ নেই। একনজর দেখে নিয়ে সামনের দরজার বল্টু খুলে ফেলল রানা। সাবধানে মুখটা বের করল বাইরে।

এমনি সময়ে তীক্ষ্ণ শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল বাড়ির ভিতর কোথাও। একসাথে চমকে উঠল ওরা তিনজন। দরজা দিয়ে মুখ বের করে রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত দেখল রানা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই রাস্তায়। একটি মাত্র বাতি জ্বলছে কাফের সাইন বোর্ডের মাথায়।

বেরিয়ে এল রানা বাইরে। পিছু পিছু ওস্তাদ। দরজাটা টেনে ভিড়িয়ে দিয়ে বাতিস্তা এল সর্বশেষে।

দ্রুতপায়ে ঢুকে পড়ল ওরা অন্ধকার গলিতে। মোড় নেয়ার আগে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল রানা। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইল পিছনের প্রত্যেকটা ফেলে আসা গলিমুখের দিকে।

সড়সড় করে গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল রানার। প্রত্যেকটা গলিমুখে এসে দাঁড়িয়েছে চারজন করে লোক। সবার দৃষ্টি ওদের

দিকে ফেরানো। বিশ পঁচিশজন লোক একসাথে এগোচ্ছে এইদিকে।

'পা চালান, ওস্তাদ,' বলল রানা। 'আমাদের ঠেকাবার চেষ্টা করা হবে এখন। সামনের দিকে ক'জন আছে আল্লাই মালুম।'

'কত আর থাকবে, বড়জোর বিশ পঁচিশ জন আরও? এদের পিটিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে না? কোন্ ইয়ারে পাস করেছ?'

এগারো

অন্ধকার রাত্রির নিস্তব্ধতা চিরে তীক্ষ্ণ সুরে বেজে উঠল একটা হুইস্‌ল্।

প্রায় দৌড়ে এগিয়ে চলল ওরা।

মোটা মানুষ, তার ওপর অনিলের বোঝা, হাঁসফাঁস করছে ওস্তাদ। কিন্তু তারই মধ্যে বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে গেছে তার। বলল, 'বেশ জমেছে, না?'

'আপনি সোজা নিয়ে ওকে গনডোলায় তুলুন,' বলল রানা। 'আমরা দেখছি এদিকটা।'

কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল বাতিস্তা, থেমে দাঁড়াল রানা।

'ওপাশের গলি দিয়ে আরও লোক আসছে, সিনর।'

রানাও শুনেছে পায়ের শব্দ। সমান্তরাল গলি দিয়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে কয়েকজন। পেছনে লোকগুলোও এগিয়ে আসছে দ্রুত।

'ওস্তাদকে ঠেকাবার চেষ্টা করবে ওই লোকগুলো। চলো আমরা এগিয়ে থাকি।'

জোরে দৌড়াল দুজন। ওস্তাদের সামনে পেছনে গার্ড দিয়ে নিয়ে চলল ওরা। দুজনের হাতেই বেরিয়ে এসেছে দুখানা তীক্ষ্ণধার স্টিলেটো।

'পিছনের ওরা কিন্তু আমাদের ওভারটেক করবার চেষ্টা করছে না, সিনর,' বলল বাতিস্তা।

'জানি,' বলল রানা দৌড়াতে দৌড়াতে। 'আমরা যাতে পিছু হটতে না পারি, তারই জন্যে এই ব্যবস্থা।'

গলিমুখে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল রানা। দুহাত তুলে পেছনের দুজনকে থামবার ইঙ্গিত করল। ত্রিশ গজ দূরে গনডোলার কাছে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে তিন-চারজন। অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

'দাঁড়ান, ওস্তাদ!' ফিসফিস করে বলল রানা। 'এখন জলদি কাজ সারতে হবে। আর সবাই এসে পড়বার আগেই। আমি আর বাতিস্তা চার্জ করছি, আপনি আমাদের পিছু পিছু ছুটে গিয়ে উঠে পড়ুন গনডোলায়। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন না। উঠেই ছেড়ে দেবেন নৌকা। ওকে নিয়ে সোজা চলে যান আপনার বাসায়।'

ফোঁস ফোঁস হাঁপাতে হাঁপাতে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল ওস্তাদ। ছুরিটা গুঁজে রাখল রানা খাপে।

কনুই দিয়ে আস্তে একটা গুঁতো দিল রানা বাতিস্তার পেটে, তারপর বিদ্যুৎবেগে ছুটল সামনের দিকে, ঠিক যেন পিস্তল থেকে ছোঁড়া একটা গুলি। পরমুহূর্তেই ছুটল বাতিস্তা।

ওরা মাঝপথে পৌঁছতেই ওদের দেখতে পেল অপেক্ষমাণ চারজন। একটু হকচকিয়ে গেল এই অতর্কিত আক্রমণের সামনে। সবাই সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে প্রথম ধাক্কার সামনে থেকে। প্রত্যেকে চাইছে প্রথম চোট আর কারও ওপর দিয়ে যাক।

কিন্তু সামলে নিতেও দেরি হলো না ওদের। ছুরি বেরিয়ে এসেছে দুজনের হাতে। ঝিক করে উঠল আবছা আলোয়। ঠিক সময়মত বাঁ দিকে কাত হয়ে গেল রানা। নিচু হয়েই খপ করে

ধরল প্রথম লোকটার পা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে শূন্যে তুলে ফেলল পা-টা। জোরে একটা ধাক্কা দিতেই আর একজনকে নিয়ে পড়ল সে চিৎ হয়ে মাটিতে।

এদিকে বাতিস্তা ঝাঁপিয়ে পড়েছে দ্বিতীয় ছুরিধারীর ওপর। এত প্রবল বেগে এসে পড়ল যে ছুরি মারার আর সময় পেল না লোকটা, ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল ভারসাম্য হারিয়ে। তার ওপর পড়ল বাতিস্তা। বন্যজন্তুর মত হুটোপুটি খাচ্ছে ওরা মাটিতে, চার হাত পায়ে মেরে চলেছে একে অপরকে, যে যেখানে পারে।

অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনতে পেল রানা। দ্রুত এগিয়ে আসছে এইদিকে।

বাতিস্তার পিঠে ছুরি বসাতে যাচ্ছিল একজন, লাফ দিল রানা। এক লাথিতে ছিটকে দূরে চলে গেল ছুরি, কিন্তু লোকটা জাবড়ে ধরল রানার কোমর, ঠেলে পেছনে নিয়ে এল কয়েক পা, গাছের শিকড়ে পা বেধে পড়ে গেল রানা, লোকটা পড়ল ওর বুকের ওপর।

প্রচণ্ড শক্তি লোকটার গায়ে। কারাতে, জুডো, সাভাতে, জুজুৎসু, আতে ওয়াযা, ইয়াওয়ারা, আইকিডো–যত যা আছে সব জ্ঞান প্রয়োগ করে বহু কষ্টে একটু কাবু করে আনল রানা লোকটাকে, উঠে বসল ওর বুকের ওপর। ঠিক এমনি সময়ে আর একজন পেছন থেকে চেপে ধরল রানার গলা। হাঁটুটা ঠেসে ধরে আছে সে রানার শিরদাঁড়ার ওপর। সুযোগ বুঝে নিচের লোকটা ছুটিয়ে নিল একটা হাত, এবং ধাঁই করে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল রানার নাকের ওপর। বোঁ করে উঠল রানার মাথা। ধুপধাপ পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল সে, অনেক লোক এগিয়ে আসার, অস্পষ্ট হয়ে গেল শব্দটা।

গলা থেকে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল রানা, পেছন দিকে

কনুই চালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু লাভ হলো না কিছুই। ক্রমে আরও চেপে বসে যাচ্ছে আঙুলগুলো গলার মাংসে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে রানার, ভোঁ-ভোঁ করছে কান, মাথার মধ্যে হাতুড়ি পিটছে পালস-বিট। আরেকটা ঘুসি পড়ল ওর চোয়ালের ওপর। প্রাণপণ শক্তিতে ওপর দিকে ঠেলা দিল রানা, কাত হয়ে পড়ল বাঁ পাশে। পিঠের ওপর চেপে বসা লোকটাও পড়ল ওর সঙ্গে। পড়েই এক গড়ান দিল রানা, ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল দুজন একসঙ্গে। বেশ গভীর পানি।

পানিতে পড়েই রানার গলা থেকে হাত ছুটে গেল লোকটার। ওপরে ভেসে উঠল রানা। ওর কাছাকাছিই ভেসে উঠল লোকটা, মুখ দিয়ে অনর্গল বেরোচ্ছে ইটালিয়ান গালি।

ঠাণ্ডা পানির সংস্পর্শে এসেই বোধশক্তি ফিরে এসেছে রানার। বড় করে একটা দম নিয়েই ডুব দিল সে। খপ করে লোকটার কোট ধরে টেনে নামিয়ে আনল নিচে। দুই পা দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরেছে সে লোকটার, অসহায় ভাবে ধরা পড়েছে লোকটা রানার হেড-লকে। ধীরে ধীরে রানার দুই হাত চলে এল লোকটার কণ্ঠনালীর উপর। আধমিনিটের মধ্যে গোটা কয়েক ঝাঁকুনি খেল লোকটার সর্বশরীর, তারপর জ্ঞান হারিয়ে স্থির হয়ে গেল। লোকটার পাছায় জোরে এক লাথি মেরে ওকে তীরের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে ভুশ করে ভেসে উঠল রানা পানির ওপর।

‘আপনি নাকি, সিনর মাসুদ রানা?’ বাতিস্তার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর।

‘হ্যাঁ।’ মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের ওপর থেকে চুল সরাল রানা। ব্রেস্টস্ট্রোক দিয়ে চলে এল বাতিস্তার পাশে।

‘ঠিক সময় মতই পানিতে পড়েছিলেন,’ বলল বাতিস্তা। ‘আরও পনেরো বিশজন পৌঁছে গিয়েছিল প্রায়। আপনাকে পানিতে পড়তে দেখে আমিও সোজা ডাইভ দিয়েছি খালে।’

‘ওরা কোথায়?’ এদিক ওদিক চেয়ে গনডোলাটা খুঁজল রানা।

‘খালের দুই পারে। অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।’

‘আর ওস্তাদ?’

‘নিরাপদে চলে গেছে গনডোলা নিয়ে। গনডোলায় ছিল ওদের একজন। ওকে মাথার ওপর তুলে ছুঁড়ে পারে ফেলে ছেড়ে দিয়েছে নৌকা। ও-ই তো আপনার গলা টিপে ধরেছিল।’

‘আমিও ওর গলা টিপে দিয়েছি পানির নিচে। ঠিক আছে, এগোও এবার। শব্দ করো না। খুব সম্ভব দেখতে পাবে না ওরা আমাদের।’

এগোল ওরা, কিন্তু কিছুদূর এগিয়েই ভুল ভাঙল রানার। পরিষ্কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওদের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে খালের দুপারে দুটো দল। খালের অন্ধকারতম জায়গায় থেমে দাঁড়াল ওরা কিছুক্ষণ, থেমে গেল পায়ের শব্দ।

বেশ কিছুটা দূরে অস্পষ্ট একটা ছপাৎ শব্দ শুনে প্রমাদ গুণল রানা।

‘বাতিস্তা। একটা গনডোলা আসছে এইদিকে। কাছাকাছি এলেই ডুব দেবে। যদি মাথার ওপর ছপাৎ আওয়াজ পাও, বুঝবে আমাদের ধরতে এসেছে ওটা। কিংবা মারতে এসেছে। সাবধান!’

‘ওস্তাদও হতে পারে, সিনর। হয়তো...’

কথাটা শেষ করবার আগেই বড় একটা কালো গনডোলার ছায়া দেখা গেল। বাতি নেই। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে প্রায় ওদের ঘাড়ে এসে পড়বার উপক্রম করল গনডোলাটা।

‘ডুব দাও।’ প্রায় ধমকের সুরে বলল রানা।

ডুব দিল রানা। কয়েক মুহূর্ত আগে যেখানটায় ওর মাথা ছিল, ঠিক সেই জায়গাটায় চড়াৎ করে জোরে একটা আওয়াজ হলো। মনে মনে হাসল রানা। ঠিক জায়গাতেই মেরেছে গনডোলিয়ার, শুধু সময়ের একটু এদিক আর ওদিক।

চট করে ভেসে উঠল রানা। কাছাকাছিই ভেসে উঠল বাতিস্তা। একই সঙ্গে চোখ গেল দুজনের গনডোলার দিকে।

একটু এগিয়েই থেমে দাঁড়িয়েছে গনডোলা। আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে চালককে। ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে ঘোরাচ্ছে নৌকাটা।

‘গনডোলাটা দখল করে নেয়া যাক, কি বলো?’ চাপা কণ্ঠে বলল রানা। ‘দুজন দুপাশে। ওর বৈঠা থেকে সাবধান।’

‘আমি ওর মনোযোগ আকর্ষণ করব, সিনর। আপনি ওর পা ধরে মারবেন খিঁচে টান।’

‘ঠিক আছে। এই যে আসছে। ডুব দাও।’

ডুব দিয়ে সরে গেল দুজন দুপাশে।

পানি থেকে বুক পর্যন্ত উঁচু করে ফেলল বাতিস্তা, হাত নেড়ে ইশারা করল গনডোলিয়ারকে।

দুই হাতে বৈঠাটা মাথার ওপর তুলল মাঝি। সামনে এগিয়ে এল রানা, চট করে গলুই ধরে উঠে পড়ল উপরে, থাবা চালাল পায়ের কব্জি লক্ষ্য করে। গনডোলিয়ারের ফুলপ্যান্ট বাধল হাতে। সেটা খামচে ধরে আবার লাফ দিল রানা পেছন দিকে।

একখানা কলজে কাঁপানো আর্তনাদ দিয়ে ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল লোকটা বৈঠা ছেড়ে।

ততক্ষণে দ্রুত এগিয়ে এসেছে বাতিস্তা। দমাদম দুটো কিল বসিয়ে দিল গনডোলিয়ারের নাক বরাবর। আর টুঁ শব্দ না করে একরাশ ভুড়ভুড়ি ছেড়ে তলিয়ে গেল লোকটা। সাঁতরে গিয়ে ভাসমান বৈঠাটা নিয়ে এল রানা।

মাঝিবিহীন গনডোলা ধীরে ধীরে চলেছে পারের দিকে।

বৈঠাটা পাটাতনের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে গলুই বেয়ে উঠে পড়ল রানা। বাতিস্তাও উঠে এল। দশ সেকেন্ডে সোজা হয়ে গেল গনডোলা পাকা মাঝি পেয়ে। অন্ধকার ভেদ করে ছুটল ওরা সামনের দিকে। পাঁচ মিনিট পর থেমে গেল পায়ের শব্দ।

ছোট খাল ছেড়ে বড় খালে পড়েছে ওরা। আর অনুসরণ করবার উপায় নেই।

তীরবেগে ছুটে চলেছে গনডোলা।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)
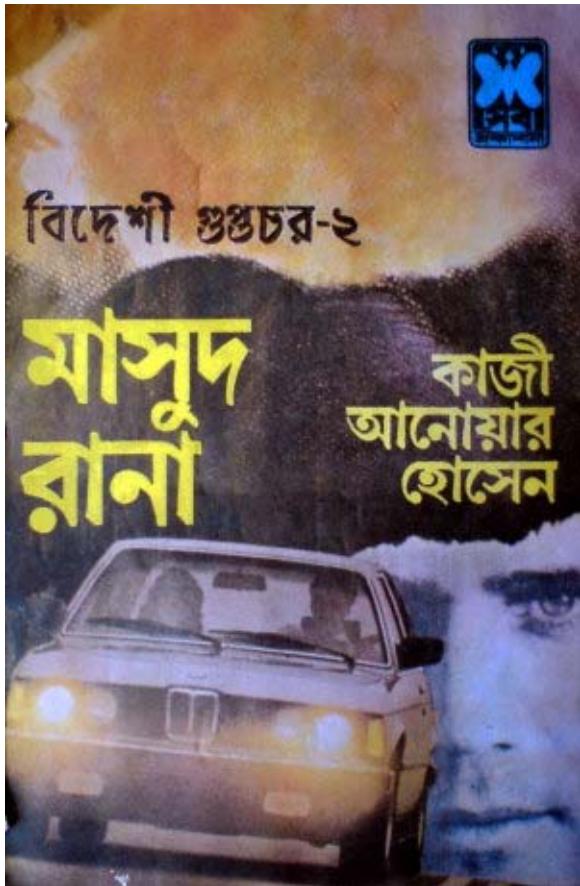
মাসুদ রানা

বিদেশী গুপ্তচর-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৭৪

এক

মার্সোরিয়ার ক্লক টাওয়ারে ব্রোঞ্জের দুটো দৈত্যের মূর্তি ঢং ঢং পিটিয়ে চলেছে প্রকাণ্ড ঘণ্টা। রাত বারোটা।

সান জাকারিয়া ভেপোরেটি স্টেশনে ল্যাণ্ডিং স্টেজে গনডোলাটা বেঁধে রেখে দ্রুতপায়ে হাঁটছে ওরা ওস্তাদের কোয়ার্টারের দিকে। বার বার পিছু ফিরে, অন্ধকার গলিতে মোড় ঘুরেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে নিশ্চিন্ত হয়েছে ওরা, কেউ অনুসরণ করছে না ওদের।

পথ চলতে চলতে দাড়ি গোঁফ খসিয়ে ফেলল রানা, এখন আর দরকার নেই ওসবের। চিনে ফেলেছে ওরা ওকে। এবার যা হবে সামনা-সামনিই হোক, পুলিসের হাতে ধরা পড়ে ছদ্মবেশের কৈফিয়ৎ দিতে চায় না ও আর। কেন যেন রানার মনে হচ্ছে, ওরা এবার পুলিসের সাহায্য নেবে। মহা বিপদে ফেলে দিতে পারে ওরা যদি পুলিসের সাথে লাইন থাকে।

দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। টোকা দিতেই ভারি কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন এল, 'কে? কি চাই?'

'আমরা, ওস্তাদ,' বাতিস্তা বলল। 'দরজা খুলুন।'

'উঁহুঁ। এই জানালার পাশে এসে দাঁড়াও। চেহারা না দেখে

খুলছি না।’

প্রমাদ গুণল রানা। আসল চেহারায় চিনবে না ওকে ওস্তাদ। তবু গিয়ে দাঁড়াল জানালার পাশে।

‘একটাকে চিনলাম, কিন্তু এটাকে আবার কোত্থেকে জোটালে? দেখলে মনে হয় খুনী! আমার আসল সাগরেদ কোথায়?’

‘আসল সাগরেদ আবার কে?’ অবাক হলো বাতিস্তা।

‘আরে ক্যাপ্টেন। সেই দারুণ ছেলেটা। কি নাম যেন...’

‘ইনিই সিনর মাসুদ রানা, ওস্তাদ। দরজা খুলুন। ছদ্মবেশ খুলে ফেলেছেন।’

বিস্ফারিত চোখে রানাকে দেখল পাগলা ওস্তাদ।

‘আরে! এ দেখছি মুহূর্তে মুহূর্তে ভোল পাল্টাচ্ছে। তাজ্জব কারবার! কোন্ ইয়ারে পাস করেছ?’

দরজা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকে পড়ল ওরা, ছিটকিনি তুলে দেয়া হলো আবার।

‘কেমন আছে অনিল?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘যেমন ছিল তেমনি। তবে শিগগিরই ভাল হয়ে উঠবে। আউন্স দুয়েক ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দিয়েছি। আমার মনে হয় যত্নের অভাবে এই হাল হয়েছে ছেলেটার, খানিক আদর-যত্ন পেলেই ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তার দেখানো দরকার।’ হঠাৎ খেয়াল করল ওস্তাদ ওদের ভেজা জামা কাপড়। ‘আরে! দু’জনেই দেখছি চুপচুপে হয়ে ভিজে এসেছ। ছেড়ে ফেলো, কাপড় ছেড়ে ফেলো। পাশের ঘরে উনুনে দিলে শুকিয়ে যাবে দশ মিনিটে।’

আলমারি থেকে দুটো বেড কাভার বের করে ছুঁড়ে দিল ওস্তাদ ওদের দিকে। খপ করে একটা শূন্যে ধরে খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। মড়ার মত পড়ে আছে অনিল। গলা পর্যন্ত কম্বল দিয়ে ঢাকা। পাল্স্ পরীক্ষা করল রানা। আগের চেয়ে কিছুটা ভাল, কিন্তু খুবই দুর্বল। ভরসা পেল না রানা। একে নিয়ে কি

করে কলকাতায় ফিরবে সে?

কাপড় ছাড়তে শুরু করল রানা। পাশের ঘর থেকে তিনজনের জন্যে তিন কাপ গরম কফি নিয়ে এল ওস্তাদ। বাষ্প উঠছে। ওদিকে একবার চেয়েই জিভে পানি এসে গেল রানার। আর ওস্তাদের জিভে পানি এসে গেল রানার পেটা শরীরের দিকে একবার নজর বুলিয়ে।

‘বাহ, বড় সুন্দর ফিগার তো হে তোমার! কোন্ ইয়ারে পাস করেছ?’ ট্রেটা নামিয়ে রেখে এগিয়ে এল ওস্তাদ, রানার বাইসেপ, চেস্ট, থাই আর কাফ মাস্ল্ টিপে দেখল, কয়েক পা দূরে সরে গিয়ে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখল আপাদমস্তক, তারপর বলল, ‘এত ব্যাল্যান্সড্ ফিগার সহজে চোখে পড়ে না। তিন বছর আগে এসেছিল একটা ছাত্র, মাত্র গড়ে তুলতে শুরু করেছিলাম, এমন সময় বদলি হয়ে চলে গেল ওর বাপ মিলানোতে। এমন রাগ লেগেছিল আমার। এত করে বললাম...যাকগে, কেউ কোথাও চোট পেয়েছ? মালিশ বা ম্যাসেজ লাগবে?’

‘আমার লাগবে ওস্তাদ,’ বলল বাতিস্তা। ‘পিঠে।’

‘কফিটা খেয়ে নাও, দিচ্ছি ঠিক করে।’

তাকের উপর থেকে একটা মলমের কৌটা পেড়ে এনে রাখল ওস্তাদ টেবিলে। রানার দিকে ফিরল।

‘এবার কি করবে, ক্যাপ্টেন? একে নিয়ে কি করা যায়?’ অনিলের দিকে ইঙ্গিত করল ওস্তাদ।

‘একে নিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে চাই। আগামীকাল সন্ধের আগে অ্যালিটালিয়ার কোন ফ্লাইট নেই, ভাবছি সম্ভব হলে একটা প্লেন চার্টার করব।’ কফির কাপে চুমুক দিল রানা।

‘যাই করো, একে নিয়ে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছতে হবে তোমাকে। সেটা সহজ হবে না। যতদূর বোঝা গেল, যেমন ভাবে পারে বাধা দেবে শয়তানগুলো। ওদের লোকজনও দেখলাম

প্রচুর। আমার সব সাগরেদকে ডেকে পাঠাব কিনা ভাবছি। তিন হাজার সাগরেদ এসে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে আমি একটা ডাক দিলে।'

'তার দরকার নেই, ওস্তাদ।' হাসল রানা। 'আপনার পুরানো সাগরেদদের মধ্যে খুব বড়লোক কেউ আছে?'

'অনেক আছে। কেন?'

ভেজা কাপড়গুলো শুকোতে দিয়ে ফিরে এসে বসল বাতিস্তা রানার পাশে। একটা কফির কাপ তুলে নিল।

'তাদের মধ্যে কারও মোটরবোট আছে?'

ছাতের দিকে চেয়ে এক সেকেণ্ড চিন্তা করল পাগলা ওস্তাদ। তারপর বলল, 'আছে। কেন?'

'আপনি চাইলে দু'দিনের জন্যে পাওয়া যাবে বোটটা?'

'আমি চাইলে ধন্য হয়ে যাবে ম্যারিয়ানো। তোমার লাগবে? বোটে করে লিডো যেতে চাইছ? চিন্তা নেই, যখন বলবে তখুনই জোগাড় করে দিতে পারব মোটরবোট। কখন লাগবে তোমার?'

'আগে এর অবস্থাটা ভাল করে বুঝে নেয়া দরকার,' বলল রানা অনিলকে দেখিয়ে। 'বিশ্বাস করা যায় এমন কোন ডাক্তার আছে আপনার চেনাজানা?'

মাথা ঝাঁকাল ওস্তাদ। 'আছে। ডক্টর ভিসকন্টিকে ডেকে আনা যায়। ইউনিভার্সিটির ডাক্তার। একটু বেশি বুড়ো, কিন্তু লোক ভাল। কাছেই থাকে, বেশি দূরে না, ডেকে আনা দরকার?'

'ডাকলে ভাল হয়।'

'ঠিক আছে, বাতিস্তার পিঠটা ঠিক করে দিয়েই ডেকে আনছি।' মৃদু চাপড় দিল বাতিস্তার পিঠে। 'শুয়ে পড়ো হে, ছোকরা। কি শরীর বানিয়েছ যে ব্যথা লাগে? শুয়ে পড়ো।'

মেঝের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বাতিস্তা। কৌটো থেকে মলম বের করে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ওস্তাদ ওর পিঠের

উপর। হুম-হাম শব্দ হলো কিছুক্ষণ, তারপর হাফপ্যান্টের পিছনে দুই হাত মুছে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ওস্তাদ। উঠে বসে হাত-পা ঝাড়া দিল বাতিস্তা, পিঠ বাঁকিয়ে পরীক্ষা করল ব্যথাটা আছে কিনা, তারপর হাসল।

'ওস্তাদের হাতে জাদু আছে। গুণ না থাকলে কি আর এতগুলো ছেলে ওস্তাদ বলতেই একেবারে অজ্ঞান হয়ে যায়? ব্যথাটা একেবারে গায়েব।'

'হয়েছে, হয়েছে। আর তেল মারতে হবে না। দরজা লাগিয়ে চুপচাপ বসে থাকো। সাবধানে থাকবে। আর, কেউ দরজায় টোকা দিলেই হুট করে খুলবে না। বুঝেছ?'

বেরিয়ে গেল পাগলা ওস্তাদ। দরজা লাগিয়ে দিয়ে আবার একবার অনিলের পাল্স্ দেখল রানা। দুশ্চিন্তা ফুটে উঠল ওর চোখেমুখে। ওয়াটারপ্রুফ সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করে ধরাল, বসল খাটের কিনারে। বাতিস্তা বসল একটা চেয়ারে।

'সিনর চ্যাটার্জীর ওপর নির্যাতন করা হচ্ছিল ওই বাড়িতে,' যেন কথার কথা বলছে এমনিভাবে বলল বাতিস্তা। 'তার মানে, যা জানতে চায়, জুলির ওপর নির্যাতন করে সেটা জানতে পারেনি ওরা। কিন্তু কি জানতে চায়? কি এমন তথ্য আছে এর কাছে যেটা ওদের না পেলেই নয়? এতখানি মরিয়া হয়ে উঠেছে কেন ওরা?'

'এর উত্তর আমার জানা নেই, বাতিস্তা। তবে মনে হচ্ছে শিগগিরই জানতে পারব।'

কথাটা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই চোখ মেলল অনিল। সোজা চেয়ে আছে রানার মুখের দিকে। স্থির দৃষ্টি। কেমন যেন শিরশির করে উঠল রানার শিরদাঁড়ায়। ভাবলেশহীন, প্রাণহীন, চকচকে, স্থির দৃষ্টি। মনে হচ্ছে মরা মানুষের চোখ। ঠোঁট দুটো একটু কাঁপল অনিলের, মাথাটা একপাশে ফিরল কিছুটা।

'অনিল! আমি রানা। মাসুদ রানা। শুনতে পাচ্ছ? আমি মাসুদ

রানা।'

খুব ধীরে ধীরে রানার দিকে ফিরল অনিল। প্রাণহীন দৃষ্টিটা পার হয়ে গেল রানার মুখ, দেখতে পেল না রানাকে।

'অনিল! তুমি এখন নিরাপদ। আর কোন ভয় নেই।' গলার স্বর আর একটু চড়িয়ে দিল রানা। 'কোন ভয় নেই। আমি রানা। চিনতে পারছ?'

অনিলের সারা শরীর শিউরে উঠল একবার। হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল ওর চোখ দুটো। রানার মুখের উপর নিবদ্ধ হলো ওর দৃষ্টি।

'কোন চিন্তা নেই, অনিল। কোন ভয় নেই। কথা বোলো না এখন, নিশ্চিন্তে ঘুমাও। ডাক্তার আসছে, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ব্র্যাণ্ডি মিশানো দুধের বাটিটা নিয়ে এল বাতিস্তা। মাথাটা একটু উঁচু করে ধরল রানা, কয়েক চামচ দুধ খাওয়াল ওকে বাতিস্তা। চোখ বন্ধ করতেই বোঝা গেল আর খাবে না। মাথাটা বালিশের উপর নামিয়ে দিল রানা।

রক্তশূন্য মুখটা কুঁচকে কুঁচকে উঠছে থেকে থেকে।

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে রানা ও বাতিস্তা ওর মুখের দিকে। মিনিট পাঁচেক পর আবার চোখ মেলল অনিল, রানাকে খুঁজে পেয়ে স্থির হলো ওর দৃষ্টিটা রানার মুখে। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না যেন অনিল। ওর বুকের ওপর হাত রাখল রানা আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে।

'আমার সামনে জুলিকে ওরা...জুলিকে...' গলাটা ভেঙে গেল অনিলের। যেন নালিশ জানাচ্ছে রানার কাছে। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল। টপ টপ ঝরছে বালিশের উপর।

'এখন কথা বোলো না, অনিল। যা হবার হয়ে গেছে, ওসব নিয়ে ভেবো না এখন। চুপচাপ বিশ্রাম নাও।'

আবার ঠোঁট নড়ল অনিলের। কি বলছে বোঝা গেল না। ওর

মুখের কাছে কান নিয়ে গেল রানা। শুনতে পেল, ফিস ফিস করে অনিল বলছে, 'মরে যাচ্ছি, কিন্তু...তার আগে...আগে...'

'মরার কথা ভুলে যাও অনিল। ওই বাড়ি থেকে বের করে এনেছি তোমাকে আমরা। আর কোন ভয় নেই। মরবে না তুমি। তোমার মায়ের লেখা একটা চিঠি আছে আমার কাছে, একটু ভাল হয়ে উঠলেই দেব তোমাকে। এ যাত্রায় আর মরণ নেই তোমার। আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে কলকাতায়।'

'পারবে না।' দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল অনিল। 'ওরা...ওরা ভয়ানক...শোনো, রানা...' ক্রমে দুর্বলতর হচ্ছে অনিলের কণ্ঠস্বর। সামনে ঝুঁকে প্রায় ওর ঠোঁটের কাছে কান ঠেকাল রানা। কি বলল বোঝা গেল না, শুধু দুটো শব্দ শুনতে পেল সে, 'ডি ফ্যাবোরি...মন্দির...'

'কি বললে? অনিল, কি বললে?'

আরও কি যেন বলবার চেষ্টা করল অনিল, কিন্তু ঠোঁট দুটো নড়ল কেবল, কোন রকম শব্দ বেরোল না গলা দিয়ে। এইটুকু পরিশ্রমেই বুজে এল চোখ, ক্লান্তি ও দুর্বলতায় জ্ঞান হারাল আবার।

সোজা হয়ে বসল রানা।

'কি যেন বলবার চেষ্টা করছিল অনিল,' প্রায় আপন মনে বলল রানা। 'কি বলতে চাইছিল ও? দুটো মাত্র কথা। ডি ফ্যাবোরি, আর মন্দির। কি বোঝায় এতে? ডি ফ্যাবোরি বলে একটা জায়গা আছে জানি...'

'ভার্জিন মাদারের একটা মন্দিরও আছে ওখানে,' বলল বাতিস্তা।

'ঠিক বলেছ!' উৎসাহিত হয়ে উঠল রানা। 'কিন্তু...তাতে কি বোঝায়? কি বলতে চাইছিল ও?'

ঠক ঠক ঠক! টোকা পড়ল দরজায়।

‘কে?’ উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করল বাতিস্তা। ‘জানালার কাছে এসে দাঁড়ান।’

ভাল মত পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে দরজা খুলে দিল বাতিস্তা। ওস্তাদের পিছন পিছন ঘরে ঢুকল শুকনো, খিটখিটে চেহারার প্রবীণ এক লোক। তোবড়ানো গালে বয়সের ভাঁজ।

‘ইনি ডক্টর ভিসকন্টি,’ বলল ওস্তাদ।

উঠে দাঁড়াল রানা। ‘আমি মাসুদ রানা।’ হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করল। ‘আমার এক বন্ধু গুরুতর অসুস্থ। একটা দলের সাথে গোলমাল বেধেছিল ওর। বিস্তারিত সবকিছু জানি না আমি, গোলমালটা রাজনৈতিকও হতে পারে। ওকে গুলি করে জখম করা হয়েছে। তার ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। ব্যাপারটা গোপনীয়। কাজেই আপনার এই ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখতে হবে।’

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইল ভিসকন্টি। ঘন ভুরু জোড়া কুঁচকানো।

‘আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়, সিনর। আপনার বন্ধু যদি জখম হয়ে থাকে, আমার কর্তব্য হচ্ছে পুলিসে জানানো। পুলিসে খবর দিতেই হবে আমাকে।’

‘কিন্তু আমার বন্ধু ভারতীয়। ইটালিয়ান পুলিসের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ইণ্ডিয়ান হাই কমিশনে জানানো হবে ব্যাপারটা।’

কাঁধ ঝাঁকাল ডক্টর ভিসকন্টি।

‘তবু পুলিসে জানানোই আমাদের নিয়ম। তবে আপনার বন্ধু যদি ভারতীয় হন, সেক্ষেত্রে আমি চেপে যেতে পারি বিদেশী বলে। যাই হোক, রুগীকে দেখা যাক আগে।’

এক মিনিট পরীক্ষা করেই উঠে দাঁড়াল ডাক্তার। গম্ভীর মুখে কাঁধ পর্যন্ত ঢেকে দিল অনিলকে কম্বল দিয়ে।

‘এর অবস্থা খুবই খারাপ। এক্ষুণি হাসপাতালে ভর্তি করা

দরকার। অ্যাকিউট নিউমোনিয়া হয়ে গেছে, তাছাড়া এক্সপোজার ও শক লেগেছে ভয়ানক। গোপনীয়তার কোন উপায় নেই।’

‘এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় না?’ বলল রানা। ‘খরচের জন্যে ভাববেন না। হাসপাতালে না নিয়ে যদি ওকে সুস্থ...’

মাথা নাড়ল ডাক্তার।

‘মারা যাবে তাহলে। এক্ষুণি হাসপাতালে নেয়া দরকার। ওখানে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি আছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে অক্সিজেন টেন্টে না রাখলে বাঁচানো যাবে না একে।’

বাতিস্তার দিকে ফিরল রানা।

‘ঠিক আছে। তুমিও যাবে অনিলের সাথে হাসপাতালে। এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করবে না ওকে। আমি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আসছি হাসপাতালে। কয়েকটা কাজ সেরেই আমি চলে আসব, তখন তোমার ছুটি।’

‘অলরাইট, সিনর।’

একটু উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাইল ডাক্তার রানার দিকে। ‘আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ভদ্রলোক এখনও বিপদমুক্ত নন। ব্যাপারটা পুলিসে জানালেই কি ভাল হত না?’

‘তার আগে আমি ভারতীয় হাই কমিশনারের সঙ্গে কথা বলতে চাই। একে হাসপাতালে নেয়ার কি ব্যবস্থা?’

‘আপনারা যদি ওকে বয়ে নিয়ে গনডোলায় তুলতে পারতেন তাহলে সবচেয়ে ভাল হত। আমি স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করতে পারি, কিন্তু এখন সময়ের অনেক দাম। যত তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নেয়া যায়...’

‘আমি কোলে করে নিয়ে যাব ওকে। গনডোলাও রেডি, কোন অসুবিধে হবে না।’

‘বেশ। তাহলে রওয়ানা হওয়া যাক। আমি একটু তাড়াতাড়ি

বেরিয়ে পড়ি, এর জন্যে কেবিনের ব্যবস্থা করে ফেলি গিয়ে। আপনারা আসুন।' ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল ডাক্তার।

ডাক্তারের বাহুতে একটা হাত রাখল রানা। 'বুলেটটা ভিতরে রয়ে গেছে, না বের করে ফেলা হয়েছে?'

'সেটা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে বলা যাবে।'

'জখমে কি গ্যাংগ্রিনের আভাস পেলেন?'

'সেই জন্যেই তো এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।'

'বাঁচবে বলে মনে হয়?'

'চেষ্টার তো ত্রুটি করব না। কিন্তু এখন অনেকখানি নির্ভর করে রুগীর স্ট্যামিনার ওপর। বাঁচবেই, একথা জোর দিয়ে বলা যায় না, তবে চান্স আছে।'

'আপনার সাথে আমাদের কারও যাওয়ার প্রয়োজন আছে?'

'না। তার দরকার নেই। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখি গিয়ে, আপনারা আসুন।'

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ডাক্তার ভিসকন্টি। দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে ওস্তাদের কাঁধে হাত রাখল রানা।

অনিলকে কোলে তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করছিল ওস্তাদ, চমকে চাইল রানার দিকে।

ইশারায় পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল রানা ওস্তাদ এবং বাতিস্তাকে। ফিস ফিস করে বলল, 'ভুলটা আমারই হয়েছে। ডাক্তার ডাকা উচিত হয়নি।'

'কেন?' চোখ কপালে উঠল ওস্তাদের।

'আপনি নিজে কয়েকটা ব্যাপার পরীক্ষা করে দেখে আসুন পাশের ঘর থেকে, তারপর ব্যাখ্যা দেব।'

এদিকের ঘরে এসে অনিলের পালস্ পরীক্ষা করল ওস্তাদ, কাঁধের জখমটা শুঁকে দেখল ব্যাণ্ডেজের কাছে নাক ঠেকিয়ে, বুকে

কান ঠেকিয়ে শুনল শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল তার মুখের চেহারা। ফিরে এসে কটমট করে চাইল রানার দিকে।

'ব্যাটা থাকতে থাকতেই কথাটা বলনি কেন? এক কিলে হারামজাদার মাথাটা ভেঙে দিতাম আমি।'

দ্রুতহাতে কাপড় পরছে রানা ও বাতিস্তা।

'শেষ মুহূর্তে সন্দেহটা হলো আমার,' বলল রানা। 'আমরা পুলিসে জানাব না শুনে স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল ওর মুখে। তাই দেখেই শেষের কয়েকটা প্রশ্ন করলাম। নিজেই তো দেখলেন, গ্যাংগ্রিন-নিউমোনিয়া, সব বাজে কথা। সিলভিওর আদেশে আগাগোড়া মিথ্যে কথা বলছে ডাক্তার।'

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল ওস্তাদ। কঠোর হয়ে উঠেছে মুখের চেহারা। কথা বলেই চলল রানা।

'আমার যতদূর বিশ্বাস হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছতে পারব না আমরা। তার আগেই আসবে আক্রমণ। খুব সম্ভব গনডোলার ওপর আক্রমণ করবে ওরা। তবু যেতে হবে আপনাদের।'

'আর অনিল?'

'বাঁচতে হলে আগে মরতে হবে ওকে। আশে পাশে কোথাও ওকে দু'চারদিন রাখার মত কোন জায়গা আছে?'

'আছে।'

'তাহলে শুনুন মন দিয়ে। তুমিও শোনো, বাতিস্তা...'

সংক্ষেপে প্ল্যানটা বুঝিয়ে দিল রানা ওদের। একটানা তিন মিনিট কথা বলে থামল।

'আর ওর চিকিৎসার কি হবে?' প্রশ্ন করল ওস্তাদ।

'আগামীকাল দুপুরের মধ্যে লাইন ক্লিয়ার করে দেব আমি। চিকিৎসার কোন অসুবিধে থাকবে না আর। অবশ্য আমার ধারণা, দু'দিন বিশ্রাম পেলে অনেক ভাল হয়ে যাবে ও এমনিতেই। ডক্টর ভিসকন্টির ওপর রাগ করে লাভ নেই, ওস্তাদ, ওদের সাহায্য না

করে উপায় নেই ওর, প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যেত তাহলে। সব ডাক্তারের একই অবস্থা। কিন্তু কাল দুপুরের পর রিপোর্ট করার লোক পাবে না ওরা ভেনিসে।'

'বেশ। তোমার সাথে কোথায় দেখা হচ্ছে আমাদের?' জিজ্ঞেস করল ওস্তাদ।

'আমার সাথে দেখা করবেন ডেলা টলেটা প্যালাযোতে। লাইবেরিয়া ভেচিয়ার কাছে। একশো বাহাত্তর নম্বর। ওখানেই পরবর্তী প্রোগ্রাম ঠিক করা যাবে।'

'আর আক্রমণ না এলে?' হাসল বাতিস্তা। 'তাহলে কি বোঁচকা নিয়ে খামোকা হাসপাতালে গিয়ে হাজির হব?'

'আক্রমণ আসবেই। কিন্তু সাবধান! দেখো, ধরা পড়ো না আবার। তাহলে সব কিছু গোলমাল হয়ে যাবে।'

আর কথা না বাড়িয়ে নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় আলাপ করে বেরিয়ে পড়ল ওস্তাদ অনিল আর বাতিস্তাকে নিয়ে বাড়ির পেছন দরজা দিয়ে। আগাগোড়া প্ল্যানটা মনের মধ্যে নেড়েচেড়ে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে লাইট নিভিয়ে বেরিয়ে গেল রানা সামনের দরজা দিয়ে। চারপাশে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে দ্রুত পায়ে এগোল ডি ফ্যাবোরির দিকে।

এত রাতেও ডি ফ্যাবোরি জনাকীর্ণ। মনটা দমে গেল রানার। একদল আমেরিকান ট্যুরিস্ট হাঁটছে ঢিমে তেতালা ছন্দে, হাউ বিউটিফুল, হাউ নাইস, হাউ ডিলাইটফুল বলতে বলতে। তাদের বেশ কিছুটা পিছনে হাঁটছে তিনজন বয়স্কা মহিলা একজন বয়স্ক গাইডের অনর্গল বক্তৃতা শুনতে শুনতে। তারও গজ দশেক পিছনে হাঁটছে একজোড়া নব দম্পতি- খুব সম্ভব হানিমুনে এসেছে। এত লোকের মধ্যে ভাল করে পরীক্ষা করা যাবে না দেয়াল-মন্দিরটা।

একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা। লোকজন একটু হালকা হোক।

মন্দিরের কথাটা বলল কেন অনিল? ও কি ওখানে কোন মেসেজ লুকিয়ে রেখেছে? কিংবা কোন জিনিস? মন্দিরের সাথে ওর এই নিখোঁজ হওয়ার কি সম্পর্ক? মন্দিরের কথাটা সজ্ঞানে বলেছিল অনিল, নাকি প্রলাপ বকছিল তখন? কি আছে ওখানে?

পিছন ফিরে চাইল রানা। নতুন কোন ট্যুরিস্ট নেই। সান মার্কোর পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। মন্দিরটা রিয়াল্টো ব্রিজের কাছাকাছি, জানে রানা। সামনের লোকজন বেশ কিছুটা এগিয়ে যেতেই ধীর পায়ে চলতে শুরু করল। বেশ কিছুদূর এগিয়ে আবার থামল একটা অন্ধকার ছায়ায়। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে মন্দিরটা। একটা ম্লান আলো জ্বলছে দেয়ালের গায়ে। আমেরিকানদের দলটা থেমে দাঁড়িয়ে মিনিট তিনেক হাউ নাইস, হাউ এনচ্যানটিং-এর পর আবার হাঁটতে থাকল সামনের দিকে। প্রবীণ দলটাও বেশি দেরি করল না। কিন্তু নব-দম্পতি প্রেমে পড়ে গেল মন্দিরটার। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওরা, নড়বার কোন লক্ষণই নেই।

'কি অপূর্ব! তাই না?'

'সত্যি!' মেয়েটার কোমর জড়িয়ে ধরল ছেলেটা। 'ঠিক তোমার মত।'

ছেলেটার চোখে চোখ রাখল মেয়েটা। বিভোর হয়ে গেল দু'জন দু'জনাতে।

'দশ বছর পর একথা বলবে?' আহ্লাদী ভঙ্গিতে ঘাড় কাৎ করল মেয়েটা।

ঝেড়ে গাল দিল রানা ওদের মনে মনে। কিন্তু তাতে এতটুকু বিচলিত হলো না ওদের মুগ্ধ বিস্ময়। আসলে দর্শনীয় বস্তু দেখতে আসেনি ওরা, আবিষ্কার করছে একে অপরকে নিবিড় ভাবে, টুকরো কথায়।

'বলব, চেরি। কিন্তু তোমার কি ভাল লাগবে তখন এসব

শুনতে? কাচ্চা-বাচ্চা, ক্যাঁও-ম্যাঁও নিয়ে পাগল হয়ে থাকবে তুমি, আমাকে দেখলেই হয়তো খ্যাঁক করে উঠতে ইচ্ছে করবে তখন তোমার।'

'যাহ্, কক্ষনো না। আমি ওরকম হব না কোনদিনই।'

হাসল ওরা পরস্পরের দিকে চেয়ে, গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে চুমো খেল।

ওদের ছেড়ে ওদের বাপ-মাকে ধরল রানা এবার। অসহিষ্ণু ভাবে একবার এ পা, একবার ও পায়ের উপর ভর দিয়ে অপেক্ষা করছে সে। বিড় বিড় করে অনর্গল খিস্তি বেরোচ্ছে ওর মুখ থেকে। খুব সম্ভব টনক নড়ল এতে ছোকরার স্বর্গীয় পিতার, কিংবা রানার কাশির শব্দ শুনতে পেল সে, শুভ বুদ্ধির উদয় হলো ওর মধ্যে। ততক্ষণে সশব্দে পা ফেলে এগোতে শুরু করেছে রানা। পিছন ফিরে রানার দিকে একবার চেয়ে মৃদু টান দিল মেয়েটার কোমরে।

'চলো এগোই, চেরি। খিদেয় নাড়িভুঁড়ি জ্বলছে। সামনের কোন রেস্তোরাঁয় খেয়ে নেয়া যাক।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল রানা। চলে যাচ্ছে নব দম্পতি। দ্রুত পা ফেলে চলে এল সে মন্দিরটার কাছে।

কিছুই মাথায় ঢুকল না রানার। দেয়ালের গায়ে ছোট একটা গর্ত। মোটা শিকের গরাদ দিয়ে ভিতরটা সুরক্ষিত। ভিতরে ভার্জিন মেরির ছোট্ট একটা মূর্তি। মূর্তির সামনে ফুলদানীতে প্লাস্টিকের আর্টিফিশিয়াল ফুল সাজানো। পাশেই জ্বলছে একটা প্রদীপ।

ছোট্ট মন্দিরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা। কিন্তু অনিলের সাথে মন্দিরের কিভাবে কি সম্পর্কে থাকতে পারে মাথায় এল না ওর। হতাশ হলো যারপর নাই।

ফিরে যাচ্ছিল রানা, দু'পা এগিয়ে থেমে দাঁড়াল ভুরু কুঁচকে।

কিছু নিশ্চয়ই আছে। এমন ভাবে কথাটা বলেছিল অনিল যেন মৃত্যুর আগে শেষ মেসেজ দিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই কিছু একটা নজর এড়িয়ে যাচ্ছে ওর। অনিলের মন্দিরের কথা উচ্চারণ অর্থহীন হতেই পারে না। আবার দেয়ালের ফোকরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল সে প্রত্যেকটা জিনিসের দিকে। তারপর গরাদের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিল ডান হাতটা। কনুই পর্যন্ত ঢুকে আটকে গেল হাত। বহুকষ্টে ঠেলেঠুলে আরও কিছুদূর ঢুকাল সে হাত, তারপর ফুলদানীটা কাত করল এদিকে।

ফুল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না রানা সেখানে। তবু কাছে টেনে আনল সে ফুলদানীটা। যদি কিছু লুকিয়ে রাখা হয়ে থাকে এখানে, তাহলে সেটা এই ফুলদানীর মধ্যেই থাকবে।

ফুলগুলো বের করে পাথরের মেঝেতে নামিয়ে রাখল রানা। তারপর হাত ঢোকাল ফুলদানীর সরু গর্তের ভিতর। কি যেন ঠেকল হাতে। কিছু একটা জিনিস গুঁজে রাখা আছে নিচের দিকের সরু ফোকরে। দুই আঙুলে ধরে সাবধানে বের করে আনল রানা জিনিসটা। ছোট্ট একটা প্যাকেট। নীল প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া।

ফুলগুলো আবার যথাস্থানে রাখতে গিয়েও নিজের অজান্তেই পিছন ফিরে চাইল রানা।

দ্রুতপায়ে আসছে দু'জন লোক। একজনের পরনে সাদা স্যুট, সাদা হ্যাট। ওড্ডি!

সরু গরাদের ফাঁক দিয়ে হাতটা টেনে বের করতে গিয়ে ছড়ে গেল খানিকটা, কিন্তু ব্যস্ততার জন্যে টেরও পেল না রানা। সরে এল দেয়ালের ফোকরের কাছ থেকে।

দৌড়াতে শুরু করেছে ওড্ডি। ওর সাথের লোকটাকেও চিনতে পারল রানা। হয় পপিনি, নয় ওর দলের বাকি দু'জনের একজন। গালে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। ওড্ডির পিছনে পিছনে দৌড়াতে শুরু করল সেও।

ঝট করে ঘুরেই ছুটতে শুরু করল রানা। পঞ্চাশ গজ দৌড়ে প্রথম ডানদিকের গলিটায় মোড় নিল সে। বিশ গজ পরেই গ্র্যাণ্ড ক্যানাল। ক্যানালের তীর ঘেঁষে চলে গেছে চওড়া একটা রাস্তা। গলি মুখে এসে দৌড়ের গতি কমিয়ে দিল রানা। বড় রাস্তায় পড়েই দেখতে পেল কয়েক গজ দূরে ধীর পায়ে হাঁটছে বেশ বড়সড় একটা ট্যুরিস্টের দল। নিশ্চিন্তে ঢুকে পড়ল সেই দলে।

আলগোছে বুক পকেটে রেখে দিল রানা প্যাকেটটা। তারপর এঁকে বেঁকে ঢুকে গেল দলের ঠিক মাঝখানটায়। এই মুহূর্তে ওকে আক্রমণ করা সম্ভব নয় ওড্ডির পক্ষে, জানে রানা, কিন্তু সহজে পিছন ছাড়বে বলেও মনে হয় না। নিশ্চয়ই ওরাও ঢুকে পড়েছে এই ট্যুরিস্টের ভিড়ে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে চাইল রানা।

ঠিক পাঁচ ফুট পিছনে রয়েছে ওড্ডি। চোখে চোখে চাইল দু'জন। মধুর একটা হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি খবর? কেমন আছেন? ভালো তো?'

ভুরু কুঁচকে কটমট করে চেয়ে রইল ওড্ডি রানার চোখের দিকে। ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে ওর চোখ প্রতিহিংসায়। কোন উত্তর দিল না।

ভিড়ের নিরাপত্তায় গা ভাসিয়ে দিল রানা। ধীর পায়ে হেঁটে চলেছে প্যালাযো ডেলা টলেটার দিকে। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করল রানা। একবার বাসায় পৌঁছতে পারলে ওকে বাগে পাওয়া সহজ হবে না এদের পক্ষে। বেশ কিছুদূর হেঁটে আবার পিছু ফিরে চাইল সে।

আছে। ধৈর্যের সাথে ওকে অনুসরণ করে চলেছে। দূরত্ব কমাবার চেষ্টা করছে না।

সান মার্কো পিয়াযার দিকে চলেছে পুরো দলটা। বাসার কাছাকাছি এসেই দ্রুততর করল রানা চলার গতি। সেই সাথে

বাঁয়ে কাটতে শুরু করল। ঠেলে ধাক্কিয়ে বামে কাটছে, আর অনবরত ক্ষমা চাইছে সে। হঠাৎ ভিড় থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা, বেরিয়েই পেয়ে গেল ওর বাসায় ঢোকার সিঁড়ি। দ্রুতপায়ে উঠে গেল সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে। দরজাটা খুলেই এক পা রাখল হলরুমে।

পিছন ফিরে চাইল রানা।

থামল না ওড্ডি বা তার সাথী। ওর দিকে চাইল না একবারও। এগিয়ে যাচ্ছে ভিড়ের চাপে সামনের দিকে। এত সহজে হাল ছেড়ে দিতে দেখে একটু অবাক হলো রানা, কিন্তু বুঝতে পারল, এত লোকজনের মধ্যে করবার তেমন কিছু নেইও আসলে ওদের।

দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। প্রকাণ্ড একটা হাঁপ ছেড়ে এগোল ওর শোবার ঘরের দিকে।

দুই সেকেণ্ডের স্বস্তি। তিন পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল রানা। ওর ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। আলো কিসের?

খুব দ্রুত হালকা পা ফেলে একটা টেবিলের ধারে চলে এল রানা। পকেট থেকে নীল প্যাকেটটা বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। টপ করে প্যাকেটটা ছেড়ে দিল সে একটা সূক্ষ্ম কারুকাজ করা তামার ফুলদানীর মধ্যে। দ্রুতপায়ে ফিরে এল ঘরের মাঝখানে।

ঠিক এমনি সময়ে খুলে গেল ওর শোবার ঘরের দরজা। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে সিলভিও পিয়েত্রো।

'স্বাগতম, সিনর মাসুদ রানা!' অত্যন্ত ভদ্রভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করল সিলভিও রানাকে। মুখে মিষ্টি হাসি। 'এই অনধিকার প্রবেশের জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আপনার সাথে জরুরী কথা আছে আমার।'

হাসিমুখে এগোল রানা। 'না, না। এর জন্যে ক্ষমা চাওয়ার

কিচ্ছু নেই। আপনাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্যে আমারই বরং ক্ষমা চাওয়া উচিত। খুব বেশি দেরি করে ফেলিনি তো?'

সোফার উপর বসে আছে লুইসা পিয়েত্রো। দরজার দুপাশে দাঁড়িয়ে গীয়ান আর লাল চুলো সেই লোকটা। দু'জনের হাতে দুটো নাক বোঁচা রিভলভার। রানার দিকে ধরা।

দুই

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সিলভিও পিয়েত্রো।

'এই নাটকীয়তার জন্যে আমাদের দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন, সিনর মাসুদ রানা,' বলল সিলভিও, 'কিন্তু এর প্রয়োজন ছিল। গত কয়েক ঘণ্টায় আপনি প্রমাণ করেছেন যে আপনি একজন অত্যন্ত দুর্ধর্ষ লোক। আপনার সম্পর্কে রিপোর্টও পৌঁছে গেছে আমার হাতে। কাজেই একটু বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হলো আমাদের। একটা কথা প্রথমেই পরিষ্কার ভাবে আপনাকে জানিয়ে দেয়া দরকার, প্রয়োজন হলে গুলি করবে গীয়ান আর পপিনি। কাজেই কোন রকম গোলমালের চেষ্টা করবেন না অনর্থক। বসুন, কয়েকটা কথা আছে আপনার সাথে।'

সোজা চাইল রানা লুইসার চোখে। কিছু বোঝা গেল না সে-চোখ দেখে। ওর পাশে গিয়ে বসবার জন্যে ইঙ্গিত করল সে রানাকে। এগিয়ে গেল রানা। বসে পড়ল লুইসার পাশে। পিছনে

গীয়ান এসে দাঁড়াল রিভলভারটা রানার পিঠে ঠেকিয়ে।

'এসব ব্যাপারে তুমি কেন আবার?' প্রশ্ন করল রানা।

উত্তর দিল সিলভিও। 'আমি ওকে বারণ করেছিলাম। কিন্তু ওর ধারণা আমি যদি ব্যর্থ হই, ও আপনাকে রাজি করাতে পারবে। ওর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। লুইসার সামনে আপনাকে এইভাবে রিভলভারের মুখে ছোট করা হচ্ছে বলে আমি খুবই অনুতপ্ত। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। শুধু লুইসার নয়, আপনাকে আমারও ভাল লেগেছে। আপনার কোন ক্ষতি হোক সেটা আমি চাই না।'

'সে তো খুব ভাল কথা!' মৃদু হেসে পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করল রানা। একটা ঠোঁটে লাগিয়ে কেসটা এগিয়ে ধরল সিলভিওর দিকে। 'চলবে? অভ্যাস আছে?'

'না। ধন্যবাদ।' রানার মুখোমুখি একটা সোফায় বসল সিলভিও।

সিগারেট ধরিয়ে লম্বা করে টান দিল রানা, ভুশ করে ধোঁয়া ছাড়ল ছাতের দিকে, পায়ের উপর পা তুলে আরাম করে বসল সোফায় হেলান দিয়ে, তারপর চাইল সিলভিওর চোখে।

'বেশ বলুন এবার, কি ব্যাপারে কথা বলতে চান?'

'অনিল চ্যাটার্জীর ব্যাপারে।' সোফার দুই হাতায় দুই কনুই রেখে বাম হাতের আঙুলের ফাঁকে ডান হাতের আঙুলগুলো ভরে মুঠি পাকাল সিলভিও, সেই মুঠির উপর আলতো করে থুতনি রেখে শুরু করল আবার, 'চ্যাটার্জী একজন ভারতীয়, আপনি বাংলাদেশের লোক। এক ভয়ঙ্কর ব্যাপারে জড়িয়েছে ও নিজেকে। যেমন গোপনীয়, তেমনি বিরাট ব্যাপার। আপনার দেশের সাথে এর সম্পর্ক নেই। কাজেই এক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার আশা করব আমি আপনার কাছে। আপনি নিরপেক্ষ থাকুন। ওকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। এই দণ্ড এড়িয়ে যাবার

উপায় নেই ওর। কারো সাধ্য নেই ওকে রক্ষা করে। আপনি মাঝখান থেকে নাক গলিয়ে নাকটা খোয়াবেন, সেটা আমি চাই না। আমার অনুরোধ, যেহেতু ব্যাপারটা আপনার দেশের সাথে কোন দিক থেকে কোন ভাবে যুক্ত নয়, আপনি এ থেকে দূরে থাকুন।'

'এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। আমি এক কথায় রাজি।'

সতর্ক দৃষ্টিতে চাইল সিলভিও রানার মুখের দিকে। বার কয়েক চোখ মিট মিট করে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর হাত বাড়াল সামনে। 'তাহলে দিয়ে দিন।'

অবাক হলো রানা। 'কি দিয়ে দেব?'

'একটা নীল প্লাস্টিক মোড়া লাল খাতা। আপনার কাছেই আছে ওটা এখন।'

তিন সেকেণ্ড সিগারেটের মাথার আগুনটা পরীক্ষা করল রানা, তারপর ভুরু জোড়া কপালে তুলল।

'নীল প্লাস্টিক মোড়া লাল খাতা? ওটা আমার কাছে আছে এ ধারণা হলো কি করে আপনার?'

ভুরু কুঁচকে গেল সিলভিওর। তির্যক দৃষ্টিতে চাইল রানার চোখের দিকে। আশ্চর্য ধূর্ত এবং নিষ্ঠুর একটা ভাব খেলে গেল ওর চোখে। এক সেকেণ্ড, তারপর আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

'দয়া করে আমাদের সময় নষ্ট করবেন না, সিনর মাসুদ রানা। এই একটু আগে আপনি স্বীকার করেছেন নিরপেক্ষ থাকবেন আপনি। খাতাটা...'

'এক সেকেণ্ড,' বাধা দিল রানা কথার মধ্যে। 'নিরপেক্ষ থাকতে রাজি হয়েছি ঠিকই, কিন্তু আপনাকে সাহায্য করবার কোন আশ্বাস আমি দিইনি। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। যাই হোক, খাতাটার কথা শোনা যাক। ওটা আপনার?'

'আমার অর্গানাইজেশনের। আমার অফিস থেকে চুরি

করেছিল ওটা অনিল চ্যাটার্জী।'

'কেন চুরি করতে গেল? কি আছে ওর মধ্যে?'

'অত্যন্ত মূল্যবান কিছু গোপনীয় তথ্য আছে। ওটা খোয়া গেলে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটে যাবে আমাদের ভাগ্যে। পথের ধুলায় মিশে যাব আমরা। আমার ওপর হুকুম হয়েছে, যে ভাবে হোক উদ্ধার করতে হবে ওটা। আমার কাছ থেকে খোয়া গিয়েছিল, আমাকেই উদ্ধার করতে হবে।'

'এত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনিলের হাতে যখন পড়েছে, আপনাদের সতর্কতার বিশেষ প্রশংসা করা যায় না।'

'তা ঠিক।' মাথা ঝাঁকাল সিলভিও। 'কিন্তু ভয়ানক ধূর্ত এই লোকটা। বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারিনি আগে। তার ওপর দারুণ লোকটার সহ্য ক্ষমতা। এতদিন পর্যন্ত যে টিকে আছে...ভাল কথা, ওকে যে ক্ষিপ্রতা আর বুদ্ধিমত্তার সাথে উদ্ধার করেছিলেন তার জন্যে আপনাকে কংগ্রাচুলেশন জানানো হয়নি এখনও। কংগ্রাচুলেশনস্। দারুণ যোগ্যতার সাথে করেছিলেন কাজটা।'

লজ্জা পাওয়ার ভান করল রানা। 'না, না। কি যে বলেন। আমার যোগ্যতা নয়, ওটা আপনার লোকেদের অযোগ্যতা। যাদের নিয়ে কাজ করছেন...'

'তা ঠিক,' বাঁকা করে হাসল সিলভিও। 'কিন্তু অন্যদিকে তাদের যোগ্যতার অভাব নেই। এরা জানে কি করে মানুষের মুখ থেকে কথা বের করতে হয়।'

'তাই নাকি? কিন্তু মনে হচ্ছে অনিলকে দিয়ে কথা বলাতে পারেনি ওরা, নইলে এখানে আপনার মূল্যবান সময় অপব্যয় করতে হত না।'

'কথা অনিলকে বলতেই হত। আজ হোক কাল হোক স্বীকার না করে উপায় ছিল না। হয়তো সময় লাগত একটু বেশি। অসুস্থ

ছিল বলে সাবধানে এগোতে হয়েছে গীয়ানকে। সুস্থ অবস্থায় থাকলে আরও চাপ দিতে পারত ও, মুমূর্ষু লোককে বেশি চাপ দেয়া যায় না, ফট করে মরে যায়।'

'তাই জ্বলন্ত সিগারেট ঠেসে ধরে মৃদু নির্যাতনের ব্যবস্থা হয়েছিল?'

'ঠিক বলেছেন। আধমরা লোক বা স্ত্রীলোকের ওপর প্রয়োগ করলে এতে বেশ কাজ পাওয়া যায়।'

'জুলি মাযিনিকেও নিশ্চয়ই মরতে হয়েছে গীয়ানের হাতেই?'

'না। ওডিড। কথা বের করেছে গীয়ান, কিন্তু শেষ কাজটা সেরেছে ওডিড। ডিভিশন অব লেবার। কিন্তু সিনর, আমরা আমাদের বক্তব্য থেকে সরে গেছি অনেক দূরে। দিয়ে দিন প্যাকেটটা।'

মাথার মধ্যে আগুন ধরে গিয়েছিল রানার। এক লাফে খুদে শয়তানটার ঘাড়ে পড়ে কণ্ঠনালীটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করল ওর। দাঁতে দাঁত চেপে সামলে নিল সে। সময় আসুক। এখন কিছু করতে গেলে অবধারিত মৃত্যু। সিগারেটে টান দিতে গিয়ে লক্ষ্য করল কাঁপছে ওর হাতটা।

'উত্তেজিত হবেন না, সিনর মাসুদ রানা। আপনি বাংলাদেশের একজন দুর্ধর্ষ স্পাই হতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই আমার কাছে পৌঁছতে পারবেন না। প্যাকেটটা দিয়ে দিলেই সসম্মানে বিদায় নেব আমরা, কেউ আপনার গায়ে হাত তুলবে না।'

'আগে অনিলের সাথে কথা বলতে হবে আমাকে,' বলল রানা মোলায়েম ভাবে। সিগারেটটা ফেলে দিল অ্যাশট্রেতে। 'আগামীকাল বিকেল নাগাদ একবার আসুন আপনারা। ততক্ষণে অনিলের বক্তব্য শুনে একটা কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব আশা করছি।' হাই তুলল রানা। 'ঘুম পাচ্ছে বড়ো। যদি কিছু মনে না করেন, আমি এখন বিশ্রাম নিতে চাই।' লুইসার দিকে ফিরল

রানা। 'তুমি থাকবে, না এদের সাথে চলে যাবে, লুইসা?'

খপ করে রানার হাত ধরল লুইসা। 'প্লী...জ, রানা! দিয়ে দাও ওটা। তুমি বুঝতে পারছ না কেন...'

'বুঝতে আমি ঠিকই পারছি, সিনোরিনা। কিন্তু নিরপেক্ষতার খাতিরে অনিলের ভার্শান শোনা দরকার আমার। নইলে অবিচার করা হবে।'

উঠে দাঁড়াল রানা। সাথে সাথে কাঁধের উপর দড়াম করে আঘাত পড়ল। সামনের দিকে এক পা হোঁচট খেল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল গীয়ানের ভয়ঙ্কর মুখ। রিভলভারটা ধরা আছে রানার দুই চোখের ঠিক মাঝখানে। ট্রিগারের উপর চেপে বসে আছে তর্জনীটা।

'বসো!' গম্ভীর গলায় আদেশ করল গীয়ান।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল লুইসা। ঝট করে ফিরল সিলভিওর দিকে।

'এটা কি হচ্ছে, সিলভিও? তুমি কথা দিয়েছিলে, ওর গায়ে হাত তোলা হবে না।'

'কি করব বলো? উনি যে এমন অবুঝের মত ব্যবহার করবেন সেটা আমার জানা ছিল না।' রানার চোখের দিকে চাইল সিলভিও। 'বসে পড়ুন, সিনর মাসুদ রানা। বল প্রয়োগের জন্যে আমি খুবই দুঃখিত, কিন্তু আপনি আপনার অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারছেন না এখনও। আপনি আমার বন্দী।'

'তাই নাকি?' বাম হাতে কাঁধটা ডলতে ডলতে বসে পড়ল রানা আবার। 'তাহলে আর নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তুলতে গিয়েছিলেন কেন? আপনি নিজেই ঠেলে দিচ্ছেন আমাকে আপনার প্রতিপক্ষ শিবিরে।'

'আপনি ভুল বুঝছেন আমাকে,' চিকন হাসি খেলে গেল সিলভিওর ঠোঁটে। আমাদের হাতে সময় কম, অপেক্ষা করার

উপায় নেই। আপনি এইমাত্র বললেন, অনিলের সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবেন। আমি দুঃখিত, সেটা সম্ভব নয়। মারা গেছে অনিল চ্যাটার্জী।'

ঠাণ্ডা, স্থির দৃষ্টিতে চাইল রানা সিলভিওর চোখের দিকে। তারপর মুচকে হাসল।

'এত সস্তাদরের ব্লাফে কাজ হবে না, সিনর। বেঁচে আছে অনিল চ্যাটার্জী।'

'হাসপাতালে রওনা হবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে মারা গেছে ও। ভিসকন্টির ফোন পেয়ে আমার লোকজন তৈরি ছিল আপনাদের গনডোলার জন্যে। একটা মোটরবোট ছিল গনডোলার অপেক্ষায়। মোটরবোটের ধাক্কায় ডুবে গেছে গনডোলা, ডুবে মরেছে অনিল। আপনার লোক দু'জন অবশ্য অনেক চেষ্টা করেছিল ওকে বাঁচাবার, কিন্তু লাভ হয়নি কোন, বালির বস্তার মত তলিয়ে গেছে সে পানির নিচে।'

মুচকে হাসল সিলভিও রানার বিস্মিত, হতবাক মুখের দিকে চেয়ে। বলেই চলল, 'আমাদের শক্তি, সামর্থ্য আর ক্ষমতা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই আপনার, সিনর মাসুদ রানা, তাই অবাক হচ্ছেন এত সামান্যতেই। সারা ইউরোপে আমাদের অসাধ্য কিছুই নেই। যা খুশি তাই করতে পারি আমরা। যাক, যা বলছিলাম, অনিলকে নিয়ে আপনার দুই সঙ্গীকে গনডোলায় উঠতে দেখেই বুঝতে পারলাম প্যাকেটটা কোথায় লুকোনো আছে জানতে পেরেছেন অনিলের কাছ থেকে এবং সেটা সংগ্রহ করতেই গিয়েছেন আপনি। নইলে আপনিও যেতেন ওর সঙ্গে হাসপাতালে। ব্যস, বাকিটুকু খুবই সহজ কাজ। খুবই সাবধানে অনুসরণ করা হলো আপনাকে। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না।' নিজের বিজয়ে আপন মনে হাসল সিলভিও। 'ভাল কথা, আপনার সঙ্গীদের কি হলো সে কথা ভেবে হয়তো উদ্বিগ্ন হচ্ছেন আপনি।

উদ্বেগের কিছুই নেই। নিরাপদে তীরে পৌঁছেচে ওরা, আমার লোকজন রীতিমত সাহায্য করেছে ওদের পারে উঠতে। বর্তমানে বহাল তবিয়তে আছে ওরা একটা বাড়িতে মাটির নিচের এক ঘরে। কিন্তু আপনি যদি অসহযোগিতা করেন, খুব বেশিক্ষণ ভাল থাকবে না ওরা। বুঝতে পেরেছেন? তুরুপের সব তাস এখন আমার হাতে, সিনর মাসুদ রানা। দয়া করে প্যাকেটটা বের করে দেবেন কি?'

কয়েক সেকেণ্ড সিলভিওর মুখের দিকে চেয়ে রইল রানা। দ্রুত চিন্তা চলেছে ওর মাথার মধ্যে। চেয়ে রয়েছে, কিন্তু দেখছে না রানা সিলভিওকে।

বোঝা গেল ভারত সরকার অনিলকে যাই মনে করুক, কিছু গোপন তথ্য সংগ্রহ করেছে অনিল একটা শক্তিশালী আন্তর্জাতিক দলের কাছ থেকে, এবং এই তথ্য নিয়ে সে ভারতে পৌঁছতে চাইছে। এদের জন্যে সেটা পুনরুদ্ধার করা এতই জরুরী যে তা করতে গিয়ে দু'পাঁচটা খুন হয়ে গেলেও পরোয়া নেই- অর্থাৎ, এই তথ্য ভারতে পৌঁছলে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে এদের। তাই সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এরা এ ব্যাপারে। এমন হতে পারে যে ভারতের প্রতি আনুগত্যের এটাই একমাত্র প্রমাণ অনিলের হাতে। এটা খোয়া গেলেই সব যাবে ওর। কোন অবস্থায় যেন প্যাকেটটা এদের হাতে না পড়ে তার ব্যবস্থা করা দরকার।

নীল প্লাস্টিকে মোড়া প্যাকেটটা ভেসে উঠল রানার মানসচক্ষে। তামার ফুলদানীতে রয়েছে ওটা। মোটেই নিরাপদ নয়। একটু মাথা খাটালেই বের করে ফেলবে সিলভিও। প্রথমে ওকে সার্চ করা হবে, কিন্তু যখন পাওয়া যাবে না তখন খুব সহজেই বুঝে নেবে সিলভিও যে এ বাড়িতে ঢোকার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কোথাও লুকিয়েছে রানা ওটা। কয়েক সেকেণ্ড

একা ছিল রানা হলরুমে, নিশ্চয়ই ওখানেই কোথাও লুকোনো আছে ওটা।

হাতের তালু দুটো ভিজে এল রানার। অন্ধের মত এই ফাঁদে ধরা পড়ার জন্যে নিজের উপরই খেপে গেল সে। ওড্ডি আর সেই লোকটাকে এত সহজে হাল ছেড়ে দিতে দেখে আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল ওর। যাই হোক, পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে সে, প্যাকেটটা এদের হাত থেকে রক্ষা করবার কোন উপায় নেই। তবু এদের মনোযোগ অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করতে হবে যতটা পারা যায়।

'সিনর মাসুদ রানা,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল সিলভিও, 'দিয়ে দিন প্যাকেটটা।'

'আমার কাছে যদি থাকত তাহলে কিছুতেই আপনাকে দিতাম না ওটা, কিন্তু যেহেতু নেই, দেয়া না-দেয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। কি বলেন?'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল সিলভিও।

'প্রচুর সময় নষ্ট করেছি আমি ভদ্রতা রক্ষা করতে গিয়ে। আর নয়।' হাত বাড়াল। 'দিন প্যাকেট!'

'প্লীজ, রানা! তোমার তো কিছু না, দিয়ে দাও না ওটা, ঝামেলা চুকে যাক।' আবার রানার হাত চেপে ধরল লুইসা।

মৃদু হাসল রানা সিলভিওর চোখের দিকে চেয়ে।

'খামোকা মেজাজ গরম করে লাভ নেই, খোকা। আমার কাছে নেই ওটা।'

পপিনির দিকে চাইল সিলভিও। মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল। 'সার্চ করো একে।'

ঘাড়ের পেছনে রিভলভারটা ঠেসে ধরে গুঁতো দিল গীয়ান জোরে। 'উঠে দাঁড়াও।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা।

প্রত্যেকটা পকেট সার্চ করল পপিনি দ্রুত হাতে, মাথা নাড়ল, নেই। তারপর মৃদু চাপড় দিয়ে পরীক্ষা করল রানার সর্বাঙ্গ। রানার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে স্টিলেটোটা বের করে আনল। তারপর সরে দাঁড়াল।

ঠিক এমনি সময়ে ঘরে ঢুকল ওড্ডি। রানার দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসবার চেষ্টা করল। চোখ দুটো জ্বলছে প্রতিহিংসায়। একটা চোখ ফুলে আছে বাতিস্তার ঘুসি খেয়ে।

'সর্বক্ষণ চোখে চোখে রেখেছিলে একে?' প্রশ্ন করল সিলভিও।

'হ্যাঁ, সিনর। ডি ফ্যাবোরির দেয়াল-মন্দিরটায় গিয়েছিল ও। শিকের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে কি যেন নিল। আমাদের দেখতে পেয়েই দৌড়াতে শুরু করল।'

'চ্যাটার্জী কি কোনদিন এই মন্দিরের কাছাকাছি গিয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল সিলভিও।

উত্তর দিল গীয়ান। 'না, সিনর। কিন্তু ওই মেয়েলোকটা, জুলি মাযিনি, গিয়েছিল।'

'হ্যাঁ!' বলল ওড্ডি। 'কয়েকদিন আগে এই মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি আমি ওকে। আমি মনে করেছিলাম প্রার্থনা করছে বুঝি।'

'দৌড়াতে শুরু করার পর সিনর মাসুদ রানা কি ওটা কোথাও লুকোবার সুযোগ পেয়েছিল?'

'না। আমি আর রিক্‌কি পেছনেই ছিলাম, চোখের আড়াল হতে দিইনি।'

রানার দিকে ফিরল এবার সিলভিও। 'দিন প্যাকেট!'

'দেব না।' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা।

রাগে লাল হয়ে উঠল সিলভিওর ফর্সা চেহারা। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়াল কিছুক্ষণ। ফুলে উঠেছে নাকের পাতা।

বহু কষ্টে সামলে নিয়ে বলল, 'প্রয়োজন পড়লে আমি কতটা কঠোর হতে পারি সে সম্পর্কে আপনার কোন ধারণাই নেই। শোনেন, মাসুদ রানা। নিজের অবস্থাটা আপনি মোটেই উপলব্ধি করতে পারছেন না। প্যাকেটটা পেতেই হবে আমার। কেউ আটকাতে পারবে না আমাকে।' ঘরময় বার দুই পায়চারি করে এসে থামল আবার রানার সামনে। 'আপনার কাছে আপনার সঙ্গীদের জীবনের মূল্য ঠিক কতখানি জানা নেই আমার। ওদের প্রাণের বিনিময়ে প্যাকেটটা ফেরত দিতে রাজি আছেন কিনা ভেবে দেখুন দুই মিনিট। প্যাকেটটা আমার হাতে তুলে দিলে ছেড়ে দেব আমি ওদের। যদি না দেন, এক্ষুণি হুকুম দেব আমি ওদের গুলি করে মেরে ফেলার জন্যে। বিশ্বাস করুন, ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছি না আমি। যা বলছি ঠিক তাই করব আমি দুই মিনিট পর।'

এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে মনে মনে চমকে গেল রানা। ও আশা করেছিল ওর উপর নির্যাতন চালানো হবে, কিন্তু হঠাৎ মোড় ঘুরিয়ে যে বাতিস্তা আর ওস্তাদের উপর আক্রমণ করে বসবে সিলভিও, এটা কল্পনাও করতে পারেনি। যত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই হোক, তার জন্যে দু'জন নির্দোষ লোকের প্রাণ নিতে দেবে না রানা এদের। কিন্তু আগে জানা দরকার ধোঁকা দিচ্ছে কিনা।

'আপনার কথায় বিশ্বাস কি?' প্রশ্ন তুলল রানা। 'আমি কি করে জানব যে ওই দু'জন সত্যিই আপনার হাতে বন্দী হয়েছে? কি করে জানব যে সত্যি মারা গেছে অনিল চ্যাটার্জী? আমার সঙ্গীদের সাথে দেখা করবার আগে তো আমি কোন অবস্থাতেই দিতে পারি না ওটা আপনার হাতে। তাছাড়া দিলেই যে আপনি ওদের ছেড়ে দেবেন, তার কি নিশ্চয়তা?'

এতক্ষণে হাসি ফুটল সিলভিওর মুখে।

'নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করা যাবে। ওদের সাথে আপনার দেখা হওয়ারও ব্যবস্থা করছি। কিন্তু মনে রাখবেন, সিনর মাসুদ রানা,

প্যাকেটটা না দিলে ওদের মরা মুখ দেখতে হবে আপনার। চলুন আমার সাথে। পথে কোন রকম গোলমাল করে লাভ নেই, পালাতে পারবেন না। যদি আমাদের হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে যাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হয়ও, জেনে রাখবেন সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটবে আপনার দুই সঙ্গীর।'

'পালাব না আমি,' বলল রানা। 'কোথায় আছে ওরা?'

'কাছেই।' লুইসার দিকে ফিরল সিলভিও। 'তোমার আসার দরকার নেই, লুইসা। আমার কথা আমি রেখেছি। জীবনে কোনদিন এতখানি ধৈর্য ধরতে দেখোনি নিশ্চয়ই তুমি আমাকে? কিন্তু এর পরেও যদি সিনর মাসুদ রানা কোন রকম গোলমাল করবার চেষ্টা করে তাহলে দাঁত বেরিয়ে পড়বে আমার, আসল রূপ বেরিয়ে আসবে। সেটা তোমার দেখার দরকার নেই। যতটা সহ্য করেছি তার বেশি সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তুমি জানো। কাজেই আমরা বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই হোটেলে ফিরে যাবে তুমি।' রানার দিকে ফিরল, 'চলুন সিনর। আমি সত্যি বলছি, না মিথ্যে বলছি দেখুন এসে নিজ চোখে।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সিলভিও। পিছন পিছন চলল রানা। তার পিছনে রিভলভার হাতে ওড্ডি, গীয়ান আর পপিনি।

হলরূমের মাঝামাঝি এসে থমকে দাঁড়াল সিলভিও। তড়াক করে লাফ দিল রানার বুকের ভিতর কলজেটা। একটা দুটো হার্টবিট মিস হয়ে গেল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল সিলভিও।

'দাঁড়াও এক মিনিট!' ধূর্ত হাসি ফুটে উঠল সিলভিওর ঠোঁটে। 'এত সবের কোন দরকার না-ও পড়তে পারে। মন্দির থেকে এই বাড়ি পর্যন্ত ওড্ডির চোখে চোখে ছিলেন আপনি, প্যাকেটটা কোথাও লুকোবার সুযোগ ছিল না আপনার। কিন্তু এই হলরূমে কয়েক সেকেণ্ড আপনি একা ছিলেন। সেই কয়েক সেকেণ্ডের

মধ্যে ওটা এই ঘরেই কোথাও লুকিয়ে রাখা অসম্ভব নয়। আপনার কাছে যখন নেই, ওটা এ ঘরেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন ধরে নেয়াটা খুব একটা অযৌক্তিক কিছু হবে না। কি বলেন?'

বুকের ভিতর ধড়াশ ধড়াশ শুরু হয়ে গিয়েছে রানার। টের পেল ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে মুখটা রক্ত সরে গিয়ে। কিন্তু অসাধারণ মানসিক শক্তি বলে মুখের চেহারাটা ঠিক রাখল সে।

'খামোকা খোঁজাখুঁজি করে লাভ নেই, সিনর,' বলল রানা, 'সত্যি কথা বলতে কি, ভিড়ের মধ্যে আমার এক বন্ধুর পকেটে পুরে দিয়েছি আমি ওটা। আপনার স্যাঙাৎরা কেউ দেখতে পায়নি। আমার সঙ্গী দু'জনকে মুক্তি না দিলে ওটা পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই আপনার। দেরি না করে চলুন সেখানে যাওয়া যাক।'

ঝট করে ফিরল সিলভিও ওড্ডির দিকে।

'তোমাদের অলক্ষে ওটা পাচার করা সম্ভব ছিল এর পক্ষে?'

একটু ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ওড্ডি। 'ছিল। ভিড়টা খুব ঘন ছিল। চোখের আড়াল করিনি ঠিকই, কিন্তু আমরা শুধু এর কাঁধ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম। হাত দেখতে পাইনি। নিচ দিয়ে কারো হাতে ওটা দিয়ে দেয়া এর পক্ষে অসম্ভব ছিল না।'

'খুবই ধূর্ততার সাথে কাজটা করেছেন, সিনর মাসুদ রানা,' কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল সিলভিও। 'কিন্তু তাতে অবস্থাটা এমন কিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে না। প্যাকেটটা আপনার বন্ধুর কাছ থেকে সংগ্রহ করে আমার হাতে তুলে দেবেন আপনি।'

হাঁফ ছাড়ল রানা। 'তা দেব, কিন্তু তার আগে আপনার কথার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে আমাকে।'

'তা ঠিক, ওদের দেখা পাবেন আপনি অল্পক্ষণের মধ্যেই।' আবার একবার ঘরের চারদিকে চোখ বুলাল সিলভিও। মৃদু হেসে

চাইল রানার চোখে। 'তবে এই ভিড়ের মধ্যে বন্ধুর পকেটে পুরে দেয়ার কাহিনীটা আপনার উর্বর মস্তিষ্কের ফসলও হতে পারে। তাছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে হঠাৎ এ গল্প শোনাবার? আমার মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার প্রয়াস হিসেবেও ধরতে পারি আমি ব্যাপারটা। কাজেই আমার মনে হয় রওনা হবার আগে আমাদের একবার এই ঘরটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।' গীয়ানের দিকে ফিরল। 'এক পা এদিক ওদিক নড়লে গুলি করবে।' এবার ওড্ডি আর পপিনিকে আদেশ করল, 'দেখো খুঁজে পাওয়া যায় কি না। বেশি সময় পায়নি ও। চট করে লুকিয়ে রাখা যায় এমনি কোন জায়গায় পেয়ে যাবে ওটা খুব সম্ভব। সাধারণ কোন জায়গায়। নাও, শুরু করো।'

হাল ছেড়ে দিল রানা। ভাগ্য অপ্রসন্ন। চেষ্টার ক্রুটি করেনি সে।

এক্ষুণি খুঁজে পাবে ওরা ওটা। বাতিস্তা আর ওস্তাদের কি হবে তা হলে? ওর নিজের ভাগ্যেই বা কি আছে? এই তিনজনের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা হবে? নাকি মাল পেয়ে ছেড়ে দেবে ওদের? কি করবে?

আশ্চর্য দক্ষতার সাথে হলঘরের দু'পাশ থেকে খুঁজতে খুঁজতে মাঝখানে আসছে ওড্ডি আর পপিনি। তামার ফুলদানীটার খুব কাছে চলে এসেছে ওড্ডি। প্রতিযোগীর ঘোড়ার মুখে ভুল করে মন্ত্রী চেলে দাবা খেলোয়াড় যেমন বোর্ডের অন্যদিকে চেয়ে আল্লাকে ডাকে, নিছক ইচ্ছাশক্তির বলে প্রতিযোগীর মনোযোগ অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করে, রানার অবস্থা অনেকটা সেই রকম হলো। অন্যদিকে চেয়ে থাকার চেষ্টা করল সে, কিন্তু আড়চোখে ওড্ডির কার্যকলাপ লক্ষ না করেও পারছে না।

হঠাৎ ফুলদানীটা হাতে তুলে নিল ওড্ডি। ধড়াশ করে উঠল রানার বুক। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে দেখল সে, ভিতরে হাত ঢুকাল

ওড্ডি, তারপর মুখটা উল্টো করে ঝাঁকি দিল। কিছুই বেরোল না ওটার মধ্যে থেকে।

তাজ্জব হয়ে গেছে রানা, দুই চোখে ওর অবিশ্বাস।

সত্যিই, কিচ্ছু নেই তামার ফুলদানীর ভিতর।

তিন

পাঁচ মিনিট তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর ওড্ডি ঘোষণা করল, 'এঘরে নেই ওটা।'

কাঁধ ঝাঁকাল সিলভিও।

'থাকাটা অসম্ভব ছিল না। যাই হোক, খুঁজে দেখায় কোন ক্ষতি হয়নি আমাদের। এবার তাহলে আপনার সেই বন্ধুর কাছে দেয়ার কথাটা সত্য বলে ধরে নেয়া যায়, কি বলেন?'

শুকিয়ে আসা ঠোঁট ভিজাল রানা জিভের ডগা দিয়ে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে গ্যাঁড়াকলে ফেঁসে গেছে সে এবার। প্যাকেটটা ফিরিয়ে না দিলে যে বাতিস্তা আর স্টেফানো মন্টিনিকে গুলি করে মারা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গেল কোথায় ওটা। কে নিল? ওড্ডি? শোবার ঘরে ঢোকার বেশ কিছুক্ষণ পরে এসে হাজির হয়েছিল ওড্ডি। হলরুমে ঢুকে প্যাকেটটা খুঁজে বের করে নেয়া সম্ভব ছিল ওর পক্ষে। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চাইছে লোকটা? প্যাকেটটা গাপ করে দিয়ে নিজে কিছু টাকা হাতাবার তাল করেছে? তাই হবে। ও ছাড়া আর কে নিতে পারে প্যাকেটটা?

'চলুন, রওনা হওয়া যাক, সিনর মাসুদ রানা,' বলল সিলভিও। 'আপনার সহকর্মীদের সাথে দেখা করার পর আপনার

সেই বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে আসবেন প্যাকেটটা।'

'দাঁড়ান,' বলল রানা চট করে। বুঝতে পারছে সে ওড্ডি যদি প্যাকেটটা নিয়ে থাকে, আর একবার এই বাড়ির বাইরে কোথাও লুকিয়ে রাখবার সুযোগ পায়, তাহলে ও যে নিয়েছে তা প্রমাণ করবার উপায় থাকবে না আর। এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে প্যাকেটসহ ওকে হাতে-নাতে ধরা। নইলে আশা-ভরসা সব যাবে।

'কি ব্যাপার?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সিলভিও।

'বন্ধুর কাছে দেয়ার গল্পটা বানানো,' বলল রানা। 'আপনি ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন, এই ঘরেই লুকিয়ে রেখেছিলাম আমি প্যাকেটটা।'

কথাটা বলতে বলতে ওড্ডির মুখের ভাব লক্ষ করল রানা। কিন্তু ওর কঠোর মুখে কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের আভাস ছাড়া আর কিছুই লক্ষ করা গেল না।

'আশ্চর্য!' তাজ্জব চোখে চাইল সিলভিও রানার মুখের দিকে। 'হঠাৎ এই অসময়ে কথাটা আমাকে বলে দিচ্ছেন কেন? স্বেচ্ছায় আপনার দর কষাকষির ক্ষমতা হারাচ্ছেন আপনি, সিনর মাসুদ রানা। এখুনি পেয়ে গেলে আপনার সঙ্গীদের ছেড়ে নাও দিতে পারি, এই সন্দেহ আসছে না আপনার মনে?'

'আসছে। কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না। প্যাকেটটা খুইয়ে ফেলেছি আমি। এই ঘরে ঢোকার সাথে সাথে ওই দরজার নিচে আলো দেখে প্যাকেটটা আমি এই তামার ফুলদানীতে রেখে দিয়েছিলাম।'

ভুরু কুঁচকে ফুলদানীটার দিকে চাইল সিলভিও, তারপর চাইল ওড্ডির দিকে। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল ওড্ডি। ফুলদানীটা আবার হাতে তুলে নিয়ে ভিতরটা দেখল, তারপর উপুড় করে ঝাঁকি দিল বার কয়েক।

সবাই বুঝতে পেরেছে, তবু অনর্থক বলল ওড্ডি, 'কিছুই নেই এর ভেতর।'

'সময় নষ্ট করবার কৌশল খাটিয়ে যাচ্ছেন আপনি একটার পর একটা,' অনুযোগের সুরে বলল সিলভিও। 'এতে কি লাভ আশা করছেন আপনি আমার জানা নেই। আমি বিরক্ত হয়ে উঠছি ক্রমে। আপনি কি আশা করছেন যে আপনার বন্ধুরা এসে উদ্ধার করবে আপনাকে? কেন বিশ্বাস করছেন না আমার কথা? আমি তো বলছি ওরা আমার হাতে বন্দী, প্রমাণ দিতে নিয়ে চলেছি আপনাকে, তবু কেন...'

'ওটা আমি এই ফুলদানীর ভেতর রেখেছিলাম,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'আমরা যখন শোবার ঘরে কথা বলছিলাম তখন সরিয়েছে ওটা কেউ। আপনারা ওই ঘরের মধ্যেই ছিলেন, কাজেই আপনাদের পক্ষে ওটা হাতানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু একজন আছে যে সবার পরে ঘরে ঢুকেছিল, এই হলঘরে একা থাকবার সুযোগ পেয়েছিল। সে হচ্ছে এই লোকটা।' ওড্ডির দিকে ইঙ্গিত করল রানা মাথা ঝাঁকিয়ে।

আড়ষ্ট হয়ে গেল ওড্ডি। ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে উঠল ওর মুখটা। ঠোঁট দুটো সরে গেছে দাঁতের উপর থেকে। দুই চোখে গোক্ষুরের বিষ।

শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল লুইসা। বিস্মিত দৃষ্টিতে বোঝার চেষ্টা করল এতক্ষণ এই ঘরে কি করছে লোকগুলো। এগিয়ে এল কয়েক পা।

'দেখুন, সিনর মাসুদ রানা,' কটমট করে চাইল সিলভিও রানার চোখে, 'বড় বিপজ্জনক খেলা খেলছেন আপনি। আমার দলের লোকের মধ্যে সন্দেহ ঢুকিয়ে গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না। এসব অনেক পুরানো কৌশল। পচে গেছে। আপনার সঙ্গীদের কাছে যাচ্ছি আমরা এখন, ওখানে

আপনার মুখ দিয়ে কি করে সত্যি কথাটা বের করতে হবে জানা আছে আমার। চলুন।'

রানার মেরুদণ্ডের উপর রিভলভারের নল দিয়ে খোঁচা দিল গীয়ান।

'হাঁটো।'

নড়ল না রানা। শান্ত কণ্ঠে আবার বলল, 'কেউ নিয়েছে প্যাকেটটা। ওরই নেয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। রওনা হওয়ার আগে ওকে একবার সার্চ করলে আপনিই উপকৃত হবেন। আমি বাজি রাখতে পারি, এক্ষুণি ওকে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন প্যাকেটটা।'

বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এল ওড্ডি দুই পা, ঠাশ করে প্রচণ্ড এক চড় মারল রানার গালে। মার খেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল রানা। রিভলভারটা ওর শিরদাঁড়ার উপর ঠেসে ধরে স্মরণ করিয়ে দিল গীয়ান গোলমাল করলে কি ঘটবে।

'শুয়োরের বাচ্চা!' রাগে হাঁপাচ্ছে ওড্ডি। আবার একটা প্রচণ্ড চড় তুলল।

'থামো, ওড্ডি!' ধমকে উঠল সিলভিও। কঠোর হয়ে উঠেছে ওর মুখটা। দুই চোখে সন্দেহ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরে গেল ওড্ডি। 'আপনার অনুযোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন, সিনর? আপনার এ নালিশ মিথ্যে প্রমাণ হলে বড়ই দুঃখজনক ঘটনা ঘটবে আপনার কপালে। তখন আর ওকে বারণ করতে পারব না আমি, বারণ করবও না।'

'অত বকর বকর না করে সার্চ করে দেখো ওকে,' বলল রানা। 'গাধামি কোরো না। ওকে বিশ্বাস করতে যাবে কেন তুমি? ও যদি মনে করে প্যাকেটটা গায়েব করে দিয়ে কিছু ফালতু টাকা রোজগার করা যাবে, আমি তো বুঝি না তাহলে কেন ওটা তোমার হাতে তুলে দেবে ও।'

সতর্ক দৃষ্টিতে চাইল সিলভিও ওড্ডির দিকে। ওড্ডির তীব্র দৃষ্টিতে আক্রোশ- দাঁতে দাঁত চেপে কটমট করে চেয়ে রয়েছে রানার চোখের দিকে।

'প্যাকেটটা কি তোমার কাছে, ওড্ডি?' মোলায়েম কণ্ঠে প্রশ্ন করল সিলভিও।

'না। মিথ্যে কথা বলছে শুয়োরের বাচ্চা! দেখুন না, নিজের চোখেই দেখুন।'

ক্ষোভে দুঃখে একটার পর একটা পকেট উল্টে দেখাতে শুরু করল ওড্ডি। রাগে বিকৃত হয়ে গেছে ওর চেহারা। পকেট থেকে টুকিটাকি জিনিস বের করে ফেলতে শুরু করল মেঝের উপর।

সব পকেট দেখা হয়ে গেলে রানার দিকে ফিরল সিলভিও।

'এবার আর কিছু বলার আছে?'

'বেল্টের নিচে, প্যান্টের ভাঁজে, কিংবা শরীরের আর কোথাও লুকানো থাকতে পারে।' কথাটা বলল বটে, কিন্তু গলায় তেমন জোর পেল না রানা।

'খুঁজে দেখো।' পপিনিকে আদেশ করল সিলভিও।

যথেষ্ট ভদ্রতা ও সংকোচের সাথে, যেন বাঘের গায়ে হাত দিচ্ছে এমনি ভঙ্গিতে ওড্ডির সারা শরীর সার্চ করল পপিনি, তারপর সরে দাঁড়াল।

'কিছুই নেই।'

'এবার? আর কিছু?' ক্রোধ দেখতে পেল রানা সিলভিওর চোখে।

'আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে রেখে থাকতে পারে,' বলল রানা কণ্ঠস্বরটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে।

'আপনার তাই মনে হচ্ছে, তাই না?' হাসির চেষ্টা করল সিলভিও, কিন্তু সেটা মুখ ভেংচানোর মত দেখাল। 'আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? আমার মনে হচ্ছে তুমি একটা তৃতীয় শ্রেণীর

গর্দভ। মিথ্যেবাদী কোথাকার?' রাগে হাত দুটো কাঁপতে শুরু করেছে সিলভিওর। 'আমার ভদ্রতাকে তুমি মনে করেছ দুর্বলতা। লুইসার অনুরোধে আমি চেয়েছিলাম ব্যাপারটা অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ছাড়াই নিষ্পত্তি হোক। কিন্তু বীচিতে গুঁতো না দিলে বলদ সোজা হয় না। আমার আর কিছুই করবার নেই।' ওড্ডির দিকে ফিরল সিলভিও। 'ওড্ডি, যা ভাল বুঝবে তাই করবে তুমি, আমার আর কিছুই বলার নেই। হোটেলে চললাম আমরা। যেমনভাবে পারো, দুই ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে দেবে ওটা আমার কামরায়।'

'ঠিক আছে,' বলল ওড্ডি দাঁতে দাঁত চেপে। 'দু'ঘণ্টার মধ্যেই পাবেন ওটা।'

খপ করে লুইসার হাত ধরল সিলভিও, টান দিয়ে নিয়ে গেল দরজার কাছে। দরজাটা খুলে পিছন ফিরে চাইল রানার দিকে। রাগটা সামলে নিয়েছে অনেকটা।

'আমার সাথে গোলমাল ভারত সরকারের- তুমি বিদেশী গুপ্তচর, মাঝখান দিয়ে এর মধ্যে নোংরা নাকটা না গলালেই পারতে। এখন তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে তোমার সঙ্গীদের কাছে। ওখানে প্যাকেটটা ফেরত দিতে বাধ্য করা হবে তোমাকে। তারপর...' কথাটা শেষ না করেই মাথা ঝাঁকাল সিলভিও। 'চলি। খুব সম্ভব আর কোনদিন দেখা হচ্ছে না আমাদের।'

'দেখা না হওয়াটাই তোমার জন্যে মঙ্গল হবে,' বলল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল সিলভিও।

'অমন বড়াই আগেও বহুবার শুনেছি আমি। কান পচে গেছে শুনতে শুনতে। গুডবাই।'

চলে গেল সিলভিও লুইসাকে টেনে নিয়ে। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ঘেটো নুয়োভোর পিছনে একটা অন্ধকার বাড়ির সামনে এসে থামল গনডোলা। একটিও বাতি নেই। নিঝুমপুরী। দেখলেই বোঝা যায় বহু পুরানো আমলের বাড়ি। মনে হয় এখুনি হুড়মুড় করে ধসে পড়বে ঘাড়ের উপর।

গনডোলা বেঁধে ফেলল পপিনি ঝটপট। শিরদাঁড়ার উপর রিভলভারের খোঁচা দিল গীয়ান।

'নামো!'

ওড্ডি নেমে পড়েছে আগেই। পারে উঠে এল রানা পপিনির পিছন পিছন। চট করে ডাইনে বাঁয়ে চাইল সে একবার। খালটা ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ওর তীক্ষ্ণ কান কাছাকাছিই কোথাও ছপাৎ করে দাঁড় ফেলার শ পেয়েছে। একটা গনডোলা আসছে এইদিকেই।

শব্দটা ওড্ডির কানেও গেছে। কোন গোলমাল করবার আগেই খপ করে রানার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল সে বাড়ির ভিতর। ভ্যাপসা একটা দুর্গন্ধ এল রানার নাকে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল গীয়ান বা পপিনি। পাঁজরের উপর রিভলভারটার উপস্থিতি অনুভব করল রানা আবার।

দেয়াল হাতড়ে একটা তাক থেকে মোমবাতি নিয়ে জ্বালল ওড্ডি। সরু একটা প্যাসেজ ধরে এগোল ওরা। কিছুদূর গিয়ে দরজা। দরজাটা খুলতেই সিঁড়ি দেখা গেল। নোংরা সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করেছে ওড্ডি।

পিছন থেকে ঠেলা খেয়ে নামতে বাধ্য হলো রানাও। বড়সড় একটা স্যাঁৎসেঁতে ঘর। তিনটে মোমবাতির আলোয় ম্লানভাবে আলোকিত।

দেয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে মেঝের উপর বসে আছে বাতিস্তা

আর ওস্তাদ স্টেফানো মন্টিনি। হাত-পা শক্ত করে বাঁধা।

ওদের দিকে চেয়েই মনটা দমে গেল রানার। ও আশা করেছিল এদের ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলেছে সিলভিও, কিন্তু নিজের চোখে দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারল কি বিচ্ছিরি প্যাঁচে পড়ে গেছে সে। প্যাকেটটা ফেরত না দিলে ওর সামনেই হত্যা করা হবে এদের। অথচ...

'এই যে, সিনর! কি নাম যেন তোমার, তোমাকেও ধরে এনেছে? ছি ছি ছি ছি, জখম কোথায়? বিনা জখমেই আস্ত লোকটাকে ধরে ফেলল! কোন্ ইয়ারে পাস করেছ?'

'অনিলের খবর কি, ওস্তাদ?'

রানা দেখল, লাল হয়ে আছে ওস্তাদের টাক, মাথার একপাশে গভীর ক্ষতচিহ্ন। গালে একটা লম্বা চেরা দাগ, টপ টপ রক্ত ঝরছে সেখান থেকে জ্যাকেটের উপর! বাম বাহুর কনুইয়ের কাছে চিরে ফাঁক হয়ে আছে ইঞ্চি তিনেক জায়গা, মেঝেতে জমে আছে রক্ত, আরও জমছে।

বাতিস্তার অবস্থাও তেমন সুবিধের নয়। একটা চোখ বুজে গেছে মার খেয়ে, কালো হয়ে আছে জায়গাটা। কপালে কাটা চিহ্ন- খুব সম্ভব এই আঘাতেই জ্ঞান হারিয়েছিল ও। কাপড়টা ছিঁড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়, গা দেখা যাচ্ছে, সেখানে আঁচড়ের দাগ।

'ছেলেটাকে বাঁচানো গেল না হে,' বলল ওস্তাদ। 'নৌকোটা উল্টে দিল ব্যাটারা, ডুবে গেল। চেষ্টা করলাম, কিন্তু তুলতে পারলাম না।'

'চোপ রাও!' দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে গেল ওড্ডি। দড়াম করে ওস্তাদের পাঁজরের উপর কষাল প্রচণ্ড এক লাথি। ব্যথায় কুঁকড়ে শুয়ে পড়ল ওস্তাদ একপাশে।

'খুব জোরে মারে তো ছেলেটা!' মুখ বিকৃত করে হাঁপাতে

হাঁপাতে বলল ওস্তাদ, ‘কোন্ ইয়ারে পাস করেছ?’ আবার লাথি তুলেছিল ওডিড, থেমে গেল রানার অস্বাভাবিক চিৎকার শুনে।

‘খবরদার, ওডিড! বুড়ো মানুষটাকে মেরো না ওভাবে!’

রানার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যে থমকে গেল ওডিড। কিন্তু ওর অসহায় অবস্থা দেখে ফিরে এল সাহস।

‘মারলে কি করবে তুমি, শুনি?’

‘তোমাকে মেরে মরব। গুলি করেও ঠেকাতে পারবে না আমাকে।’

একটা চেয়ার এনে ঘরের মাঝখানে রাখল পপিনি, হুকুম করল, ‘বসো এখানে।’

রিভলভারের গুঁতো খেয়ে বসে পড়ল রানা। ওডিডর ইঙ্গিতে রানার দুই হাত চেয়ারের পিছনে নিয়ে বেকায়দা ভঙ্গিতে চেপে ধরল পপিনি। দড়াম করে লাথি মারল ওডিড ওস্তাদের ভুঁড়ির উপর। তারপর রানার দিকে ফিরে হাসল।

অসহায়ভাবে গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেয় স্টেফানো মন্টিনি। গ্যাঁজলা বেরিয়ে এসেছে মুখ দিয়ে।

পাগলের মত টানা-হেঁচড়া করল রানা, কিন্তু সাঁড়াশীর মত চেপে ধরে আছে পপিনি, ছাড়ানো গেল না ওর হাত। দাউ দাউ করে জ্বলল রানার চোখ। পরোয়া করল না ওডিড, এগিয়ে এসে দাঁড়াল রানার সামনে। চাপা উল্লাস ওর চোখেমুখে প্রতিহিংসার সুযোগ পেয়ে।

‘আমাকে ফাঁসাবার চেষ্টা হচ্ছিল, না?’ মোলায়েম কণ্ঠে বলল ওডিড। ‘আমিই চুরি করেছি প্যাকেটটা, তাই না? ওটা কোথায় আছে দেখাচ্ছি তোমাকে।’ হিপ পকেট থেকে একটা ময়লা গ্লাভ বের করে ডান হাতে পরল ওডিড। আঙুলগুলো বার কয়েক খুলল এবং বন্ধ করল। তারপর মুঠি পাকাল।

নিরাসক্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা। যেন বুঝতে পারেনি কি

ঘটতে চলেছে। কিন্তু ভিতর ভিতর তৈরি হয়ে গেছে সে। শরীর নড়াতে পারছে না ঠিকই, কিন্তু মাথাটা নড়াতে পারবে। ঘুসিটা কাটাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে ও।

‘তোমাকে খানিক মেরামত করা হবে এখন,’ শান্ত কণ্ঠে বলল ওডিড। ‘এই রকম...’

সাঁই করে ঘুসি চালাল ওডিড। বিদ্যুৎ বেগে সরে গেল রানা বাম পাশে, ইঞ্চি দেড়েক। কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘুসিটা। ভারসাম্য হারিয়ে সামনে ঝুঁকে এল ওডিড। এক পায়ের হাঁটু দিয়ে ওর তলপেটে গুঁতো মারল রানা, অপর পায়ে লাথি মারল ওর পায়ের গোড়ালিতে। ছিটকে বাতিস্তার পায়ের কাছে পড়ল ওডিড। প্রাণপণে জোড়া পায়ে লাথি চালাল বাতিস্তা। জায়গামত পড়লে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘুমিয়ে যেত ওডিড, কিন্তু শরীর বাঁকিয়ে মুখটা সরিয়ে নিল সে, লাথিটা পড়ল ওর বুকের উপর, মেঝের উপর গড়িয়ে চলে গেল সে চার-পাঁচ হাত। ওডিডর সুবিধের জন্যে একটু দূরে সরে গিয়েছিল গীয়ান, এক লাফে চলে এল কাছে, রিভলভারের ব্যারেল দিয়ে মারল রানার চোয়ালের উপর। মুখটা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল রানা, তাতে আঘাতের পরিমাণ কমল কিছুটা, কিন্তু তবু যতটা লাগল তাতেই বোঁ করে ঘুরে উঠল ওর মাথা। আবছা ভাবে অনুভব করল উঠে দাঁড়াচ্ছে ওডিড। অনর্গল গালি বেরোচ্ছে ওর মুখ থেকে।

বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ওডিড রানার উপর। চুল ধরে মুখটা উঁচু করল, নাক-মুখ ভর্তা করে দেয়ার জন্যে প্রকাণ্ড এক ঘুসি তুলল। কিন্তু খপ্ করে ধরে ফেলল গীয়ান ওর হাতটা।

‘এখন না, পরে।’ বলল গীয়ান। ‘ওর বন্ধুর সাথে দেখা করতে হবে ওকে। এখনই জখম করা ঠিক হবে না, দোস্ত।’

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিল ওডিড। পিছিয়ে গেল এক পা। জ্বলছে চোখ দুটো, মুখটা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। সামলে

নেয়ার চেষ্টা করল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর মনে হলো গীয়ানের বক্তব্যের অর্থ বুঝতে পারল সে, ঝট করে পিছন ফিরল নিজেকে নিবৃত্ত করবার জন্যে।

'প্যাকেটটা ফেরত দিচ্ছ?' কানের কাছে মোলায়েম কণ্ঠে বলল গীয়ান।

মাথাটা ঘুরছে এখানো, কিন্তু তারই মধ্যে পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, ও যে জানে না প্যাকেটটা কোথায় একথা বিশ্বাস করবে না এরা। শোল্ডার হোলস্টার থেকে একটা রিভলভার বের করে ফেলেছে ওড্ডি। বাতিস্তার দিকে তাক করে ধরল সেটা। ওর চোখের দিকে চেয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, ওর একটি মুখের কথার উপর নির্ভর করছে বাতিস্তার বাঁচা আর মরা। 'না' বলার সাথে সাথেই গুলি করবে ওড্ডি।

যে করে হোক সময় নিতে হবে এখন। আর কোন উপায় নেই।

'ঠিক আছে,' বলল রানা, 'এনে দেব ওটা আমি।'

কাছে এসে দাঁড়াল ওড্ডি। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'এই তো, লক্ষ্মী ছেলে। কোথায় আছে ওটা?'

'সারাগাত হোটেলে উঠেছে আমার বন্ধু। ওখানেই আছে।'

'কি নাম ওর?'

'গামাল মুস্তাফা,' বলল রানা অম্লান বদনে।

পপিনির দিকে ফিরল ওড্ডি।

'সারাগাত হোটেলে ফোন করে জেনে এসো এই নামে কোন লোক আছে কিনা।'

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল পপিনি। পায়চারি শুরু করল ওড্ডি। স্থির, নিষ্কম্প হাতে রিভলভার তাক করে ধরে দাঁড়িয়ে রইল গীয়ান পাথরের মূর্তির মত। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল পপিনি।

'আছে। আজই সন্ধ্যায় উঠেছে ওই হোটেলে। ঘুমাচ্ছে নিজের ঘরে, তেমন জরুরী কিছু না হলে নাকি তাকে ডাকা যাবে না।'

রানার দিকে ফিরল ওড্ডি।

'প্যাকেটটা নিয়ে আসবে তুমি ওর কাছ থেকে। গীয়ান আর পপিনি যাবে তোমার সাথে। কোন রকম গোলমাল করলেই মারা যাবে এই দু'জন। আমি নিজ হাতে গুলি করব। বুঝতে পেরেছ?'

'কঠিন কিছুই নেই এর মধ্যে। বুঝেছি।'

'নিয়ে যাও একে,' বলল ওড্ডি গীয়ানকে। 'হোটেলের বাইরে অপেক্ষা করবে তোমরা। দশ মিনিটের মধ্যে ও যদি হোটেল থেকে না বেরোয় পপিনিকে পাঠিয়ে দেবে আমার কাছে। এদের খতম করে দিয়ে পরবর্তী প্ল্যানের কথা চিন্তা করা যাবে।'

'চলো। উঠে পড়ো, চাঁদ।' রিভলভার দিয়ে উঠে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করল গীয়ান।

উঠে দাঁড়াল রানা। টলে উঠল মাথাটা ঘুরে ওঠায়। সামলে নিয়ে ফিরল বাতিস্তা আর ওস্তাদের দিকে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে ওরা। অনিশ্চিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে রানার মুখের দিকে। হঠাৎ হাসল ওস্তাদ। কাঁধ দিয়ে থুতনি চুলকে নিয়ে বলল, 'আমাদের জন্যে ভেবো না, ক্যাপ্টেন। তোমার কাজ তুমি করে যাও।'

'আমি ফিরে আসছি,' বলল রানা, কিন্তু গলায় তেমন জোর পেল না।

দ্রুত চিন্তা করছে রানা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে। এখন একমাত্র ভরসা কোন সুযোগে এই দু'জনকে চমকে দিয়ে কাবু করে ফেলে ফিরে এসে ওড্ডিকে কাবু করা। কিন্তু কিভাবে? হোটেলে রেখে আসা পিস্তলটার কথা মনে এল রানার। কিন্তু যে জিনিস এই ট্যুরিস্ট ঠাসা শহরে ব্যবহার করতে পারবে না সে,

সেটা থাকা না থাকা সমান কথা। সবচেয়ে বড় কথা, রানার ক্ষমতা সম্পর্কে মোটামুটি পরিষ্কার ধারণা হয়ে গেছে গীয়ানের, ওকে অবাক করে দেয়া, কিংবা অতর্কিতে কিছু করে পরাজিত করা এখন আর অত সহজ হবে না। সর্বক্ষণ সতর্ক রয়েছে সে। একবিন্দু আলগা করছে না শিরদাঁড়ার উপর রিভলভারের চাপ। ওটা যতক্ষণ ওই জায়গায় ঠেসে ধরা আছে ততক্ষণ আচমকা কিছু করে বসা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

দরজার কাছে এসে পিছন থেকে রানার কলার চেপে ধরল গীয়ান, টেনে থামাল।

'দাঁড়াও! পপিনি, দরজা ফাঁক করে আগে বাইরেটা দেখে নাও একবার।'

এগিয়ে গেল পপিনি, আস্তে করে খুলল দরজা, বাইরেটা দেখে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। কেউ নেই।'

ইতিমধ্যে একবার খেলে গেছে রানার মাথায় ঝট করে একপাশে সরে গিয়ে রিভলভারটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে কিনা, কিন্তু কাজটা মারাত্মক বিপজ্জনক হবে মনে করে আপাতত মুলতবী রেখেছে। কিন্তু স্থির করেছে রানা, গনডোলায় ওঠার সময় সুযোগ আসবে একটা। কোনভাবে নৌকোটা দুলে ওঠার সাথে সাথে যদি...

তারাজ্বলা মুক্ত আকাশের নিচে চলে এসেছে ওরা, আর কয় পা গেলেই খালের পাড়, এমনি সময় চমকে উঠল রানা একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে।

'নড়েচ কি মরেচ! যে যেমন আচো ডেঁড়িয়ে থাকো! এটা আসল পেস্তল বাওয়া, খেলনা নয়।'

পাঁই করে ঘুরল গীয়ান। সাথে সাথে ঠকাশ করে শব্দ হলো। চাপা একটা প্রায়-অস্ফুট আর্তনাদ বেরোল গীয়ানের মুখ থেকে। ছিটকে মাটিতে পড়ল রিভলভার। বাম হাত দিয়ে ডান হাতটা

চেপে ধরেছে সে।

দড়াম করে ওর সোলারপ্লেকসাসে ঘুসি মারল রানা, কুঁজো হয়ে মাটিতে বসে পড়ল গীয়ান, তারপর এক লাথিতেই শুয়ে পড়ল সটান।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে পপিনি। আর কিছু না বুঝুক, 'পেস্তল' কথাটার মানে সে ঠিকই বুঝেছে। দেয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল গিলটি মিয়া।

'এ শালার কপালে একটা আলু তুলে দোব, স্যার?'

'না! দাঁড়াও!' মাটি থেকে গীয়ানের রিভলভারটা তুলে নিতে নিতে বলল রানা।

রানা জানে পপিনির কাছে রিভলভার আছে। এতক্ষণে বেরিয়ে পড়ত সেটা যদি না গিলটি মিয়ার খেলনা পিস্তলটাকে সে আসল পিস্তল বলে ভুল করত। টের পাওয়ার আগেই কাবু করতে হবে ওকে। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করল রানা পপিনিকে। ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরল পপিনি। ঠকাশ করে রিভলভারের বাঁট পড়ল ওর মাথার পিছনে। বিনা দ্বিধায় জ্ঞান হারাল সে। ধড়াশ করে মাটিতে পড়বার আগেই ওকে ধরে আস্তে করে শুইয়ে দিল রানা গীয়ানের পাশে। পকেট থেকে বের করে নিল রিভলভার।

চার

'ওফ, বড় জব্বর মার মেরেচেন, স্যার; আমার মাতা হলে ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে যেত। এদের মাতাও খুব শক্ত, স্যার। একাবারে ঝুনো নারকেল!'

খেলনা পিস্তল হাতে এগিয়ে এল গিলটি মিয়া। আসল পিস্তল ছোঁবে না বলে বি. সি. আই. গান-স্পেশালিস্টকে অনেক তেল মেরে ওর জন্যে এই পিস্তল তৈরি করিয়ে দিয়েছে রানা। ভায়োলেন্স মোটেই পছন্দ করে না গিলটি মিয়া, তাছাড়া আসল পিস্তলের কড়া আওয়াজটা একেবারেই সহ্য হয় না ওর, তাই নিঃশব্দ এয়ারগানের ব্যবস্থা। গুলি আছে ঠিকই, ছয়টা গুলি ভরা যায় এতে, তবে সেগুলো সত্যিকার অর্থেই গুলি, অর্থাৎ কাঁচের মার্বেল। এটা পেয়ে খুশি মনে এতই প্র্যাকটিস করেছে যে এখন তিরিশ ফুট দূর থেকে মাকড়াসার ডিম ফাটিয়ে দিতে পারে গিলটি মিয়া এক গুলিতে। পোয়াটেক ওজনের ঢিলের সমান এই গুলির আঘাত। নেহায়েত খারাপ নয়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় এর চেহারাটা। বহু দুর্ধর্ষ লোকের পিলে চমকে দিয়েছে গিলটি মিয়া এই পিস্তল দেখিয়ে।

'তুমি হঠাৎ কোত্থেকে হাজির হলে, গিলটি মিয়া?' খুশিতে কেঁপে গেল রানার কণ্ঠস্বর। আচমকা এই ভাবে উদ্ধার পেয়ে যাবে কল্পনাও করতে পারেনি সে।

'সে অনেক হিস্টিরি, স্যার। প্রথম গেলাম আলফ্রেডো হোটেলে...'

'আচ্ছা, ঠিক আছে গিলটি মিয়া, পরে সব শুনব। দু'জনকে বন্দী করে রেখেছে ওরা এই বাড়িতে, ওদের বের করে আনি আগে!' গিলটি মিয়াকে সাথে আসতে দেখে বলল, 'তুমি এখানেই থাকো। এরা কেউ সামান্য একটু নড়ে উঠলেই...'

'ঠকাশ।' একগাল হাসল গিলটি মিয়া। 'বুজতে পেরেচি।'

দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে ফিরে এল রানা সিঁড়ির কাছে। কান পেতে শুনল, হেঁটে বেড়াচ্ছে ওডিড।

সাবধানে নামতে শুরু করল সে। একটু আওয়াজ হলেই সতর্ক হয়ে যাবে ওডিড। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে শব্দ না করে নামা

বড় শক্ত। যতটা সম্ভব দেয়ালের গা ঘেঁষে নামছে রানা, প্রতিটা পদক্ষেপ ফেলার আগে চাপ দিয়ে দেখে নিচ্ছে।

মাঝামাঝি নামতেই দেখতে পেল রানা ঘরের ভিতরটা।

ঘরের এমাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত পায়চারি করছে ওডিড। প্যান্টের দুই পকেটে দু'হাত পোরা। বাঘের নজরে দেখছে বাতিস্তা আর ওস্তাদের দিকে।

মৃদু হাসল রানা। আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে ওডিডের ওকে দেখে। আরও দু'পা নামল সে নিচে, তারপর রিভলভারটা ধরল তাক করে।

'গোলমাল করলে মারা পড়বে, ওডিড!' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা।

গুলি খাওয়া বাঘের মত লাফ দিল ওডিড। পকেট থেকে হাত বের করে আনছিল, কিন্তু রানার হাতে নাকবোঁচা রিভলভারটা দেখেই জমে গেল বরফের মত। ভীতি দেখা দিল ওর চোখে। দু'ফাঁক হয়ে গেল ঠোঁট।

'তোমাদের খেলা শেষ, এবার আমার পালা,' বলল রানা নিচে নামতে নামতে।

শুয়ে ছিল, তড়াক করে উঠে বসল পাগলা ওস্তাদ। বিস্মিত দৃষ্টিতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল রানাকে।

'আরে! তুমি দেখছি দারুণ ক্যাপ্টেন হে! হারা গেম জিতে বসে আছো! কোন্ ইয়ারে পাস করেছ?'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বাতিস্তা। অবাক চোখে চেয়ে রয়েছে রানার দিকে।

ওডিডকে একটু নড়ে উঠতে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

'খবরদার, ওডিড! মানুষ খুন করার অভ্যাস আছে আমার। এতটুকু ইতস্তত করব না গুলি করতে।'

স্থির হয়ে গেল ওডিড। একবিন্দু কাঁপল না রানার হাত, এক

মুহূর্তের জন্যে সরল না ওর চোখ ওড্ডির উপর থেকে। সোজা এসে দাঁড়াল পাঁচ হাত দূরে।

'ঘুরে দাঁড়াও,' বলল রানা।

'উচিত শিক্ষা দেব আমি তোকে, শুয়োরের বাচ্চা!'

'ঘুরে দাঁড়াও!'

ধীরে ধীরে ঘুরল ওড্ডি। রিভলভারটা উল্টো করে ধরে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এল রানা। ঠাশ্ করে আওয়াজ হলো রিভলভারের বাঁটের সাথে ওড্ডির খুলির ঠোকাঠুকিতে। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ বেরোল ওড্ডির নাক দিয়ে, হুড়মুড় করে পড়ল চেয়ারের উপর, ওখান থেকে সটান মেঝেতে। জ্ঞান আছে কি নেই পরীক্ষা করে দেখবার প্রয়োজন বোধ করল না রানা, মাথার পিছনে রিভলভারের বাঁট পড়তেই হাতে যে ঝাঁকুনি অনুভব করা গেল, তাতেই বুঝে নিয়েছে সে, অন্তত দুই ঘণ্টার জন্যে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় এর ব্যাপারে।

'গুড!' খুশি হয়ে উঠল ওস্তাদ। 'ওই ছেলে দুটোকে কাবু করলে কি করে?'

ওড্ডির ছুরিটা বের করে নিয়ে ঘ্যাচ ঘ্যাচ কেটে দিল রানা ওস্তাদ আর বাতিস্তার বাঁধন।

'আমি কাবু করিনি,' বলল রানা। বেরিয়েই দেখি আমার এক বন্ধু এসে হাজির। ওরই সাহায্যে কাবু করা গেছে ওদের।'

'এই জায়গাটা চিনল কি করে আপনার বন্ধু?' জিজ্ঞেস করল বাতিস্তা হাত ডলতে ডলতে।

'জানি না। শুনব এখন সব। কেমন বোধ করছ? খুব বেশি জখম হওনি তো?'

'আরে না,' উত্তর দিল ওস্তাদ, 'বাতিস্তাকে চেনো না তুমি। বললে এক্ষুণি এইট-হাণ্ডরেড মিটার স্প্রিন্ট দিয়ে আসবে একটা। স্পোর্টসম্যানকে কাবু করা কি এতই সহজ? তবে তুমি ঠিক সময়

মত এসে পৌঁছেচ। এই ছেলেটা ভাল না। স্পোর্টসম্যান স্পিরিট নেই। এর সাথে মিশো না তোমরা কোনদিন।'

'চলুন, ওস্তাদ, ওই দুটোকে নিয়ে আসি এখানে।' বলেই রওনা হলো রানা সিঁড়ির দিকে। 'তিনটেকে এখানে বেঁধে রেখে বেশ কয়েকটা কাজ সারতে হবে আমাদের। দু'ঘণ্টা পর টনক নড়বে সিলভিও পিয়েত্রোর। হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করবে আমাদের। তার আগেই আমাদের কাজ গুছিয়ে নিয়ে কেটে পড়তে হবে।'

গিলটি মিয়ার পাখির মত শরীর আর হনুমানের সমান উচ্চতা দেখে হেসে ফেলল বাতিস্তা। রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'ইনিই আপনার উদ্ধারকারী বন্ধু?'

'হেসো না, বাতিস্তা!' হঠাৎ রেগে গিয়ে ধমকে উঠল ওস্তাদ। 'মানুষের জন্মগত ত্রুটি নিয়ে হাসতে হয় না। ওর তো কোন হাত নেই। নিশ্চয়ই ঈশ্বর ওকে অন্য কোন ভাবে ক্ষতি পূরণ করে দিয়েছে। সেখানে তুমি বা আমি ওর কাছে নস্যি।'

গনডোলায় লম্বা রশি পাওয়া গেল। গীয়ান আর পপিনির জ্ঞানহীন দেহ ধরাধরি করে নিয়ে এল ওরা বাড়ির ভিতর। তিনজনকে একসাথে বাঁধছে বাতিস্তা, ওস্তাদ পরীক্ষা করে দেখছে বাঁধন কোথাও আলগা রয়ে যাচ্ছে কিনা।

চেয়ারে বসে গিলটি মিয়ার দিকে ফিরল রানা।

'হিস্টিরি রেখে খুব সংক্ষেপে রিপোর্ট দাও দেখি?' রানা বলল, 'হাতে সময় নেই।'

নিরতিশয় হতাশ হলো গাল-গল্পপ্রিয় গিলটি মিয়া। ঘণ্টা দুয়েকের মেটেরিয়াল রয়েছে ওর পেটে, দুই মিনিটে যদি সব বলে ফেলতে হয় তাহলে দারুণ লস্। ব্যাজার মুখে ঘাড়ের পিছনটা চুলকাল।

'সেই হোটেলে গিয়ে একটা চিটি পেলুম। নকল অনিল

চ্যাটার্জীর লেকা। ভয়ানক বিপদ দেকে সে চলে গেচে জেনেভা, একটা হোটেলের নাম দিয়েচে, আপনাকে বলেচে যেন সেখেনে দেকা করেন। ছবিটা দেকালুম কাউণ্টারে, চিনতেই পারল না ব্যাটা।'

'হুম!' বলল রানা। 'সারা ইউরোপে ঘোড়দৌড় করাতে চেয়েছিল ওরা আমাকে। যাই হোক, খবরটা জেনেই ফিরে এলে তুমি। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এলে কি করে?'

'প্যাসেঞ্জারি পেলেনে উটিনি তো। যেটাতে গিয়েচি, ওটারই ডাইবারকে বললুম, আবার ফেরত লিয়ে চলো। ফিরে এসে মালপত্তর রাকতে গিয়েছিলাম বাসায়, ও বাবা, পাঁচ মিলিটও যায়নি, ঢুকল চার-পাঁচজন পেস্তলধারী। তাদের পিচু পিচু এল দুপুরের সেই মেয়েটা, আর তারই মত দেকতে এক ভদ্দরলোক।'

'তুমি কি করলে?'

'আমি তো আগেই নুকিয়ে পড়েচি একটা ওয়ারড্রোবের ভেতর। ওফ্, কি বলব, স্যার, দশ মিলিট পরে দেকি নিভ্ভয়ে সুড়সুড় করে হেঁটে বেড়াচ্চে আমার সারা গায়ে আট-দশটা তেলচোট্টা (আরশোলা)!' শিউরে উঠল গিলটি মিয়া ওগুলোর কথা একবার ভাবতেই। 'ভয়ে, ঘেন্নায় আরাকটু হলেই চিল্লিয়ে উটতাম, এমন সোমায় ঘরে ঢুকলেন আপনি। সাবদান করবারও সোমায় পেলুম না, দেকলুম একটা ফুলদানীর মদ্যে কি যেন ছেড়ে দিলেন আপনি...'

'ওটা কি তুমিই সরিয়েছিলে ওখান থেকে?' খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার মুখটা।

'তবে আর কে?' একগাল হাসল গিলটি মিয়া। 'কিচু মনে করবেন না, স্যার, ওটার জন্যে আপনাকে এমন মার খেতে হবে জানলে আর ইস্পশ্য করতুম না। কিন্তুক দরজার গায়ে কান পেতে আপনাদের কতা শুনতে গিয়ে দেকি বার বার প্যাকেট,

প্যাকেট করচে একটা লোক। আমার মনে হলো ও জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়, তাই তুলে নিলুম।'

'তোমার কাছেই আছে ওটা?'

'নিচ্চয়!' পকেট থেকে নীল প্যাকেটটা বের করে দিল রানাকে। 'আপনার জিনিস বলে আর খুলিনি ওটা, যেমন ছিল তেমনি আচে।'

'ওয়েল ডান, গিলটি মিয়া!' হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিল রানা। রানার প্রংশসায় একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেল গিলটি মিয়া। হাসি গিয়ে ঠেকল দু'দিকের দুই কান পর্যন্ত।

'তারপর ডেঁড়িয়ে রইলুম বাইরে। আপনাকে কোতাউ নিয়ে চলেচে বুজতে পেরে পিচু নিলুম। বহু কষ্টে হাজির হয়েচি এই ভূতুড়ে বাড়িতে। নৌকো একখানা চুরি করা সোজা, কিন্তুক ওটাকে এ পয্যন্ত চালিয়ে নিয়ে আসা- ওরে-ব্বাপ! তার পরের ঘটনা তো নিজের চোকেই দেকলেন।'

উঠে দাঁড়াল রানা। বাঁধনগুলো পরীক্ষা শেষ করে প্যান্টের পিছনে হাত মুছল ওস্তাদ, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফিরল রানার দিকে।

'এবার কি?'

'চলুন, আগে গনডোলায় ওঠা যাক।'

গনডোলায় উঠে পড়ল সবাই। বৈঠা তুলে নিল বাতিস্তা। রওনা হয়ে গেল ওরা।

খুব সংক্ষেপে যা যা ঘটেছে বলল রানা ওদের। তারপর ফিরল বাতিস্তার দিকে।

'জুলির হত্যাকারী কে জানতে পেরেছি আমি, বাতিস্তা।'

'কে!' থেমে গেল বাতিস্তার হাতের বৈঠা।

'নির্যাতন করেছিল গীয়ান, কিন্তু ওকে খুন করেছে ওড্ডি।'

'আমি এখানেই নেমে যাব, সিনর।' গনডোলাটা বেঁকে গেল

তীরের দিকে। ‘দয়া করে বাধা দেবেন না আমাকে।’
‘না। বাধা দেয়ার অধিকার আমার নেই।’ নৌকোটা তীরে ভিড়তেই ওড্ডির রিভলভারটা এগিয়ে দিল রানা বাতিস্তার দিকে।
‘ওটা দরকার হবে না, সিনর। কোথায় আপনার সাথে দেখা করব?’
‘ব্যবহার করো আর না করো, রাখো এটা সাথে।’ জোর করে গুঁজে দিল রানা রিভলভারটা বাতিস্তার হাতে। ‘আগামী দেড় ঘণ্টার মধ্যে ভেনিস ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি। পারলে ঘণ্টাখানেক পর ওস্তাদের বাসায় এসো একবার।’
অন্ধকারে মিলিয়ে গেল বাতিস্তার সুঠাম, দীর্ঘ দেহ।
বৈঠা তুলে নিল ওস্তাদ। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ‘আমার কি কাজ বললে না, ক্যাপ্টেন?’
‘আর কিছুদূর গিয়ে আমরা দু’জন নেমে যাব। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পৌঁছব আমরা আপনার বাসায়। আজ রাতেই পালাতে হবে আমাদের। মোটরবোটের ব্যবস্থা করা কি সম্ভব হবে এত রাতে?’
‘ব্যবস্থা হয়ে বসে আছে। সুন্দর একটা বোট ঠিক করেছি তোমার জন্যে। এক কথায় রাজি হয়ে গেছে ছেলেটা। আমারই সাগরেদ।’
‘তাহলে আপনার আপাতত আর কোন কাজ নেই, ওস্তাদ। এইখানেই নামব আমরা। আপনি সোজা বাসায় ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করুন, আমরা আসছি।’
‘তোমরা চলেছ কোথায়?’
‘বাসায়। ওখান থেকে কয়েকটা জরুরী ফোন সারতে হবে আমার। এক ঘণ্টার বেশি দেরি হবে না।’
ঘ্যাশ্‌শ্‌ করে তীরে ভিড়ল গনডোলা। গীয়ানের রিভলভারটা এগিয়ে দিল রানা ওস্তাদের দিকে।
‘এটা সাথে রাখুন, ওস্তাদ।’

‘আরে দূর!’ একগাল হাসল ওস্তাদ। ‘পাগল নাকি তুমি? মানুষ খুন করতে পারব না আমি। রেডি, অন্‌ ইয়োর মার্ক, গেট-সেট বলে ঠাশ করে শূন্যে ফাঁকা আওয়াজ করা পর্যন্ত আমার দৌড়। ও জিনিস আমার কোন কাজে লাগবে না।’
নেমে পড়ল রানা।
‘আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম, ওস্তাদ।’
‘কষ্ট! বেশি ভদ্রতা দেখানো হচ্ছে, না? এমন এক বক্সিং লাগাব, একেবারে খালের মাঝখানে গিয়ে পড়বে! কোন্‌ ইয়ারে পাস করেছ?’
পাগলা ওস্তাদকে আর না ঘাঁটিয়ে এগোল রানা ও গিলটি মিয়া।

মিনিট পাঁচেক দ্রুত হেঁটে বাসায় পৌঁছল ওরা।
এখানে ফিরে এসেছে রানা নিরিবিলিতে আগামী প্ল্যান ঠিক করবার জন্যে। খুবই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে ওকে কয়েকটা ব্যাপারে। তার জন্যে দরকার এমন একটা নিরাপদ জায়গা যেখানে চিন্তার সূত্র ছিন্ন করবে না কেউ। এই বাড়িটাই এ মুহূর্তে ওর জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।
গিলটি মিয়াকে এক কাপ চা খাওয়াবার অনুরোধ করে জানালার সব ক’টা কার্টেন টেনে দিল রানা, টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে বসল গিয়ে টেবিলে, পকেট থেকে বের করল নীল প্যাকেটটা।
নিজের অজান্তেই মৃদু হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। এরই জন্যে এতকিছু। এরই জন্যে হন্যে হয়ে খুঁজছিল ওরা অনিলকে, এরই জন্যে প্রাণ দিতে হলো জুলি মাযিনিকে, হয়তো এরই জন্যে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে অনিল- এরই জন্যে এতসব। কি আছে এর ভেতর? এমন কিছু আছে, যাতে নির্দোষ প্রমাণ করা

যাবে অনিলকে?

একটা সিগারেট ধরিয়ে নীল প্লাস্টিকের মোড়ক খুলল রানা। তিন ইঞ্চি লম্বা, দুই ইঞ্চি চওড়া ছোট একটা নোট বুক। কাভারটা লাল। নোট বুকের গায়ে রবার ব্যাণ্ড দিয়ে আটকানো একটা চিঠি। ব্যাণ্ডটা খুলে চিঠির সম্ভাষণটা পড়ে অবাক হয়ে গেল রানা। ওকেই লেখা চিঠি। তিনটে শীট উল্টে লেখকের নাম পড়ল রানা। অনিল লিখেছে।

নোট বইটার পাতা উল্টাল রানা। প্রথম দু'তিনটি পৃষ্ঠায় কি যেন লেখা আছে দুর্বোধ্য কোডে। বাকি সব পৃষ্ঠা খালি। চেষ্টা করলেও যে আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই কোড ভেঙে অর্থ উদ্ধার করতে পারবে এমন ভরসা পেল না রানা। কাজেই চিঠির প্রতিই মনোনিবেশ করল সে।

প্রিয় মাসুদ রানা,

এ চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছবে, যদি পৌঁছায়, তখন খুব সম্ভব আমি আর এই পৃথিবীতে নেই। একটা পোড়ো বাড়িতে ক্যাম্প-খাটে শুয়ে লিখছি তোমাকে এ চিঠি। কাঁধে গুলি খেয়েছি, গুলিটা রয়ে গেছে ভেতরে। দিন দিন অবস্থা খারাপের দিকে চলেছে। ডাক্তারের সাহায্য নেয়া যাচ্ছে না, ডাক্তার ডাকলেই ধরা পড়ে যাব। ধরা পড়া মানেই মৃত্যু।

লাল নোট বইটায় ভারতের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আছে। লা কোসা নোস্ট্রার ড্রাগস ডিপার্টমেন্ট থেকে চুরি করেছি ওটা আমি। টের পেয়ে গেছে এই ডিপার্টমেন্টের চীফ সিলভিও পিয়েত্রো। লেগে গেছে আমার পিছনে। আমি জানি এই ভয়ঙ্কর লোকটার হাত থেকে নিস্তার নেই আমার, আহত অবস্থায় কিছুতেই বেরোতে পারব না ইটালী থেকে। রোম থেকে তেড়ে নিয়ে এসেছে এরা আমাকে ভেনিস পর্যন্ত। বুঝতে পারছি, জাল

গুটিয়ে আনছে এখন, ধরা পড়তে আমার আর বেশি দেরি নেই। শেষ চেষ্টা হিসেবে তোমার উপর ভার দিয়ে যাচ্ছি আমি- যেমন করে পারো, এ নোট বইটা পৌঁছে দেবে আমার চীফ শ্রীরঞ্জন চৌধুরীর হাতে। রানা, যেমন করে পারো। তারপর যদি সময় করতে পারো, তাহলে আমার মাকে একটু আমার কথা বলো, সান্ত্বনা দিয়ো। ওঁকে ধারণা দেয়া হয়েছে, আমি দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক। তুমি বলো, আমি তা ছিলাম না।

এই বইটা হাতাবার জন্যে আমাকে সেই রকমই ভান করতে হয়েছিল, মিশে যেতে হয়েছিল এদের সাথে। ব্যাপারটা জানেন শুধু আমার চীফ আর আমি, আর এখন জানলে তুমি। আর কাউকে জানানো হয়নি। কাউকে না। আর সবাই জানে, আমি আনুগত্য বদলে ফেলেছি টাকার লোভে। গোপনীয়তা রক্ষা এতই জরুরী ছিল যে আমার মাকে পর্যন্ত ভুল ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে আমার বিরুদ্ধে। এটা দরকার ছিল। আমার নিরাপত্তার জন্যেই প্রয়োজন ছিল এর। কারণ আমার দেশেও লোক আছে এদের।

এ বইটার ব্যাপারে যাই করো, সাদামাঠা কিছু করতে যেয়ো না। ভারতীয় কনসুলেট বা এমব্যাসিতে যেয়ো না। পোস্টে পাঠাবার চেষ্টা কোরো না। রঞ্জন চৌধুরীর হাতে দিতে হবে তোমার বইটা নিজ হাতে। আর কারও হাতে নয়। সর্বত্র এজেন্ট আছে এদের। ভয়ানক ক্ষমতাশালী এরা। কাউকে বিশ্বাস কোরো না। সিলভিও পিয়েত্রো যদি জানতে পারে তোমার কাছে রয়েছে নোট বইটা, তোমাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে দ্বিধা করবে না এক সেকেণ্ড। এদের আণ্ডার-এস্টিমেট কোরো না। দারুণ অসুবিধেয় পড়বে তুমি ইটালী থেকে বাইরে বেরোতে গিয়ে। ইচ্ছে করলে সব পথ বন্ধ করে দিতে পারে সিলভিও। ইউরোপের কোথাও তুমি নিরাপদ নও। ইংল্যাণ্ড অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, কিন্তু সেখান পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারে এরা। যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা আমার

চীফের হাতে তুলে দাও, ততক্ষণ পর্যন্ত কোথাও তোমার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই।

সব সময় মনে রাখবে, সারা ইউরোপে ওদের লোক আছে, প্রত্যেক দেশে রয়েছে নেট-ওঅর্ক। যমের মত ভয় করে এদের সবাই। বহু সরকারী কর্মচারী কাজ করছে এদের হয়ে- পুলিস, কাস্টম্‌স্‌, এমনকি আর্মিতে পর্যন্ত আছে এদের লোক। এয়ারপোর্টে লোক আছে, হোটেলে লোক আছে, সবখানে। এমন কি প্রয়োজন হলে পেট্রলপাম্প ওয়ালাদের নির্দেশ দেয়া হবে তোমার গাড়ি অকেজো করে দেয়ার জন্যে, হুকুম পেলে প্লেন পর্যন্ত ক্র্যাশ করা হবে, গ্রেপ্তার করা হবে তোমাকে ট্রেন থেকে যে-কোন একটা আজেবাজে ছুতোয়। সহজে নিস্তার নেই তোমার। আমার একমাত্র ভরসা, সহজ লোক তুমি নও।

তোমাকে এত কথা বলার উদ্দেশ্য ভয় দেখানো নয়, সাবধান করে দেয়া। খুবই সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে তোমাকে। ভুলেও আণ্ডার-এস্টিমেট করবে না এদের।

তোমার উপর এই বিপজ্জনক গুরুদায়িত্ব চাপাতে হচ্ছে বলে আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু এছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। নিজের কথা ততটা ভাবছি না যতটা ভাবছি দেশের কথা। আমার দেশের স্বার্থে তোমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথাটাও ভাবছি না, এটাকে স্বার্থপরতা বলা যায়, দুর্বল অক্ষমের এ স্বার্থপরতাটুকু ক্ষমা করে দিয়ো। আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি নিজেই করতাম কাজটা।

ডাক না আসা পর্যন্ত আনন্দে থাক- এই শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি।

অনিল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

চিঠিটা অন্যমনস্কভাবে ভাঁজ করে বুক-পকেটে রেখে দিল রানা।

দ্রুত চিন্তা চলছে ওর মনের মধ্যে। ঘড়ি দেখল। ঘণ্টাখানেক পর ওডিড কি করছে ভেবে ব্যস্ত হয়ে উঠবে সিলভিও। তার আগেই ব্যবস্থা করতে হবে যা করার। এখনি সবকিছু ওরা জেনে ফেলেছে কিনা কে জানে। যত দ্রুত সম্ভব এদের চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে ভেনিস থেকে।

চায়ের কাপ হাতে করে ঢুকল গিলটি মিয়া।

সংক্ষেপে বলল রানা সব ব্যাপার। শুনে ভ্রূ কুঁচকে গেল গিলটি মিয়ার।

চায়ের কাপ শেষ করে দুটো টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল রানা সিগারেটটা। কানে তুলে নিল টেলিফোন রিসিভার। ডায়াল করল লিডো এয়ারপোর্টে।

এয়ার-ট্যাক্সি চালক মেথিসের সাথে বেশ খাতির হয়ে গিয়েছিল ওর লিডো থেকে দুপুরে পডুয়া যাওয়ার পথে। ওকেই চাইল রানা।

'আপনি একটু ধরুন। আচ্ছা, হ্যালো, কে বলছেন আপনি?'

'বলুন মাসুদ রানা। জরুরী দরকার।'

কয়েক সেকেণ্ড বিরতি। তারপর সেই একই কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'দুঃখিত। সিনর মেথিস এখানে নেই।'

'কোথায় আছে?'

'আমি ঠিক জানি না, সিনর।'

'ওর তো এই সময় থাকার কথা? যাই হোক, আমার একটা এয়ার-ট্যাক্সি দরকার। এক্ষুণি। লিডো টু প্যারিস। চার্টার করতে চাই। ব্যবস্থা হয়ে যাবে?'

'দাঁড়ান, একটু দেখে বলছি।'

অসহিষ্ণুভাবে অপেক্ষা করল রানা আধ মিনিট, খড়মড় আওয়াজ হলো, ভেসে এল কণ্ঠস্বর।

'আমি দুঃখিত। আগামীকাল দুপুরের আগে কোন প্রাইভেট চার্টার প্লেনের ব্যবস্থা করা যাবে না, সিনর।'
'খরচ যাই হোক কিছু এসে যায় না। আজ রাতেই আমার প্যারিস যাওয়া দরকার।'
'সেটা সম্ভব নয়, সিনর। কাল দুপুরের আগে হবে না।'
'এয়ারপোর্ট ম্যানেজারের কানেকশন দিন। তার সাথে কথা বলতে চাই আমি।'
'উনি বাসায় চলে গেছেন, সিনর,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলল লোকটা।
'বাসার নাম্বারটা দিন।' হাল ছাড়ল না রানা।
'বাসার নাম্বার আমার জানা নেই, সিনর। দুঃখিত।'
ভ্রূ জোড়া কুঁচকে গেছে রানার, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে চোখের দৃষ্টি। পরিষ্কার বুঝতে পারল ব্যাপারটা। কোনরকম সহযোগিতা আশা করা যায় না এখান থেকে। অনর্থক সময় নষ্ট হবে, লাভ হবে না চেষ্টা করে। সত্যিই প্লেন নেই, নাকি ইতিমধ্যেই কাজে নেমে গেছে সিলভিও? এতই দ্রুত! এখন একমাত্র ভরসা পাগলা ওস্তাদ।
রিসিভারটা নামিয়ে রেখে গিলটি মিয়ার দিকে ফিরল রানা।
'প্লেন চার্টার করা গেল না। তুমি বরং থেকে যাও, গিলটি মিয়া। এদিকের অবস্থাটা শান্ত দেখলে কাল-পরশু অ্যালিটালিয়ার একটা টিকেট কেটে পৌঁছে দেবে তোমাকে বাতিস্তা লিডো এয়ারপোর্টে।'
'আর আপনি?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করল গিলটি মিয়া।
'আমি মোটরবোটে করে চলে যাব ভেনিস থেকে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে। টেস্নে বা গাড়িতে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। এয়ার-ট্যাক্সি চার্টার করা যাচ্ছে না। বোটে করে যতদূর যাওয়া যায় গিয়ে তারপর ধরব হাঁটা পথ।'

'সে তো খুব ভাল কতা। আমাকে সাতে নিতে অসুবিদে কি?'
'খুবই কষ্ট হবে, তাছাড়া বিপদও আছে এই লম্বা জার্নিতে। প্রতিপক্ষ খুবই শক্তিশালী, যাতে এদেশ থেকে বেরোতে না পারি সে চেষ্টার কোনরকম ত্রুটি করবে না। সর্বশক্তি নিয়োগ করবে ঠেকাবার জন্যে। কাজেই...'
'কাজেই ওরা আপনাকে তেড়ে ধরে খুন করুক আর ইদিকে আমি ঠ্যাংয়ের ওপর ঠ্যাং তুলে গোঁপে তা দিয়ে বসে থাকি, নিচ্চিন্ত, নিজঝঢ়াট। সেটি হচ্চে না। আমিও যাচ্চি আপনার সাতে। বেশি গ্যাঞ্জাম করলে নুকিয়ে পিচু নেব বলে রাকচি আগে থেকে।'
গিলটি মিয়ার চোখ পাকানো দেখে হেসে ফেলল রানা।
'ঠিক আছে, যদি যেতে চাও, তৈরি হয়ে নাও পাঁচ মিনিটের মধ্যে। জামা-কাপড় এতেই চলবে, শুধু দুটো রাকস্যাকে পাঁচ-সাত দিন টেকার মত খাবার ভরে নাও। বিনকিউলারটা নিতে ভুলো না। এক বোতল ব্র্যাণ্ডিও নিয়ো। যাও, কুইক।'
'দু'মিলিট, স্যার। আসচি। মালপত্রগুনো?'
'ওগুলো থাকবে। এর ব্যবস্থা করা যাবে পরে। ভাল কথা, তোমার ঘরে টেবিলের ড্রয়ারে গোটাকয়েক ম্যাপ দেখেছিলাম, ওগুলো নিয়ে নিয়ো সাথে। কাজে লাগবে।'
'ঠিক আচে।'
দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল গিলটি মিয়া। লম্বা জার্নির উপযোগী কাপড় পরে নিল রানা। প্যান্টের একটা গুপ্ত পকেটে রাখল নোট বইটা নীল প্লাস্টিক মুড়ে। অনিলের সততায় আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই- যথাসাধ্য সাহায্য করবে সে ওকে। সবচেয়ে বড় কথা এখন অনিলেরই খাতিরে ভেনিস থেকে ওদের মনোযোগ অন্যত্র সরানো দরকার। কাজেই একেবারে হাওয়া হয়ে গেলে চলবে না, পিছু ধাওয়া করবার জন্যে কিছু কিছু সূত্র রেখে যেতে

হবে পিছনে।

এখন প্রথম কাজ সারাগাত হোটেল থেকে ওর পিস্তল আর টাকা নেয়া, তারপর সোজা ওস্তাদ স্টেফানো মন্টিনির বাসা। মোটরবোটটা একবার ছাড়তে পারলে আর ওকে পায় কে।

ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা।

থমকে দাঁড়াল রানা চৌকাঠের উপর। সারাটা মেঝে লাল হয়ে আছে তাজা রক্ত লেগে। সারা ঘর লণ্ডভণ্ড।

কোসা নোসটস্পা! ভয়ঙ্কর মাফিয়ার আর এক নাম- কোসা নোসট্রা! বিদ্যুৎগতি এদের কাজে।

হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে ওস্তাদ রক্তাক্ত মেঝের উপর। ফাঁক হয়ে আছে গলাটা বিকট ভঙ্গিতে।

জবাই করা হয়েছে পাগলা ওস্তাদকে।

পাঁচ

'কিছুই করতে পারলাম না, সিনর!' অবিরাম কাঁদছে বাতিস্তা, ফোঁপাচ্ছে। দরদর জল গড়াচ্ছে দু'চোখ বেয়ে। 'ওরা প্রতিশোধ নিয়ে গেছে ওড্ডির মৃত্যুর। আমি যখন এসে পৌঁছলাম, তখন সব শেষ।'

'আক্ষেপ করে কোন লাভ নেই, বাতিস্তা।' ওর কাঁধের উপর হাত রাখল রানা। 'আমাদের করবার কিছুই ছিল না। এখনও নেই। তুমি বাসায় চলে যাও। কি করতে হবে পরে একসময় জানাব আমি তোমাকে।'

'আর আপনি? আপনি কি করবেন এখন?'

'এখনও ঠিক করতে পারিনি কি করব। অনেকটা ভরসা করেছিলাম ওস্তাদের জোগাড় করা মোটরবোটের ওপর। এখন কি করা যায় ভেবে বের করতে হবে আবার। বদলে নিতে হবে প্ল্যানটা।'

'কেন? মোটরবোটের চাবি তো আমার সামনে ওস্তাদকে দিয়ে দিয়েছে সিনর ম্যারিয়ানো। আপনাকে দেয়নি সেটা ওস্তাদ?'

'না। হয়তো ভুলে গেছে।'

'তাহলে নিশ্চয়ই ওটা ওঁর পকেটেই আছে,' বলতে বলতে ঘরে ঢুকে পড়ল বাতিস্তা। জ্যাকেটের ভিতরের পকেট থেকে বের করে আনল দুটো চাবি পরানো একটা সুদৃশ্য রিঙ। ফিরে এসে রানার হাতে দিল ওটা। 'চলুন, আমি চিনি বোটটা। দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।'

'ভেরি গুড!' বলল রানা। 'তাহলে আর প্ল্যান বদলানোর কোন দরকার নেই। চলো, পথে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে তোমার পরবর্তী কাজটা।'

দশ মিনিট অনর্গল কথা বলল রানা। চুপচাপ শুনল বাতিস্তা হাঁটতে হাঁটতে।

সব শুনে বাতিস্তা বলল, 'কাজটা আপনার জন্যে খুবই বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে।'

'কিন্তু এছাড়া ভেনিস থেকে ওদের নজর অন্যদিকে ফেরাবার আর কোন উপায় নেই।'

'তা ঠিক,' চিন্তিত মুখে বলল বাতিস্তা। 'কিন্তু আমাকে সাথে নিলে আপনার অনেক সুবিধে হত।'

'হত। কিন্তু তুমি ভেনিসে থেকে যে উপকার করতে পারবে, আমার সাথে গেলে সেটা পারবে না।'

মাথা ঝাঁকাল বাতিস্তা। বুঝতে পেরেছে। 'ঠিক আছে। অনুকূল পরিবেশ দেখলেই প্লেনে তুলে দেব আমি ওকে।'

আঙুল তুলে দেখাল বাতিস্তা বোটটা। খুশি হয়ে উঠল রানা মনে মনে। ঝকঝকে চেহারার একটা বত্রিশ ফুট লম্বা কেবিন-ক্রুসেট। রানা জানে, খুবই শক্তিশালী এঞ্জিন থাকে এসব কেবিন-ক্রুসেটে। ট্যাংক দুটো এখন ভরা থাকলেই হয়।

যা ভয় পেয়েছিল, তাই। একটা ট্যাংক একেবারে খালি, অপরটায় অর্ধেক আছে তেল।

'কোন চিন্তা নেই,' বলল বাতিস্তা। 'একটু এগোলেই মোটরবোটের ডিজেল-পাম্প। চলুন, তেল ভরা হলে নেমে যাব আমি।'

তেলের কথা শুনেই চোখ কপালে তুলল পাম্পওয়ালা।

'এত রাতে ডিজেল দেয়া যাবে না। পাম্প বন্ধ।'

'ডবল পয়সা দেব। একটু কষ্ট করতেই হবে আমাদের জন্যে, সিনর। আমাদের খুবই জরুরী দরকার।' পকেট থেকে বেশ কয়েকটা পাঁচ হাজার লীরার নোট বের করে লোকটার নাকের সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে আনল রানা।

লোভে চকচক করে উঠল লোকটার চোখ জোড়া টাকা দেখে, কিন্তু নিভে গেল আলোটা খুব অল্পক্ষণেই। মাথা নাড়ল সে। 'আমি খুবই দুঃখিত, সিনর। আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু আসলে তেলই নেই আমার কাছে। আগামীকাল নতুন কনসাইনমেন্ট আসবে, তখন আপনাকে তেল দিতে কোন অসুবিধেই থাকবে না আর।'

রানা বুঝল, মিথ্যে কথা বলছে লোকটা। পাম্পটা দশ সেকেণ্ড পরীক্ষা করেই বুঝতে পারল ডিজেলের অভাব নেই ট্যাংকে। মৃদু ইশারা করল বাতিস্তাকে। এক লাফে লোকটার পিছনে চলে এল বাতিস্তা, পিছন থেকে পেঁচিয়ে ধরল গলা।

'খবরদার!' লোকটার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল বাতিস্তা, 'টুঁ শব্দ করলে মটকে দেব ঘাড়।'

লোকটার পকেট থেকে চাবি নিয়ে পাম্প চালু করল রানা। ট্যাংক দুটো পুরো ভরে নিয়ে এসে দাঁড়াল লোকটার সামনে। ফেরত দিল চাবি। চার-পাঁচটা পাঁচ হাজার লিরার নোট ঢুকিয়ে দিল লোকটার বুক পকেটে। হাসল।

'মিথ্যে কথা কেন বলছিলে?'

কোন উত্তর নেই। গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা নাক মুখ কুঁচকে। আশঙ্কা করছে এই বুঝি ধাঁই করে ঘুসি পড়বে ওর নাকের ওপর। মারল না রানা। আরও দুটো নোট গুঁজে দিল ওর পকেটে। পিস্তল বের করল।

'একে ছেড়ে দিয়ে বাসায় চলে যাও তুমি,' বাতিস্তাকে বলল রানা। 'কোথায় কোথায় খোঁজ নিতে হবে তা তো জানাই আছে তোমার। লাইন পরিষ্কার দেখলে বাকি কাজটুকু সেরে ফেলবে। গুডবাই।' লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে বাতিস্তা এক পা দু'পা করে। বেশ কিছুদূর সরে যেতেই উঠে পড়ল রানা মোটরবোটে। পিস্তলটা পকেটে পুরে বলল, 'নেমকহারামী কোরো না। ফলটা তোমার জন্যেই খারাপ হবে।'

ছোট্ট একটা গর্জন করেই চালু হয়ে গেল এঞ্জিন। ধীরে ধীরে এগোল বোটটা, আর একটু গেলে পড়বে বড় খালে, তারপর বাড়বে স্পীড। চিওগিয়ার দিকে যাবে প্রথমে, সোজা দক্ষিণে, তারপর পো নদী বেয়ে চলে যাবে মিলানো পর্যন্ত; সেখান থেকে চেষ্টা করবে প্লেন ধরবার। রানা আশা করেছিল, টেস্ন, প্লেন, বাস বা গাড়িতে করে যাতে ও ভেনিস থেকে বেরোতে না পারে সে ব্যবস্থা করেই সন্তুষ্ট হবে সিলভিও, ও যে এত অল্প সময়ে বোট সংগ্রহ করে ফেলতে পারবে সেটা কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু পাম্পওয়ালার ব্যবহার দেখে ভিতরে ভিতরে চমকে গেছে ও। প্রথমে এয়ারপোর্টের অসহযোগিতা, তারপর এই ডিজেল-অসহযোগ- নাহ্, দৈব-সংযোগ হতেই পারে না। অত্যন্ত

ক্ষমতাশালী কোন ব্যক্তির আদেশ আছে এদের উপর। রানার নাম ও চেহারার বর্ণনা দেয়া আছে এদের কাছে। রানা কি ভাবে ভেনিস থেকে বেরিয়েছে সে খবর সিলভিওর কানে পৌঁছতে দেরি হবে না। কাজেই মিনিটে মিনিটে প্ল্যান পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। গোড়াতেই গলদ রয়ে গেল, কিন্তু ডিজেল ছিনিয়ে না নিয়ে আর কোন উপায় ছিল না ওর।

হঠাৎ ধুপধাপ পায়ের শব্দে চমকে ডানদিকে ফিরল রানা ও গিলটি মিয়া।

'ঘাপলা বেধে গেচে, স্যার,' বলল গিলটি মিয়া। 'পুলিস!'

চারজন সেপাই এসে দাঁড়িয়েছে পারে। সশস্ত্র।

'এই যে, সিনর!' চিৎকার করে উঠল ওদের একজন। 'মোটরবোট ভিড়াও তীরে।'

'থামাতে বলচে, স্যার। থামাবেন?' জিজ্ঞেস করল গিলটি মিয়া।

'দাঁড়াও, দেখি।' গতিটা একটু মন্থর করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। পারে দাঁড়ানো সিপাইগুলোর কাছাকাছি এসে গেছে ওরা এখন। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

'থামাও বোট! পারে নিয়ে এসো।' বোটের সাথে হাঁটতে শুরু করেছে ওরা।

'কেন? কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

বড় খালের একেবারে কাছে চলে এসেছে ওরা।

'কি হয়েছে ভাল করেই জানা আছে তোমার!' ধমকে উঠল একজন পার থেকে। 'পাম্প থেকে ডিজেল চুরি করেছ তোমরা এক্ষুণি। থামাও বোট!'

সবই বুঝল রানা। এখন বোট থামানো মানে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া, তারপর চলবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, কৈফিয়তের পর কৈফিয়ত। ওস্তাদের খুনের সাথে ব্যাপারটা জড়িয়ে ফেললে তো

আর কথাই নেই। অন্তত দশ দিনের জন্যে আটকে যাবে সে ভেনিসে।

'কি হলো? থামাচ্ছ না?' রেগে উঠল একজন কর্কশ কণ্ঠধারী।

'একটু তাড়া আছে, দাদা,' বলল রানা। 'আরেকদিন গল্প করা যাবে, আজ আসি।'

থ্রটল খুলে দিল রানা অর্ধেকটা। প্রায় লাফিয়ে এগোল কেবিন ক্রুসেট। মোড় নিল বাঁয়ে।

'গুলি করবে সন্দো হচ্ছে, স্যার!' বলল গিলটি মিয়া। 'বন্দুক নামাচ্চে কাঁধ থেকে।'

'শুয়ে পড়ো,' বলল রানা। নিজেও নিচু করল মাথাটা।

বড় খালে এসে গেছে বোট। থ্রটল পুরো খুলে দিল রানা। দ্বিগুণ হয়ে গেল এঞ্জিনের গর্জন, সামনের দিকটা পানি থেকে একহাত উপরে উঠে গেল। ফুল-স্পীডে বাঁক নিয়ে আড়াল হয়ে গেল পারে দাঁড়ানো সেপাইদের রাইফেলের মুখ থেকে।

সোজা হয়ে বসল রানা। সিগারেট ধরাল।

লিডো পেরিয়ে পেলেস্ট্রিনার দিকে চলেছে কেবিন-ক্রুসেট অন্ধকার ভেদ করে। কোথাও বাতির কোন চিহ্ন নেই। আকাশে হালকা এক পরতা মেঘ থাকায় আধ-খাওয়া চাঁদটা ম্লান ভূতুড়ে আলো ফেলছে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের বিষণ্ন ঢেউয়ের মাথায়।

শুয়ে শুয়ে কুঁই কুঁই করে করে বাংলাদেশের একটা জনপ্রিয় পল্লীগীতি গাইছে গিলটি মিয়া।...তোমরা সুখে রইলা। কোন দূরে যাও চইলা। নাইয়ারে, নায়ে বাদাম তুইলা...। হু-হু বাতাসে ডুকরে কেঁদে উঠতে চায় মনটা অচেনা, অজানা এক গ্রাম্যবধূর দুঃখে।

শক্তিশালী একটা শর্ট-ওয়েভ রেডিয়ো রিসিভারের টিউনিং নব

ঘুরাচ্ছিল রানা, কানে হেডফোন। বিরক্ত ভঙ্গিতে খুলে ফেলল সে হেডফোনটা, অফ করে দিল রেডিয়ো।

'নাহ্! আর পারা গেল না!'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল গিলটি মিয়া।

'কি হলো আবার?'

'এই বোটে করে আর বেশিদূর যাওয়া নিরাপদ নয়,' বলল রানা। 'পেসারো পর্যন্ত যত কোস্টাল-টাউন আছে সব জায়গার পুলিসকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে। দুটো মোটরবোট নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে চিওগিয়া পুলিস। খুঁজছে আমাদের।'

'অন্যায়টা কি করলাম আমরা, স্যার? আমাদের বিরুদ্ধে কি প্রমাণ...'

'কথা তো সেটা নয়,' বলল রানা। 'যেমন করে হোক আমাদের ঠেকানো দরকার। ঠেকাতে পারলে নোট-বইটা কেড়ে নেয়া এমন কিছু কঠিন হবে না ওদের পক্ষে। দারুণ সুবিধে হয়েছে সিলভিওর আমরা ডিজেল চুরি করতে বাধ্য হওয়ায়। এখন পুরো ইটালিয়ান পুলিস ফোর্স ব্লাড-হাউণ্ডের মত লেগে গেছে আমাদের পেছনে। হন্যে হয়ে খুঁজবে ওরা আগামী কয়েকদিন। সিলভিওকে আর কষ্ট করতে হবে না, পুলিসই কষ্ট করছে ওর হয়ে। কী মজা!' সিগারেট ধরাল রানা। 'দিনের বেলা এক মাইল দূর থেকে যে কেউ একবার তাকালেই চিনতে পারবে এই বোট। এর চেহারার বর্ণনা দিয়ে আকাশ-বাতাস গরম করে তুলেছে ব্যাটারা। টিস্সটির দিকে পালাব তারও উপায় দেখছি না। পো নদী ধরে যে মিলানো পর্যন্ত পৌঁছতে পারব, মনে হয় না, ধরা পড়ে যাব আগেই। কাজেই ওই দুটো মোটরবোটের খপ্পরে পড়বার আগেই তীরে পৌঁছোনো দরকার আমাদের। মোটরবোট ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে পড়ুয়া পৌঁছবার চেষ্টা করতে হবে আমাদের। আমাদের চেহারা দেখতে পায়নি পুলিস, কাজেই

এদিক দিয়ে চেষ্টা করলে ওদের আঙুল গলে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে।'

'ওরেব্বাপ! হাঁটতে হাঁটতে ক্ষয়ে যাবে পা। পড়ুয়ায় পৌঁচতে পৌঁচতে দেখব আরও ছ'ইঞ্চি বেঁটে হয়ে গেচি!'

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা চিওগিয়া পৌঁছে পারে নামবে না এখুনি নামবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে বাঁক নিল সে। হঠাৎ কথা বলে উঠল গিলটি মিয়া। কান পেতে কি যেন শুনবার চেষ্টা করছে সে।

'একটা ধুকপুক এঞ্জিনের শব্দ যেন শুনতে পেলুম, স্যার।'

'কতদূরে?' বলেই থ্রটল বন্ধ করে দিল রানা।

গিলটি মিয়াকে আর উত্তর দিতে হলো না। পরিষ্কার শুনতে পেল রানা মোটরবোটের এঞ্জিনের শব্দ। ডানদিক থেকে। এগিয়ে আসছে এইদিকে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। ধীরে ধীরে থেমে এল কেবিন ক্রুসেট। সিগারেটটা সাবধানে নিভিয়ে ফেলল রানা।

'একটা চান্স্ নিয়ে দেখা যাক,' বলল রানা। 'অন্ধকারে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে।'

চুপচাপ বসে রইল ওরা। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এঞ্জিনের শব্দটা জোর হচ্ছে ক্রমেই।

'মনে হচ্চে অন্ধকারে আমাদের ঘাড়েই এসে পড়বে শালারা।'

সামান্য একটু থ্রটল দিয়ে খানিকটা বাঁয়ে সরিয়ে নিল রানা বোটটা। প্রায় নিঃশব্দে সরে গেল ওরা বেশ খানিকটা।

এগিয়ে আসছে পুলিসের বোট। এঞ্জিনের শব্দ বেড়ে গেছে এখন কয়েকগুণ। অনেক কাছে এসে পড়েছে। এমনি সময় দপ করে জ্বলে উঠল সার্চলাইট। তীব্র উজ্জ্বল সাদা আলো দিন করে ফেলল রাতকে।

'পুলিসের বোট!' চাপা কণ্ঠে বলল রানা। পুরো থ্রটল খুলে

দিল সে। 'ভাগলাম জান-প্রাণ নিয়ে।'

সার্চলাইটটা ঘুরে এসে স্থির হলো কেবিন-ক্রুসেটের উপর। ততক্ষণে ওটার নাক উঠে পড়েছে পানি ছেড়ে হাতখানেক উপরে। খোলা সমুদ্রের দিকে ছুটেছে প্রাণপণে।

'ধরে ফেলচে, স্যার!' ভীত গিলটি মিয়ার কণ্ঠস্বর। 'এগিয়ে আসচে। পারচি না আমরা!'

প্রথম এক মিনিট কমে এল দূরত্ব, তারপর কয়েক সেকেণ্ড সমান থাকল, তারপর বাড়তে শুরু করল।

'নিচু হয়ে থাকো, গিলটি মিয়া! চেহারা যেন দেখতে না পায়। মাইল দশেক ঘুরে আমরা আবার ফিরে আসব পারে।'

'দুটো বোট খুঁজচে আমাদের। তা আরাকটা কই?'

'চারদিকে চোখ রাখো। এর হাত থেকে বেরিয়ে আবার ওটার খপ্পরে না পড়ি। সাবধান, গিলটি মিয়া, গুলি করছে ওরা!'

ছোট্ট একটা আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেয়েছে রানা। পরমুহূর্তে কড়াৎ করে আওয়াজ হলো। মৃদু গুঞ্জন তুলে মাথার উপর দিয়ে চলে গেল পাঁচ পাউণ্ডের গোলা।

উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে সার্চলাইটের আলো। বেশ অনেকটা দূরে সরে গেছে কেবিন-ক্রুসেট। দ্রুত সরে যাচ্ছে আরও দূরে। দ্বিতীয় গোলাটা পানিতে পড়ল দশ হাত ডাইনে। আধ মিনিটের মধ্যে আরও একটা স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল। শব্দটা পৌঁছতে আরও একটু দেরি হলো। কিন্তু গুলিটা পৌঁছল ঠিক ঠিক। ছাতের খানিকটা অংশ মড়মড় করে ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে গেল সেটা, ভাঙা কাঠের টুকরো-টাকরা পড়ল রানার আশেপাশে। গতিপথ সামান্য একটু পরিবর্তন করল রানা। নতুন গতিপথে বাতাসের বাধা কমে যাওয়ায় আরও জোরে ছুটল কেবিন-ক্রুসেট। সার্চলাইটের আওতার বাইরে চলে এসেছে ওরা এখন।

নিভে গেল সার্চলাইট। ডাইনে মোড় নিল রানা এবার। পুলিস

বোটের দুটো লাল বাতি দেখা যাচ্ছে আধ মাইল দূরে। সোজা খোলা সমুদ্রের দিকে চলেছে ওটা।

'আপাতত ধুলো দেয়া গেছে ওদের চোখে,' বলল রানা। 'কিন্তু ফিরে আসবে ওরা আবার। তার আগেই নেমে পড়তে হবে আমাদের।'

'উই যে ওদের আরাকটা বোট!' বলল হঠাৎ গিলটি মিয়া।

পিছন ফিরে দেখল রানা, আবার জ্বলে উঠেছে সার্চলাইট। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় বোটটাকে। রানার ধোকাবাজি টের পেয়ে গেছে ওরা। তীরের দিকে আসবার জন্যে ঘুরছে অর্ধবৃত্তাকারে।

ঢেউয়ের মাথায় খুব বেশি রকম নাচানাচি শুরু করল বোটটা। রানা বুঝল, বেলাভূমি আর বেশি দূরে নেই। গতি কমিয়ে দিল।

'জোর একটা ধাক্কার জন্যে তৈরি থাকো গিলটি মিয়া। এসে গেছি।'

মিনিট তিনেক পর ভেজা বালির উপর দিয়ে দ্রুত পায়ে ছুটল ওরা সোজা পশ্চিম দিকে।

ছয়

পনেরো মিনিট দৌড়ে একটা সরু রাস্তায় পড়ল ওরা। আরও কিছুদূর এগিয়ে পড়ল বড় রাস্তায়। দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে ওরা। কিছুদূর হেঁটে মুখ খুলল গিলটি মিয়া।

'সকাল হতে আর খুব বেশি দেরি নেই, স্যার। এই খোলামেলা জায়গায় দিনের বেলা চলা বোধায় ঠিক হবে না। বহুদূর থেকেও চেনা যাবে আমাদের।'

দু'পাশে এবড়ো-খেবড়ো মাঠ, খেত। সব সমতল। সত্যিই, আত্মগোপনের কোন উপায় নেই। রানা জানে, কেবিন-ক্রুসেট খালি দেখেই পুরো এলাকাটা সার্চের ব্যবস্থা করবে পুলিস। বিশেষ করে বড় বড় শহরে খুবই তৎপর থাকবে ওরা। কাজেই এখন গ্রামের কাছাকাছি থাকাই ভাল। হাঁটা পথে সরে যেতে হবে যতদূর পারা যায়। এবং সবার অলক্ষে।

'সবই নির্ভর করছে এখন আমাদের ধরার ব্যাপারে পুলিস কতটা আগ্রহী, তার ওপর,' বলল রানা। 'আমরা ভাবছি খুব বেশি কিছু অপরাধ করিনি আমরা। কিন্তু ওদের দৃষ্টিভঙ্গিটা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়। ওরা হয়তো ভাবছে, ম্যারিয়ানোর কেবিন-ক্রুসেট চুরি করে, পিস্তল দেখিয়ে ডিজেল চুরি করে ভয়ঙ্কর দুই বিদেশী ডাকাত বেরিয়েছে ডাকাতি করতে। পুলিস থামতে বলেছিল, আদেশ অমান্য করেছি আমরা, এটাকেও ওরা হয়তো বিরাট করে দেখছে। কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছে ওরা ব্যাপারটাকে সেটা বুঝতে না পারলে আমাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হবে না। হয় বেশি ভয় পেয়ে অনর্থক সময় নষ্ট করব, নয়তো ধরা পড়ে যাব অসতর্ক অবস্থায়।'

'প্রথমটাই তো আমার কাছে ভাল মনে হচ্চে, স্যার। বেশি সাবদান হওয়াই ভাল। দেরি হয় হোক। কিন্তু রাতের বেলা তো হাঁটচি নিচ্চিন্ত মনে, দিনের বেলা কি করব?'

'আমিও সেই কথাই ভাবছি। দু'পাশে ফার্ম-হাউস খুঁজতে খুঁজতে যাব আমরা। দিনের বেলাটা লুকিয়ে থাকার মত কোন জায়গা পেয়ে যেতেও পারি। খড়ের গাদায়, গোয়াল ঘরে বা গুদাম ঘরে কোথাও না কোথাও জায়গা পেয়েই যাব।'

ঘণ্টা দেড়েক হাঁটার পর হঠাৎ কান খাড়া করল রানা।

'আমিও শুনতে পেয়েচি, স্যার!' বলল গিলটি মিয়া। রাস্তা ছেড়ে ঢাল বেয়ে পাশের খাদে নামতে শুরু করেছে সে।

রানাও নামল পিছু পিছু। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঢালের গায়ে শুয়ে পড়ল ওরা উপুড় হয়ে। একটা গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ এগিয়ে আসছে দ্রুত।

'মাটির গোন্দো সব দেশেই এক, তাই না, স্যার?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল গিলটি মিয়া।

ঝট করে ওর দিকে ফিরল রানা। 'হ্যাঁ। মানুষও এক। সব মানুষ এক।'

চলে গেল গাড়িটা। হেডলাইট নেভানো। শুধু সাইডলাইট জ্বলছে। পুলিসের টুপি চিনতে পারল রানা এক ঝলক দেখেই। সময় নষ্ট করেনি ওরা।

রাস্তায় উঠে এল রানা।

'মাটের মদ্যে দিয়ে হাঁটা ধরলে কেমন হয়, স্যার? রাস্তাটা বিশেষ নিরাপদ মনে হচ্চে না।'

'এবড়ো-খেবড়ো মাঠে খুবই কষ্ট হবে হাঁটতে, অথচ বেশিদূর এগোতে পারব না। চলো, যতদূর পারা যায় রাস্তা ধরে এগোই, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।'

ভাঙা চাঁদের আলো বেশ কিছুটা জোরদার হয়েছে। আরও হালকা হয়ে যাচ্ছে মেঘ। মোলায়েম আলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলল ওরা। ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাস। প্রাণ জুড়িয়ে যায়। বিদেশী এক নির্জন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অতীতের অনেক কথা ভিড় করে আসতে চাইছে রানার মনে। অবচেতন মনের কোন্ গোপন মণিকোঠায় পড়ে ছিল হাজারো টুকরো কথা, স্মৃতি- ভেসে উঠছে সেসব মনের পর্দায়। মনে হচ্ছে স্বপ্নের ঘোরে আছে সে, হাঁটছে স্বপ্নে। পৃথিবীটা মায়াবী এক স্বপ্নের দেশ।

আরও আধ ঘণ্টা হাঁটার পর ফার্ম-হাউস পাওয়া গেল একটা। ঘড়ি দেখল রানা। সাড়ে চারটা। ভোর হতে দেরি নেই। এখানেই চেষ্টা করবে, না আরও সামনে গিয়ে আরেকটা ফার্ম-হাউস

খুঁজবে, সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছিল রানা, এমনি সময় কথা বলে উঠল গিলটি মিয়া।

'চেষ্টা করে দেকতে ক্ষতি কি, স্যার? পরেরটা আবার কতদূর তার ঠিক আচে?'

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। রাস্তা থেকে শ দেড়েক গজ উত্তরে টালির ছাত দেয়া চুনকাম করা দোতলা বাড়ি। ইটালীর গৃহস্থ-বাড়ি। ঝকঝক করছে চাঁদের আলোয়। পাশেই গোলাঘর। তার পাশে গোয়াল।

'সাবধান করে দেয়া হয়েছে এদের,' বলল রানা। 'রাস্তার দু'পাশে যত ফার্ম-হাউস আছে প্রত্যেকের কাছে যাবে পুলিস। তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই। চলো। রাত থাকতে থাকতে একটা আশ্রয় খুঁজে নিতেই হবে।'

বড় রাস্তা ধরে একটা খোয়া বিছানো পথ গেছে ফার্ম-হাউস পর্যন্ত। কিন্তু সে পথে না গিয়ে মাঠ ভেঙে এগোল ওরা। একশো গজ নিশ্চিন্তে হেঁটে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল গিলটি মিয়া।

ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠেছে একটা কুকুর। কুকুর তো নয়, যেন বাঘের গর্জন।

'দেকা হয়েচে, স্যার! চলুন এবার!'

'হাউণ্ড!' আপন মনে বলল রানা। 'গুণ্ডাকে বশ করবার কায়দাটা কাজে লাগাব নাকি? এটার বেলায় খাটবে সেটা?'

গুণ্ডা হচ্ছে রানার পোষা ব্লাড-হাউণ্ডের বাচ্চা। কষ্ট করে ওটার সাথে খাতির করেছে সে। এখন দারুণ ভাব।

'কোন কিচ্চু খাটবে না, স্যার! চলুন, মানে মানে কেটে পড়ি। ওই দেকুন!'

বাতি জ্বলে উঠেছে দোতলার একটা ঘরে। দ্বিগুণ জোরে চিৎকার শুরু করেছে কুকুরটা, টেনে ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম করেছে চেন। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল রানা।

'দৌড় দাও, গিলটি মিয়া। এসো আমার সাথে। ওরা মনে করবে কুকুরের ডাকে ভয় পেয়ে ভেগেছি আমরা।'

উল্টো দিকে দৌড়াতে যাচ্ছিল গিলটি মিয়া, রানাকে সোজা সামনের দিকে দৌড়াতে দেখে থমকে গেল এক সেকেণ্ড, তারপর পিছু নিল। এক ছুটে গোলাঘরের পিছনে এসে দাঁড়াল ওরা। ঘটাং করে দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল ওরা পরিষ্কার।

দোতলা থেকে একটা মেয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'হুট করে বেরিয়ে পড়ো না, বাবা। সাবধান! নেন্নি যাচ্ছে, একটু দাঁড়াও।'

'ওই হারামজাদা ছেলের জন্যে দাঁড়ালে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আমার,' মোটা পুরুষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'কুকুরটাকে বিরক্ত করছে জানি কোন শালা।'

'আমি আসছি, বাবা, একটু দাঁড়াও!' হারামজাদা ছেলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'দু'জন আসচে!' ভয়ে ভয়ে বলল গিলটি মিয়া।

'তিনজন,' বলল রানা। ঝনাৎ করে শব্দ হলো শিকলের। 'কুকুরটাকে ছেড়ে দিল ব্যাটা।'

'এই সেরেচে।' দেয়ালের সাথে সেঁটে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল গিলটি মিয়া। 'সব্বো শরীল কাঁপচে স্যার। বুকের ভেতর...'

'চুপ!' চাপা গলায় ধমক দিল রানা। এগিয়ে গেল কয়েক পা। দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই গোলাঘরটা ঘুরে চলে এল একটা বড়সড় হাউণ্ড। রানাকে দেখেই চাপা একটা গর্জন ছেড়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এল ওর দিকে।

ছ্যাৎ করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। কিন্তু নড়ল না একটুও। শেষ লাফটা দেয়ার আগে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল হাউণ্ডটা। ইতস্তত করল কিছুক্ষণ, তারপর নাক নিচু করে শুঁকতে শুরু করল রানার চারপাশটা।

‘এই তো লক্ষ্মী ছেলে!’ বলল রানা। হালকা করে শিস দিল দাঁতের সাথে জিভ ঠেকিয়ে।

কাজ হলো এতে। কাছে সরে এল কুকুরটা। লেজ নাড়তে দেখেই নিচু হয়ে ওটার মাথায় আদর করল রানা। আদর পেয়ে একেবারে গলে গেল কুত্তার বাচ্চা, রানার গাল চেটে দেয়ার উপক্রম করল।

‘বিউনো! এদিকে এসো!’ চিৎকার শোনা গেল বুড়ো লোকটার।

আওয়াজ শুনে বোঝা গেল গোলাঘরের কাছাকাছি কোথাও রয়েছে লোকটা।

‘যাও, বিউনো। ডাকছে!’ মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। ঠেলা দিল ওকে গোলাঘরের দিকে।

রানার মুখের দিকে চাইল হাউণ্ডটা, বুঝতে পারল কি বলতে চাইছে সে, এক ছুটে গোলাঘরটা ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। রানা ফিরল গিলটি মিয়ার দিকে। নেই!

অবাক হয়ে কয়েক পা এগিয়ে এল রানা। দেখল ইতিমধ্যেই একটা দরজা পেয়ে গোলাঘরের ভিতরে ঢুকে গেছে গিলটি মিয়া, দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করে দেখছে বাইরের অবস্থা। রানা কাছে যেতেই বিগলিত কণ্ঠে বলে উঠল, ‘এমনটি আর দেকিনি! একেবারে ভোজবাজী দেকিয়ে দিয়েচেন, স্যার!’

দরজাটা মেলে ধরল গিলটি মিয়া। ভিতরে ঢুকল রানা। দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই টর্চ বের করল পকেট থেকে। ঘরটা চট করে একবার দেখে মইয়ের দিকে এগোল রানা।

একগাদা খড় জড়ো করা আছে মাচার উপর। চারপাশে হাতখানেক জায়গা শুধু খালি রাখা আছে চলাফেরার জন্যে। গাদার উপর উঠে পড়ল গিলটি মিয়া। মচমচ শব্দ হলো। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আরামের একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। সরু পথ বেয়ে

রানা চলে এল একটা দরজার কাছে, সামান্য ফাঁক করে চোখ রাখল সেই ফাঁকে।

কয়েক হাত নিচেই দাঁড়িয়ে আছে দু’জন লোক। একজনের হাতে একটা লণ্ঠন। কান খাড়া করে কি যেন শুনছে ওরা। কাৎ হয়ে আছে ঘাড়।

‘খুব সম্ভব বিড়াল,’ হারামজাদা পুত্র বলল পিতাকে। ‘চলো বাবা, ঘুমিয়ে পড়বে। নইলে কাল আবার তোমার মেজাজের ঠেলায় জান বেরিয়ে যাবে সবার। বিউনোকে তো জানোই। কেউ থাকলে…’

গজগজ করে কি যেন বলল বুড়ো বোঝা গেল না। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে রওনা হলো বাড়ির দিকে।

‘এটাকে ছেড়ে রেখে দাও আজ রাতে,’ বুড়োর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। ‘পুলিসকে খুশি করার জন্যে সারারাত জাগতে পারব না আমি। ওরা আমার কোন্ কাজে লেগেছে কবে?’

বোঝা গেল বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল দু’জনই। ঘটাং করে লেগে গেল বল্টু। খানিক বাদে দোতলার বাতি নিভে গেল।

উঠে পড়ল রানা খড়ের গাদায়।

‘শুয়ে পড়েছে ওরা। খিদে লেগেছে? কিছু খেয়ে নেবে?’

‘না, স্যার। একোন আর কিচু খাব না। ঘুম আসচে দু-চোক ভেঙে।’

‘ঠিক আছে, ঘুমিয়ে পড়ো তাহলে। কাল সারাটা দিন বোধহয় এখানেই থাকতে হবে আমাদের। সন্ধের পর হাঁটা ধরব আবার।’ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। ‘পড়ুয়া পেরিয়ে পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে পড়তে পারলে দিনেও হাঁটা যাবে। তার আগে নয়।’

একটা সিগারেট ধরাবার ইচ্ছে দমন করল রানা। বেশ কিছুক্ষণ ঘুম এল না ওর চোখে। অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লে ঘুম

আসতে চায় না সহজে। কম ধকল যায়নি গত কয়েকটা ঘণ্টা।

ভবিষ্যতের কথা ভাবল রানা কিছুক্ষণ। কত পথ চলতে হবে কে জানে। হন্যে হয়ে খুঁজছে ওদের পুলিস। সিলভিও যে চুপচাপ বসে নেই সেটাও সহজেই বোঝা যায়। একদিকে ইটালিয়ান পুলিস, অন্যদিকে ভয়ঙ্কর কোসা নোস্ট্রা- কিভাবে বেরোবে সে এদেশ থেকে? কোন্‌দিকে যাবে?

আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

চমকে জেগে উঠল রানা। ওর হাত ধরে নাড়া দিচ্ছে গিলটি মিয়া।

কয়েকটা ফুটো দিয়ে রোদ এসে পড়েছে অন্ধকার ঘরে, বেশ কিছুটা ফিকে হয়ে গেছে তার ফলে অন্ধকার। কয়েকজনের গলার আওয়াজ পেল রানা। খুব কাছেই।

'কি ব্যাপার?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'বাঁদা-কপি, স্যার!' ফিসফিস করে বলল গিলটি মিয়া। 'লরীতে তুলচে।'

সাবধানে কোন রকম শব্দ না করে উঠে পড়ল রানা। নিঃশব্দ পায়ে দরজার কাছে এসে চোখ রাখল ফাঁকে। দরজার ঠিক নিচেই দাঁড়িয়ে আছে একটা দশ-টনী ট্রাক। ত্রিপল দিয়ে অর্ধেকটা ঢাকা। ঝুড়ির পর ঝুড়ি সাজানো রয়েছে বাঁধা-কপি।

বাপ-বেটা কথা বলছে ড্রাইভারটার সাথে খোশমেজাজে।

খানিকক্ষণ কান পেতেই বুঝতে পারল রানা। পডুয়ায় চলেছে এই বাঁধা-কপির চালান। কথা বলতে বলতে চলে গেল ওরা বাড়ির দিকে। বোধহয় চা-নাস্তা খাওয়ানো হবে ড্রাইভার সাহেবকে।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল রানা।

'চলো, গিলটি মিয়া! রওনা হওয়া যাক।'

ঝটপট রাকস্যাক ঝুলিয়ে নিল ওরা পিঠে। দরজা খুলেই লাফিয়ে নামল রানা ঝুড়ি ভর্তি কপির উপর। দ্রুত হাতে কয়েকটা ঝুড়ি সরিয়ে দু'জনের বসবার মত জায়গা করল। তারপর ইশারা করল গিলটি মিয়াকে।

সরু একচিলতে জায়গায় দাঁড়িয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল আগে গিলটি মিয়া, তারপর ঝুপ করে নামল রানার পাশে। বসে পড়ল দু'জন।

না, চা-নাস্তা নয়, বোধহয় ভাড়া চুকিয়ে দেবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল ওরা ড্রাইভারকে। কারণ এক মিনিট পরেই ফিরে এল তিনজন ট্রাকের কাছে।

'চলি, কাল দেখা হবে আবার,' বলল ড্রাইভার গাড়িতে উঠতে উঠতে।

'পারলে আর একটু সকাল সকাল এসো। গুডবাই।'

স্টার্ট হয়ে গেল এঞ্জিন। খোয়া বিছানো উঁচু-নিচু রাস্তা ধরে নাচতে নাচতে চলল ট্রাক বড় রাস্তার দিকে।

একগাল হাসল গিলটি মিয়া।

'আজকের দিনটা খুব ভাল যাবে, স্যার।'

'কি করে বুঝলে?'

'শুরুটা দেকলেই বোজা যায়। ঘুম থেকে উটেই এই যে তৈরী গাড়ি পেয়ে গেলুম, এটাকে কি বলবেন আপনি? কপাল বলবেন না? আমরা ডেকেচি লরীটাকে? আপনিই এসে হাজির। দেকবেন, দিনটা আজ এরকমই যাবে। ঠিক সোমায় মতন সবকিচু হাজির পাবেন আজকে।'

'দেখা যাক।' সিগারেট ধরাল রানা। 'এবার ম্যাপটা বের করো দেখি। শহরে ঢোকার আগেই নেমে পড়তে হবে আমাদের। কোন্‌দিক থেকে কোনদিকে যাব আগে থেকে দেখে রাখা ভাল।'

ম্যাপটা খুলে পড়ুয়ার নিচে আঙুল রাখল রানা।

'এইখানটায় নেমে যাব আমরা ট্রাক থেকে। শহরে কড়া পাহারার ব্যবস্থা থাকবে। কাজেই আগে নামব। এই যে দেখছ, এটা হচ্ছে পাহাড়ী এলাকা। অ্যাবানোর দিকে রওনা হব আমরা। ওখান থেকে হেঁটে চলে যাব বারবানো। ওখান থেকে ভিনসেনযায় এসে বাস ধরব ব্রেসিয়ার উদ্দেশে। ব্রেসিয়ায় পৌঁছতে পারলে কোন কৌশলে মিলানো পৌঁছানো অসম্ভব হবে না।'

'তারপরেই পেলেনে উটব?'

'সেই চেষ্টাই করব, তবে আগে থেকে বলা যায় না কিছুই। আমাদের আটকাবার সব ব্যবস্থাই করবে ওরা। যে-কোন মুহূর্তে প্ল্যান বদলাতে হতে পারে। আপাতত এই ঠিক থাকল, তারপর যেমন সমস্যা আসবে তার তেমন সমাধান বের করে নেব আমরা চলতে চলতে। আগে থেকে সব সমস্যার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে লাভ নেই।'

আধঘণ্টা বাঁধা-কপি ঝুড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দুলল ওরা ট্রাকের দোলায়। ট্রাকের গতি আঁচ করে নিয়ে মনে মনে অংক কষে বের করল রানা পড়ুয়া পৌঁছতে আর বড়জোর মিনিট দশেক আছে। সাবধানে ঝুড়ি সরিয়ে পথ করে চলে এল ওরা ট্রাকের পিছনে।

চারপাশে একবার চোখ বুলিয়েই মনটা দমে গেল রানার। সমতল খোলা জায়গা। দূরে দেখা যাচ্ছে মাঠে কাজ করছে কয়েকজন কৃষক।

'এখেনে নামলে এস্টেট ধরা পড়ে যাব, স্যার,' বলল গিলটি মিয়া। 'নিয়ন সাইনবোডের মত দেকা যাবে আমাদের তিন মাইল দূর থেকেও।'

'এছাড়া আর কোন উপায় নেই এখন।'

'তা ঠিক। শহরে ঢুঁকলেই ক্যাঁক করে ধরে নেবে শালারা।'

হাসল গিলটি মিয়া, 'বহুদিন এরকম চোরের মতন পালিয়ে বেড়াইনি, স্যার। বেশ মজাই লাগচে কিন্তু! আপনি সাতে আচেন বলে অত ভয় লাগছে না। তা চলুন, হাঁ করে কি ভাবচেন, নেমে পড়া যাক!'

'দূরে ওই যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওই পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছতে পারলে আপাতত সমস্যার শেষ। চলো। আমি রেডি বললেই লাফ দেবে।

টেইলবোর্ড ধরে ঝুলে পড়ল দু'জন। নিচ দিয়ে সড়সড় সরে যাচ্ছে রাস্তা দ্রুতবেগে।

'রেডি!'

একসাথে লাফ দিল দু'জন। কয়েক পা দৌড়ে ঠিক করে নিল ভারসাম্য, তারপর সাঁৎ করে সেঁটে গেল রাস্তার পাশে দেয়ালের গায়ে। আড়াল হয়ে গেল মাঠে কর্মরত লোকগুলো।

চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গিলটি মিয়া বলল, 'ওদের চোকে ফাঁকি দিয়ে পাহাড়ে পৌঁচানো যাবে না।'

'ওই পাহাড়ে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে বলে মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দেকতে তো কাচেই মনে হয়, স্যার। কিন্তুক আমার মনে হয়, এই মাট-ঘাট পেরিয়ে ওখেনে পৌঁচতে একটি ঘণ্টা সোমায় তো লাগবেই।' খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি গাল চুলকাল গিলটি মিয়া! 'ওই গোলাঘরে দিনটা থেকে গেলেই বোধায় ভাল করতুম, স্যার।'

'ওই কৃষকগুলো ছাড়া আর কেউ নেই আশেপাশে। ওরা আমাদের নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে কেন?' ঘড়ি দেখল রানা। সোয়া নয়টা। 'তিরিশ মাইল সরে এসেছি আমরা। কম কথা নয়। চলো, অনুশোচনা না করে এগোনো যাক।'

দেয়াল টপকে মাঠে নামল ওরা। এগোল পাহাড় লক্ষ্য করে।

অসমান জমিতে হাঁটার গতি বাড়ানো যাচ্ছে না। বার বার ঘাড় কাত করে দেখছে ওরা কর্মরত কৃষকদের। পাঁচ-ছয়শো গজ দূরে কাজ করছে ওরা। ব্যস্ত হয়ে আছে কাজে, এদিকে চাইছে না কেউ। চারজন বিট তুলছে খেত থেকে। একজন কাস্তে দিয়ে ঘ্যাচ করে কাটছে বিটের সবুজ মাথা। অপর একজন সাজিয়ে রাখছে একখানা তিন চাকার ঠেলাগাড়িতে।

হাঁটু সমান উঁচু সবুজ ঘাস মাড়িয়ে এগিয়ে চলল ওরা। মাইল দু'য়েক গিয়ে ক্রমে ঢালু হয়ে গেছে জমিটা। এই ঢালের শেষ থেকে শুরু হয়েছে প্রথম পাহাড়। কয়েকটা ছোট ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে পারলে পৌঁছানো যাবে বড় পাহাড়ের গায়ে। তারপর শুরু হবে খাড়াই উতরাই ভেঙে শুধু হাঁটা আর হাঁটা।

লম্বা ঘাসের মাঠ অর্ধেক পেরোতেই দূর থেকে ভেসে এল একটা চিৎকার-ধ্বনি।

'এই সেরেচে, স্যার!'

'সরাসরি ওদের দিকে চেয়ো না!' ধমক দিল রানা। 'ডাকুক। শুনতে পাচ্ছি না আমরা।'

কৃষকদের ছাড়িয়ে মাত্র একশো গজ এগিয়েছে ওরা পাহাড়ের দিকে এমনি সময়ে দেখে ফেলেছে ওদের কেউ। তবে ওদের থেকে পাঁচ-ছয়শো গজ ডাইনে সোজা পাহাড়ের দিকে হাঁটছে রানা ও গিলটি মিয়া, ধরে ফেলা সহজ হবে না। আর একটু জোরে পা চালাল রানা।

আড়চোখে দেখল রানা তিনজন কৃষক হাত নেড়ে ডাকছে ওদের।

'দৌড় দেব, স্যার?'

'পা চালাও, গিলটি মিয়া। ওরা দৌড় দিলে আমরা দৌড়াব, তার আগে নয়।'

'কিন্তুক ডাকচে কেন শালারা? আমরা যা-মন তাই করচি,

ওদের কি?'

'মনে হয় ওদের খবর দিয়ে রেখেছে পুলিস কিংবা কোসা নোস্ট্রা।'

আবার একবার আড়চোখে ওদের দিকে চেয়েই থমকে দাঁড়াল রানা। একজন লোক তীর বেগে ছুটছে একটা ফার্মহাউসের দিকে। বাকি পাঁচজন এগোচ্ছে ওদের দিকে কোণা-কোণি ভাবে। প্রমাদ গুনল রানা। চট করে ফিরল গিলটি মিয়ার দিকে।

'না-হে, আর ভদ্রতা করে লাভ নেই। এসো ওদের দেখিয়ে দিই বাঙালী লৌড় কাকে বলে।'

ছুটল দু'জন। গিলটি মিয়াকে পাঁই পাঁই করে ছুটতে দেখে হেসে ফেলল রানা।

'অত জোরে না। আরও দু'মাইল যেতে হবে আমাদের দৌড়ে। দম পাবে না শেষে।'

মাঝারি গতিতে এগিয়ে চলল দু'জন পাহাড়ের দিকে। ওই পাঁচজনও দৌড়াতে শুরু করেছে। জনা তিনেক খুব জোরে দৌড়াচ্ছে, রানা বুঝতে পারল বড়জোর পাঁচশো গজ দৌড়াবে ওরা ওই গতিতে, তারপর শুয়ে পড়বে চিৎ হয়ে। ঢালের কাছাকাছি দৌড়ের গতি আর একটু বাড়িয়ে দিল রানা। পাহাড় আরও দেড় মাইল।

পিছন ফিরে দেখল রানা, প্রায় দু'শো গজের মধ্যে এসে গিয়েছিল তিনজন, এখন পিছিয়ে যাচ্ছে আবার। বেশ অনেকখানি পিছনে আরও চারজন লোককে দেখতে পেল রানা। একজনের মাথায় কৃষকদের মাথাল, বাকি তিনজনের মাথায় হ্যাট। প্রাণপণে ছুটছে ওরা।

দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছল ওরা পাহাড়ের গায়ের কাছে। একটু হাঁপ ধরেছে দেখে মনে মনে স্থির করল রানা এবার ঢাকায় ফিরে স্কিপিং-এর মাত্রা বাড়িয়ে দেবে। পাঁচ ফুট উঁচু একটা

দেয়াল ডিঙিয়ে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় পড়ল ওরা। রাস্তা পেরিয়ে আবার একটা দেয়াল। সেটা পেরিয়ে উঠতে শুরু করল ওরা পাহাড়ে।

পিছনের চারজন ধরে ফেলেছে সামনের পাঁচজনকে। বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে এগোচ্ছে ওরা।

একই গতিতে পাহাড়ে উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছে কিন্তু গতি কমাল না রানা। দশ মিনিট পর পাহাড়ের মাথায় উঠে থেমে দাঁড়িয়ে চাইল পিছন ফিরে। বেশ জোরে হাঁপাচ্ছে ওরা এখন।

তিনজন এখনও দৌড়াচ্ছে ঢালু মাঠে, জনা চারেক দেয়াল টপকাচ্ছে, আর দু'জন উঠতে শুরু করেছে পাহাড় বেয়ে। হাঁপাচ্ছে হাপরের মত।

প্রায় দৌড়ে নামতে শুরু করল ওরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। অনেকখানি নেমে আসবার পর আরেকটা দেয়াল পাওয়া গেল সামনে। সেটা টপকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

'রেলওয়ে! এটার কথা খেয়াল ছিল না আমার!' বলল রানা।

আর একটু নেমে রেল লাইন দেখতে পেল ওরা। পাহাড়ের খানিকটা অংশ প্রায় খাড়াভাবে কেটে বসানো হয়েছে রেল লাইন।

হেসে উঠল গিলটি মিয়া। চট করে চাইল রানা ওর দিকে। কান খাড়া করে কি যেন শোনার চেষ্টা করছিল গিলটি মিয়া। ঘাড় সোজা করে চাইল রানার দিকে।

'এই দেকুন, স্যার, বলেছিলাম না দিনটা ভাল যাবে! কপাল আর কাকে বলে!'

কি ব্যাপারে কথা বলছে সেটা আর জিজ্ঞেস করতে হলো না রানাকে, গিলটি মিয়া থামতেই অস্পষ্টভাবে কানে এল ট্রেনের শব্দ। হাসি ফুটে উঠল রানার মুখে। ভুরু কপালে তুলে মাথাটা ডানদিকে কাত করল গিলটি মিয়া। ভাবটা- এই দেখুন!

আছড়ে-পাছড়ে দশ ফুট প্রায়-খাড়া পাহাড় বেয়ে নেমে এল

ওরা নিচে। রেল লাইনের পাশ দিয়ে দৌড় দিল গজ-পঞ্চাশেক দূরে ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করবে বলে। ঝোপের আড়ালে পৌঁছবার সাথে সাথেই এঞ্জিনের নাকটা দেখতে পেল রানা। মোড় ঘুরে বেরিয়ে আসছে পাহাড়ের আড়াল থেকে।

মস্ত লম্বা এক মালগাড়ি। ওয়াগনের পর ওয়াগন- যেন শেষ নেই। টেনে নিয়ে এগোতে গিয়ে এঞ্জিনের জিভ বেরিয়ে যাওয়ার দশা। বড়জোর পনেরো কি ষোলো মাইল স্পীডে পার হয়ে গেল এঞ্জিনটা রানাদের লুকিয়ে থাকা ঝোপের পাশ দিয়ে। পরিষ্কার দেখা গেল ড্রাইভার ও ফায়ারম্যানকে। গিলটি মিয়ার কনুই ধরে টান দিল রানা। বেরিয়ে গেল আড়াল থেকে।

প্রথম দশ বারোটা বন্ধ ওয়াগন পেরিয়ে যেতে দিল ওরা। তারপরই এল গোটা কয়েক ছাত খোলা নিচু ওয়াগন, একটা করে হলুদ পেইন্ট করা ঝকঝকে ট্রাক্টর বসানো আছে প্রত্যেকটায়। ছ'সাত গজ দৌড়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ওরা দ্বিতীয় খোলা ওয়াগনে।

'লুকিয়ে পড়ো, গিলটি মিয়া।' বলেই এক গড়ান দিয়ে ট্রাক্টরের আড়ালে চলে গেল রানা।

গিলটি মিয়াও এল পিছু পিছু।

খট্ খট্ খটাখট, খট্ খট্ খটাখট- এগিয়ে চলল মালগাড়ি। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর ট্রাক্টরের আড়াল থেকে দেখতে পেল রানা, পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে ট্রেনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে একজন লোক আরেকজনকে। মোড় ঘুরে আড়াল হয়ে গেল ট্রেনটা, দেখা যাচ্ছে না ওদের। উঠে বসল রানা।

'ওরা বুঝে নেবে আমরা পাড়ি জমিয়েছি এই ট্রেনে করেই। কিছু না, সামনের স্টেশনে শুধু একটা ফোন করে দিলেই হাতকড়া লাগিয়ে দেবে রেলওয়ে পুলিস।'

'আগে হাতের কাচে টেলিফোন পেতে হবে না ওদের?'

নিশ্চিন্ত মনে রাকস্যাক খুলে খাবার বের করতে শুরু করেছে গিলটি মিয়া।

'পরের তিনজন পুলিসের লোক হলে আর ফোন পর্যন্ত পৌঁছতে হবে না, গাড়িতে পৌঁছে ওয়্যারলেসে খবর দিলেই চলবে। যাই হোক, আগে খেয়ে নেয়া যাক, তারপর ভেবে বের করা যাবে কি করা যায়।'

আধ ডজন করে স্যাণ্ডউইচ, দুটো করে আপেল, আর সামান্য কিছু আঙ্গুর দিয়ে নাস্তা সারল ওরা।

আউন্স দু'য়েক ব্র্যাণ্ডি ঢেলে নিল রানা ফ্লাস্কের মুখে। গিলটি মিয়া পানি খেল শুধু, এসব খেলে নাকি বমি আসে ওর। ম্যাপটা বিছিয়ে নিয়ে তার উপর ঝুঁকে পড়ল রানা।

'এহ্-হে! দশ মাইল পরেই ক্যাসেলফ্রাংকো স্টেশন,' বলল রানা। 'দাঁড়াও, এই যে আরেকটা লাইন দেখা যাচ্ছে, ক্যাসেলফ্রাংকো ছুঁয়ে চলে গেছে ভিন্‌সেন্‌যা। ওই ট্রেনে একটু জায়গা করে নিতে পারলে বোঝা যাবে সত্যিই আজ কপালটা খুলে গেছে।'

'শিম্পাঞ্জী না কি যেন বললেন, ওখানে গিয়ে কি করব?'

'সারাদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকব, তারপর সন্ধের পর একটা বাসে উঠে রওনা হয়ে যাব ভেরোনার পথে।'

'তার মানে আর হাঁটতে হচ্ছে না। ওফ্, বাঁচালেন, স্যার। আবার যদি হাঁটতে বলতেন, তাহলেই কম্মো কাবার হয়ে গিয়েছিল আমার।'

'কিছুই বলা যায় না, গিলটি মিয়া। অত খুশি হয়ো না। অবস্থা খারাপ দেখলে আবার পাহাড়ী পথ ধরব আমরা।'

*

নীল আর ঘিয়ে রঙের মস্ত সি.আই.টি. বাসটা থেমে দাঁড়াল বাস স্টপেজে। দশ-বারোজন যাত্রী বসে আছে ভিতরে, আরও সাত-

আটজন নারী-পুরুষ বাস-শেল্টার ছেড়ে এগোল বাসের দিকে। নামল না কেউ। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রত্যেকটা মুখ পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল রানা গিলটি মিয়ার পাঁজরে।

উঠে পড়ল ওরা বাসে। ভেরোনার টিকেট কাটল রানা। এগিয়ে গিয়ে একেবারে ড্রাইভারের কাছাকাছি একটা সীটে বসে পড়ল দু'জন রাকস্যাক দুটো লাগেজ র‍্যাকে গুঁজে দিয়ে।

বাসটা ছেড়ে দিতেই বিরাট একটা হাঁপ ছেড়ে রানার দিকে ফিরল গিলটি মিয়া। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'ভাগ্যদেবি ছাড়েনি আমাদের, স্যার, একোনো আচে কাঁদের ওপর।'

বেলা একটা দেড়টার দিকে ভিন্‌সেন্‌যায় পৌঁছে গেছে ওরা। সারাটা দিন কাটিয়েছে একটা সিনেমা হলে পর পর তিনটে ছবি দেখে। সন্ধে একটু ঘন হয়ে আসতেই বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে এই বাস-স্ট্যাণ্ডে।

'ভেরোনায় পৌঁছে একটা গাড়ি চুরির চেষ্টা করতে হবে,' বলল রানা। 'ভাড়া নিতে গেলেই ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। রাতারাতি যদি ব্রেসিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারি, তাহলে বুঝব সত্যিই কাজের কাজ হলো।'

'মিলানো পর্যন্ত সেই গাড়িতে গেলে ক্ষতি কি?' জিজ্ঞেস করল গিলটি মিয়া।

'অটোস্ট্রাডা পেরোনো মুশকিল হবে।'

'সেটা আবার কি?'

'ব্রেসিয়া থেকে মিলানো পর্যন্ত মোটরের রাস্তাকে অটোস্ট্রাডা বলে। টিকেট কাটতে হয় ওই রাস্তা ব্যবহার করতে হলে। দু'মাথায় পুলিসের চেক পোস্ট আছে। ধরা পড়ে যাব।'

'কোনও লরীর পেচনে উটে বসলেই হয়।'

'আমাদের খোঁজে আছে ওরা,' বলল রানা। 'সার্চ করতে পারে।'

‘তাহালে অন্য কোন রাস্তায় গেলেই হয়। আর রাস্তা নেই?’

‘আগে গাড়ি তো একটা সংগ্রহ করি, তারপর দেখা যাবে কি করা যায়।’

আটটা চল্লিশে থামল বাস ট্যাভারনিল বাস-স্টপেজে। গোলমালের জন্য মনে মনে তৈরি ছিল ওরা, কিন্তু এতই আকস্মিকভাবে ঘটল ব্যাপারটা যে রীতিমত চমকে উঠল দু'জন।

বাস-স্টপেজে আলো ছিল না, কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে বাসের ভিতরের আলোয় নিজেরই ছায়া দেখতে পাচ্ছিল রানা। বাইরেটা অন্ধকার।

দরজা খুলে গেল, ক্র্যাশ-হেলমেট পরা একজন মোটরসাইকেল সার্জেন্ট দাঁড়াল সেখানে এসে। পিঠে ঝুলানো অটোমেটিক কারবাইন, ডান হাতটা ওয়েইস্ট-হোলস্টারে রাখা রিভলভারের বাঁটের উপর। মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল গিলটি মিয়ার মুখটা।

প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জারের মুখের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে স্থির হলো সার্জেন্টের চোখ দুটো রানার মুখে এসে। তারপর দেখল গিলটি মিয়াকে।

‘এই সেরেচে!’ ঠোঁট না নড়িয়ে বলল গিলটি মিয়া।

‘বোঝা যাচ্ছে, কপালটা খুব ভাল আজ!’ টিটকারির সুরে বলল রানা।

‘দিনটা ভাল যাবে বলেচি, স্যার,’ রেগে গেল গিলটি মিয়া। ‘রাতের কতা তো বলিনি!’

‘আমি বলছি। রাতটাও ভাল যাবে। তুমি শুধু আমার ইঙ্গিতের অপেক্ষায় থেকো।’

‘আপনারা দয়া করে বাইরে আসুন,’ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল সার্জেন্ট।

বোকার মত চেয়ে রইল রানা ওর দিকে।

‘আমাকে কিছু বলছেন?’

‘আপনাদের দু'জনকে। একটু বাইরে আসুন, সিনর।’

‘কেন? কি ব্যাপার!’ যেন আকাশ থেকে পড়ল রানা।

আর সব প্যাসেঞ্জার হাঁ করে চেয়ে আছে ওদের দিকে। ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে সার্জেন্টকে, চোখে-মুখে অস্বস্তি। ওর বাসের ভিতর কোন গোলমাল হোক সেটা ও চায় না।

‘আপনাদের কাগজপত্র দেখতে হবে,’ বলল ধৈর্যের প্রতিমূর্তি সার্জেন্ট। ‘নেমে আসুন।’

হতাশ ও বিরক্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, উঠে দাঁড়িয়ে রাকস্যাকটা নামাল, ওটা পরতে পরতে বলল, ‘তোমারটা হাতেই রাখো, গিলটি মিয়া। এই ব্যাটাকে কাবু করতে হতে পারে। তৈরি থেকো।’

বাস ড্রাইভার চিৎকার করে প্রশ্ন করল, ‘কত দেরি হবে আপনাদের? এমনিতেই লেট হয়ে গেছি।’

‘এদের জন্যে অপেক্ষা করবার দরকার নেই,’ বলল সার্জেন্ট। ‘তুমি রওনা হতে পারো।’ কথাটা বলেই রাস্তায় নেমে দাঁড়াল সে, রানাকে উদ্দেশ করে বলল, ‘জলদি!’

বুঝতে কিছুই বাকি রইল না রানার। গিলটি মিয়ার দিকে চেয়ে হাসল অভয়-হাসি। এগোল দরজার দিকে।

রাস্তায় নেমে কালো হয়ে গেল গিলটি মিয়ার মুখ। আরও দু'জন সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে। একজনের হাতে কারবাইন।

‘এই সেরেচে! এরা দেকচি তিনজন!’

সাত

ছেড়ে দিল বাস। চলে গেল মাটি কাঁপিয়ে।

প্রথম সার্জেন্টটা ঘাড় কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মোটর

সাইকেলের হেডলাইট জ্বেলে দিল। হাত বাড়াল।

'পাসপোর্ট প্লীজ।'

ভিতরের পকেটে হাত ঢোকাল রানা। পিস্তলের বাঁটটা ঠেকল হাতে। লক্ষ করল দ্বিতীয় সার্জেন্ট উঁচু করল কারবাইনটা। সোজা রানার বুকের দিকে লক্ষ্য করে ধরা ওটা। পাসপোর্টটা বের করে আনল রানা, এগিয়ে দিল বাড়িয়ে রাখা হাতে।

তিন সেকেণ্ড পরীক্ষা করেই মাথা ঝাঁকাল সার্জেন্ট। গিলটি মিয়ার দিকে হাত বাড়াল ওর পাসপোর্টের জন্যে।

'তোমার পাসপোর্ট বের করে দাও,' বলল রানা।

বিনা বাক্য ব্যয়ে পাসপোর্ট বের করে দিল গিলটি মিয়া।

'আপনাদের দু'জনকেই অ্যারেস্ট করা হলো,' গিলটি মিয়ার পাসপোর্টে চোখ বুলিয়ে বলল প্রথম সার্জেন্ট। 'আমাদের সাথে যেতে হবে আপনাদের।'

'আমাদের বিরুদ্ধে চার্জটা কি?' ডান হাতে গলার কাছে চুলকাল রানা।

অবাক হলো গিলটি মিয়া। তিনজন দেখে গোলমাল করার সম্ভাবনাটা দূর করে দিয়েছিল ও মন থেকে। রানাকে গলা চুলকাতে দেখে চমকে উঠল সে ভিতর ভিতর। এটা রানার সিগন্যাল। জানে সে। অবাক হলো, কিন্তু এক সেকেণ্ড দেরি করল না সে সিদ্ধান্ত নিতে। কারবাইন ধরা সার্জেন্টকেই পছন্দ হলো ওর।

রাকস্যাকের স্ট্র্যাপ ধরে ওটাকে কাঁধের উপর দিয়ে পিঠে রেখেছিল গিলটি মিয়া, ধাঁই করে মারল ওটা দিয়ে কারবাইনধারীর মুখে। ব্র্যাণ্ডির বোতলের নিচের দিকটা দড়াম করে পড়ল লোকটার নাকের উপর। তীব্র যন্ত্রণায় দিশেহারা লোকটা কারবাইন ফেলে দিয়ে বসে পড়ল মাটিতে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে।

বিদ্যুৎবেগে রিভলভারের বাঁটে হাত চলে গেল বাকি দু'জনের, কিন্তু থমকে গেল ওরা। রানার হাতে চকচক করছে ওর ওয়ালথার পি.পি. কে।

'নড়েচ কি মরেচ!' গিলটি মিয়াও বের করে ফেলেছে ওর ভয়ঙ্কর-দর্শন খেলনা-পিস্তল।

বাংলা কথা বুঝল না ওরা, কিন্তু বক্তব্য বুঝতে পারল পরিষ্কার। পাথর হয়ে জমে গেল একেবারে।

কারবাইনটা মাটি থেকে তুলে নিল গিলটি মিয়া বাম হাতে। রেখে এল কয়েক হাত তফাতে। একে একে সব ক'টা কারবাইন ও রিভলভারই চলে গেল সেখানে।

'পিছন ফিরে দাঁড়াও!' হুকুম করল রানা। ওরা পিছু ফিরতেই ইটালিয়ান ভাসায় হুকুম করল গিলটি মিয়াকে, এদের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকো। যে একটু নড়বে তাকেই শেষ করে দেবে।'

দ্রুতহাতে দুটো মোটর সাইকেল থেকে স্পার্কিং প্লাগ খুলে পকেটে রাখল রানা। তৃতীয়টার পেট্রল ট্যাংক পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে স্টার্ট দেয়া অবস্থায় রেখে অটোমেটিক কারবাইন থেকে ম্যাগাজিনগুলো খুলে ছুঁড়ে দিল অন্ধকারে, তিনটে তিন দিকে। রিভলভারগুলোও গেল ওগুলোর পিছু পিছু। তারপর এগিয়ে এসে তর্জনী দিয়ে জোরে একটা খোঁচা দিল প্রথম সার্জেন্টের পাঁজরে। চমকে উঠল লোকটা।

'পাসপোর্ট!'

পিছন ফিরে না চেয়ে পাসপোর্ট দুটো ফেরত দিল লোকটা। চাপা গলায় বলল, 'ধরা পড়তেই হবে তোমাদের। কতদূর যাবে?'

গর্জন করে উঠল রানাণ্ড 'চোপরাও ইস্টুপিড, পিটিয়ে তোমায় করব ঢিট!'

'কি বললেন?'

'ও তোমরা বুঝবে না, সুকুমার রায়ের ছড়া। এখন এই রাস্তা

ধরে সিধে হাঁটতে শুরু করো। থামলেই গুলি খাবে। কুইক মার্চ!'

বুটের শব্দ তুলে এগোল ওরা তিনজন অন্ধকার রাস্তা ধরে।

একলাফে উঠে বসল রানা চালু মোটর সাইকেলের উপর। গিলটি মিয়া আছড়ে-পাছড়ে উঠে পড়ল পিছনে। রানার কানের কাছে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, 'বলেছিলাম না, দিনটা ভাল যাবে?'

তীরবেগে ছুটল ওরা ভেরোনার পথে।

বিশ মিনিট একটানা চলবার পর মোটর সাইকেলের গতি কিছুটা কমাল রানা। ততক্ষণে বাসকে ছাড়িয়ে বহুদূর চলে এসেছে ওরা।

'আবার থামচেন কেন, স্যার?'

'আর বেশিদূর এটাতে করে যাওয়া ঠিক হবে না। এতক্ষণে সারা ইটালির টহল-পুলিসকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। ঢিল খাওয়া ভীমরুলের মত ছুটছে ওরা চারদিকে। ডাইনে মোড় নেব এবার আমরা।'

'তারপর?'

'তারপর আবার পাহাড়। আবার হাঁটা। ভাবছি এবার সোজা সুইটজারল্যাণ্ডের বর্ডারের দিকে হাঁটা ধরব।' ডানদিকে একটা রাস্তা পেয়ে মোড় নিল রানা। 'মোটর সাইকেলটা ভালমত লুকিয়ে রাখতে পারলে ওরা মনে করতে পারে আমরা ভেরোনায় চলে গিয়েছি।'

রাস্তাটা রাঙামাটির রাস্তার মত উঁচু-নিচু। রানা অনুভব করতে পারল, ক্রমে উপর দিকে উঠছে ওরা। ফাইভ হাণ্ডরেড সি.সি.হারলি ডেভিডসনের পক্ষে এই ঊর্ধ্বগতি কিছুই নয়। স্বচ্ছন্দ গতিতে উঠে যাচ্ছে সড়সড় করে। পথটা ক্রমে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে উঠছে, কিন্তু তাতে তেমন কোন অসুবিধে ছিল না, ঝাঁকি খেতে খেতে বহুদূর চলে যেতে পারত ওরা, কিন্তু তৃতীয় পাহাড়টার মাথায় উঠে বহুদূরে একটা গ্রাম দেখতে পেল রানা।

থেমে দাঁড়াল। অফ করে দিল সুইচ।

'ওই গ্রামের পাশ দিয়ে এটা নিয়ে গেলে শব্দ শুনতে পাবে ওরা। পুলিস জিজ্ঞাসা করলে বলে দেবে। কাজেই আরামের ভ্রমণ এইখানেই শেষ। নেমে পড়ো, গিলটি মিয়া।'

মোটর সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে রাস্তা থেকে বেশ অনেকটা দূরে সরে গেল রানা। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর একটা বড়সড় ঝোপ পাওয়া গেল। যথেষ্ট সময় ব্যয় করে খুবই যত্নের সাথে লুকিয়ে রাখল ওরা মোটর সাইকেলটাকে। এর উপর নির্ভর করছে অনেকখানি। এটা পেলেই বুঝে নেবে ওরা কোন্‌দিকে গেছে পলাতক আসামী। বার-কয়েক চারপাশ থেকে টর্চ ফেলে দেখে নিশ্চিন্ত হলো রানা। আকাশ থেকে দেখা যাবে, কিন্তু পায়ে হেঁটে এর দু'হাত তফাৎ দিয়ে চলে যাবে যে কেউ, নজরে পড়বে না মোটর সাইকেল।

সন্তুষ্ট চিত্তে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল রানা। পিছনে বিমর্ষবদন গিলটি মিয়া।

'কদ্দূর হাঁটতে হবে, স্যার?' জিজ্ঞেস করল গিলটি মিয়া খানিক উসখুস করে।

'দূর খুব বেশি না,' হাসল রানা। 'সোজাসুজি যেতে পারলে বড় জোর পঞ্চাশ-ষাট মাইল। কিন্তু এঁকেবেঁকে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে যেতে হবে আমাদের। পাঁচ-ছয় দিন লাগবে বর্ডারে পৌঁছতে। টিরানোতে একবার পৌঁছতে পারলে সোজা জুরিখ চলে যাব আমরা। সেখান থেকে প্লেন পেতে অসুবিধে হবে না।'

'আমরা বর্ডার ক্রস করলেই এরা সব হাত গুটিয়ে নিয়ে হাল ছেড়ে দেবে?'

'সিলভিও ছাড়বে না। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে সুইস পুলিসের কোন অভিযোগ নেই, অন্তত ওদিক থেকে বাঁচা যাবে। দুই তরফের তাড়া থেকে বাঁচতে পারলে আমাদের পক্ষে আত্মরক্ষা

করা সহজ হবে।'

গত কালকের মরা চাঁদটায় একটু প্রাণ এসেছে আজ। বেশ আলো দিচ্ছে। পরিষ্কার স্বচ্ছ নীল আকাশ। অসংখ্য তারা জ্বলজ্বল করছে সারা আকাশ জুড়ে। চাঁদ না থাকলেও পথ চলতে অসুবিধে হত না।

নিঃশব্দে হেঁটে চলল ওরা। কখনও খাড়াই, কখনও উৎরাই। পথের পাশে গ্রামগুলো ঘুমিয়ে আছে নিঝুম হয়ে। ছায়ার মত হেঁটে চলে গেল ওরা পাশ দিয়ে। টের পেল না কেউ।

পাঁচ ঘণ্টা সমান গতিতে একটানা হাঁটবার পর থামল রানা একটা পাহাড়ের চূড়ায়।

'কষ্ট হচ্ছে, গিলটি মিয়া?'

'কি যে বলেন, স্যার!' অমায়িক হাসি হাসল গিলটি মিয়া। 'আমি আরও ভাবছিলুম আপনার কতা। আমার পাকীর মত শরীল, ওজনই বা কতটুকু যে টানতে কষ্ট হবে?' একটু ইতস্তত করে বলল, 'তবে হ্যাঁ, খিদে লেগেছে খুব জোর, এটুকু বলতে পারি। কিছু যদি মুকে দিতে বলেন, আপত্তি করব না।'

বসে পড়ল রানা। বেশ ক্লান্তি বোধ করছে সে। কিন্তু বেশিক্ষণ বিশ্রাম নেয়া যাবে না, রাত শেষ হবার আগেই ঢুকে যেতে হবে পাহাড়ী এলাকার একেবারে গভীর অঞ্চলে। কোনরকম ঝুঁকি নেয়া চলবে না আর।

খাওয়া সেরে দু'পেগ ব্র্যাণ্ডি ঢেলে নিয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ল রানা, সিগারেট ধরাল একটা। ফুরফুরে পাহাড়ী বাতাসে ঘুম এসে যাওয়ার জোগাড় হলো।

'উই যে দেকা যাচ্চে দূরে, স্যার, ওটা কি?'

'লেক গার্ডা। ওই লেকের পাশ দিয়ে গেছে টেস্ন্টো রোড। ওটা পেরিয়ে সোজা উত্তর-প মে হাঁটতে শুরু করব আমরা। অনেকগুলো ছোট-খাট পর্বত ডিঙাতে হবে আমাদের। রাস্তাঘাট

সুবিধের নয়। একেবারে বাজে। কষ্ট হবে খুব।'

'সেজন্যে পরোয়া করি না, স্যার। কষ্ট জীবনে কম করিনি। একেক দিন যে পিটুনি শুরু করত আপতাব দারোগা...উফ্! রাম পিটুনি। হেগে মুতে একাকার করে ফেলতুম। তবু স্যার স্বীকার যেতুম না চুরির মাল কোতায় রেকেচি। বলে দিলে যে ধরা পড়ে যায় আমারই কোন স্যাঙাৎ।' আবার জীবন-চরিত বর্ণনা করতে শুরু করেছে টের পেয়ে থেমে গেল গিলটি মিয়া। হাসল। 'কী সুন্দর সব দিশ্য দেকতে দেকতে চলেচি, স্যার। ভালই লাগচে। দেশ দেকা তো হচ্চে!'

হেসে উঠল রানা।

'তোমাকে সাথে না আনলে ভুলই করতাম। একা একা এত পথ চলতে খুবই খারাপ লাগত।' উঠে বসল রানা। অবশিষ্ট ব্র্যাণ্ডিটুকু গলায় ঢেলে নিয়ে ফ্লাস্কের মুখটা রেখে দিল যথাস্থানে। সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'চলো, আরও খানিকটা দেশ দেখা যাক।'

চলছে তো চলছেই।

বহু দূরে উঁচু পর্বতের চুড়োয় সূর্যের আলো দেখে বুঝল রানা সকাল হতে আর খুব বেশি দেরি নেই। আবার খুব বেশি তাড়াহুড়োও নেই। দু'ঘণ্টার আগে ভোর হবে না সমতল ভূমিতে। ভেরোনা টেস্ন্টো রোড পার হয়ে এসেছে ওরা বেশ কিছুক্ষণ হয়। খাড়াই-উৎরাই ভেঙে এগিয়ে চলেছে আরও, আরও অভ্যন্তরে।

বেলা সাড়ে নয়টা নাগাদ পর্বত ডিঙিয়ে উঠে এল সূর্য। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগল না। অবসন্ন পা টেনে টেনে আরও আধঘণ্টা চলার পর পর্বতমালার চতুর্থ সারির মাথায় উঠল ওরা।

'ব্যস! আর না।' থেমে দাঁড়াল রানা। 'লম্বা একটা ঘুম দিয়ে

উঠে তারপর রওনা হওয়া যাবে আবার।'

'ওহ্! কী সুন্দর!' পিছন ফিরে চেয়েই মুগ্ধ হয়ে গেল গিলটি মিয়া।

একটা ঘন ঝোপের ছায়ায় বসে পড়ল ওরা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে লেক গার্ডা। মনে হচ্ছে হলুদ রোদের চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে আছে বিশাল লেকটা। খেলনার মত দেখা যাচ্ছে দূরে দূরে কয়েকটা ফার্ম-হাউস, মাঠ, খেত-খামার। গরু চরে বেড়াচ্ছে মাঠে। মস্ত গাছগুলোকে মনে হচ্ছে ছয় ফুট উঁচু। সত্যিই অপূর্ব। হঠাৎ মনে হয় স্বপ্নের ঘোরে আছি।

রাকস্যাক থেকে দুটো চাদর বের করে বিছিয়ে ফেলল গিলটি মিয়া। রানা অনুভব করল ক্লান্তিতে অল্প অল্প কাঁপছে ওর হাত-পা। শোয়ার প্রায় সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ল দু'জন। কি যেন জিজ্ঞেস করেছিল গিলটি মিয়া ঘুমজড়িত কণ্ঠে, উত্তর দেয়া হয়নি, দিলেও সে শুনতে পেত কিনা সন্দেহ।

ঘণ্টা তিনেক নিশ্চিন্তে ঘুমানোর পরই বিচিত্র দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করল রানা। প্রথমে দেখল পা পিছলে বিরাট একটা খাদে পড়ে যাচ্ছে সে। পড়ছে তো পড়ছেই- বাঁচার কোন আশা নেই। হঠাৎ দেখল আশ্চর্য সুন্দর দুটো পাখা গজিয়েছে ওর পিঠে। খিলখিল করে হাসছে একটা মেয়ে। আরে, মেয়ে তো নয়, অপূর্ব সুন্দরী এক পরী। দু'জনে মিলে উড়তে শুরু করল ওরা, হাওয়ায় ভেসে নিঃশব্দে উড়ছে ওরা মেঘের পাশ দিয়ে। মেঘটা হঠাৎ একটা মৌচাক হয়ে গেল। তেড়ে আসছে অসংখ্য মৌমাছি। পালা, পালা, পালা! মেয়েটাকে আর দেখতে পেল না রানা। বোঁ বোঁ ছুটে আসছে খুদে খুদে খ্যাপা কীট। মৌমাছিগুলো হঠাৎ ভীমরুল হয়ে গেল। দ্বিগুণ বেগে আসছে এখন। এবার রীতিমত ভয় পেল রানা, জোরে জোরে পাখা নাড়তে শুরু করল। এমন সময় মটাশ করে ভেঙে গেল একটা ডানা। ভাঙা ডানাটা হাতে

নিয়ে ভীমরুল খেদাচ্ছে, আর এক ডানা ঝাপটাচ্ছে রানা। ডানায় গুলি খাওয়া শকুনের মত পাক খেতে খেতে নেমে আসছে নিচে। ক্রমে বাড়ছে পতনের বেগ। রানা বুঝতে পারল, স্বপ্ন দেখছে সে। প্রায় জেগে উঠে পাশ ফিরল। কিন্তু ভীমরুলের গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে সে এখনও।

হঠাৎ সচকিত হয়ে চোখ মেলল রানা। শব্দের উৎস আন্দাজ করে চাইল সেদিকে এবং সাথে সাথেই আড়ষ্ট হয়ে গেল। কয়েক মাইল দূরে প্রকাণ্ড গঙ্গা ফড়িংয়ের মত উড়ছে একটা হেলিকপ্টার।

'ও কিছু নয়, স্যার,' মৃদুকণ্ঠে বলল গিলটি মিয়া। 'একটা পেলেন। পোকা মারার ওষুদ ছিটাচ্চে বোধায়।'

'নোড়ো না, গিলটি মিয়া। চুপচাপ পড়ে থাকো যেমন আছ। না। তারচেয়ে ঢুকে পড়ো চাদরের তলায়। এদিকে যদি আসেও, দেখতে পাবে না আমাদের।'

'পুলিসের পেলেন বলে সন্দো করচেন?'

'মনে হয় সিলভিওর দলের। সরকারী হেলিকপ্টার নয়।'

কয়েক মাইল দূর দিয়ে চলে গেল হেলিকপ্টার, ছোট্ট একটা বিন্দুতে পরিণত হলো, তারপর আবার ফিরে আসতে শুরু করল। মাইলখানেক এগিয়ে এসেছে এবার।

'খুঁজচে আমাদের, স্যার!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল গিলটি মিয়ার। 'গরু খোঁজা করচে সারাটা এলাকা!'

রাকস্যাক থেকে শক্তিশালী বিনকিউলারটা বের করে চোখে লাগাল রানা। একলাফে অনেকটা সামনে চলে এল হেলিকপ্টার। হেলমেট মাথায় পাইলটকে দেখতে পেল রানা পরিষ্কার, কিন্তু অপর একজন লোক ওপাশের জানালা দিয়ে নিচের দিকে চেয়ে রয়েছে, তাকে ঠিকমত চিনতে পারল না। পিছন থেকে রিক্কির মত লাগল কিছুটা, তবে অন্য যে-কেউ হতে পারে। আর একটু এগিয়ে যেতেই দৃষ্টিপথের আড়াল হয়ে গেল লোকগুলো।

‘পুলিসের হেলিকপ্টার না ওটা। কোসা নোস্ট্রা খুঁজছে আমাদের।’ ঘোষণা করল রানা।

‘আমাদের কিচু করার আচে বলে তো মনে হচ্চে না, স্যার।’

রানা টের পেল, সত্যি করবার তেমন কিছুই নেই এখন ওদের। আরও মাইলখানেক কাছে সরে এল হেলিকপ্টার অমোঘ নিয়তির মত।

‘তা ঠিক,’ বলল রানা। ‘কিন্তু নড়াচড়া না করলে আমাদের খুঁজে বের করা সহজ হবে না। চাদর মুড়ি দিয়ে বিশেষ সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। এবার ওটা দূরে সরে গেলে আমরা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ব হামাগুড়ি দিয়ে।’

‘মনে হচ্চে ব্যাটারা পরিষ্কার জানে যে আমরা এইদিকেই কোথাউ নুকিয়ে আচি।’

‘আকাশ থেকে মোটর সাইকেলটা দেখতে পেয়েছে খুব সম্ভব,’ বলল রানা।

ধীরে ধীরে বহুদূরে একটা ছোট্ট বিন্দুতে পরিণত হলো হেলিকপ্টার। রাকস্যাক আর চাদর নিয়ে তিন ফুট উঁচু ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে সরে এল ওরা হামাগুড়ি দিয়ে। ঘন পাতা ছাউনি তৈরি করল ওদের শরীরের উপর। তবু গলা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিতে বলল রানা গিলটি মিয়াকে। পাতার ফাঁক দিয়ে নীল আকাশের দিকে চেয়ে উপর থেকে এই ঝোপটা কেমন দেখাবে কল্পনা করবার চেষ্টা করল রানা। কল্পনায় শুধু একরাশ ঝোপ-ঝাড় দেখা গেল, নিজেদের দেখতে পেল না সে। নিশ্চিন্ত মনে হাসল রানা।

কয়েক মিনিট পরই বাড়তে শুরু করল আওয়াজ। আসছে। ক্যাড়কেড়ে বিশ্রী শব্দটা কানে লাগছে। পাতার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল রানা ওটাকে। কাছেই একটা পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ওটা, মাত্র বিশ ফুট উঁচু দিয়ে। হঠাৎ নিরাপত্তা

সম্পর্কে অনি য়তা দেখা দিল রানার মনে। এই ঝোপের আড়ালে ওরা সত্যিই কি নিরাপদ? কিন্তু এখন আর এখান থেকে সরে যাওয়ার কোন উপায় নেই।

দুইশো গজ দূর দিয়ে উড়ে চলে গেল হেলিকপ্টার। পাখার বাতাসে রুক্ষ ঘাসগুলোকে শুয়ে পড়তে দেখল রানা। কটকট কটকট করতে করতে চলে গেল ওটা লেকের দিকে।

‘লেকের ওপর আর খুঁজবে না, এক্ষুণি ফিরে আসবে ওটা,’ বলল রানা। ‘এবার আমাদের মাথার ওপর দিয়ে যাবে। মড়ার মত পড়ে থাকো, গিলটি মিয়া।’

‘দেকে যদি ফেলেও, কি হবে?’ হঠাৎ বলে উঠল গিলটি মিয়া।

‘ওয়্যারলেসে খবর দিয়ে অন্যদের নিয়ে আসবে এখানে।’

‘ডাক দিলেই এখানে পৌঁচে যাওয়া কি অতই সহজ? আর ততক্ষণ আমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাব? ধরা অত সহজ হবে না, স্যার।’

‘একবার খুঁজে পেলে আর পিছু ছাড়বে না এরা, ধরা আমাদের পড়তেই হবে। প্রয়োজন হলে আরেকটা হেলিকপ্টারে করে লোক পাঠাবে সিলভিও। কিন্তু আর কথা নয়। এসে পড়েছে। সাবধান!’

ফিরে আসছে হেলিকপ্টারটা। সোজা এই পাহাড়ের মাথা লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে ওটা। খুব ধীরে। এ পাহাড়ের বড়জোর বিশ ফুট উপর দিয়ে উড়ে যাবে।

বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে রাস্তার ওপর দিন-দুপুরে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি ভাবতে যেমন লাগে সেইরকম একটা অনুভূতি হলো রানার মধ্যে। মনে হলো কিছুই আর অজ্ঞাত নেই পাইলটের কাছে। নিশ্চয়ই এই পাহাড়টাই ভালমত লক্ষ্য করে দেখছে এখন ও। হঠাৎ কেবিন-ডোরের সামনে দাঁড়ানো রিক্কিকে দেখতে

পেল রানা। সামনে ঝুঁকে নিচের দিকে চেয়ে রয়েছে সে।

ঠিক মাথার উপর এসে পড়ল হেলিকপ্টার। খুন করে ফেলে রাখা লাশের মত চুপচাপ শুয়ে আছে রানা ও গিলটি মিয়া চিৎ হয়ে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে সোজা উপর দিকে।

রোটর ব্লেডের ঝোড়ো হাওয়া এসে লাগল ঝোপের গায়ে। ফাঁক হয়ে গেল পাতার ছাউনি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে এ-ওর গায়ে লুটোপুটি খাচ্ছে ঝোপগুলো, এদিকে রানা ও গিলটি মিয়ার মাথার উপর খোলা আসমান।

রিক্কির দাগী মুখে বীভৎস নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল, পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। পরমুহূর্তে দেখতে পেল কি যেন দাঁত দিয়ে ছিঁড়ছে রিক্কি। মুখের কাছে ডান হাত।

'গ্রেনেড!' চিৎকার করে উঠল রানা। 'গ্রেনেড ফেলছে! সাবধান!'

বিদ্যুৎবেগে পিস্তল বের করল রানা। গুলি করল। কিন্তু ঠেকানো গেল না। দ্রুত নেমে আসছে গোলমত ভয়ঙ্কর বস্তুটা।

ঝলসে উঠল তীব্র আলো। সাথে সাথেই কানে তালা লাগানো প্রচণ্ড শব্দ। রানার মনে হলো দুলে উঠল গোটা পাহাড়। পরমুহূর্তে কি যেন ছুটে এসে লাগল কপালে। চোখের সামনে দেখতে দেখতে কালো হয়ে গেল নীল আকাশ।

আট

চোখ মেলল রানা।

প্রথমে কিছুক্ষণ কিছুই দেখতে পেল না সে, তারপর দেখতে

পেল গিলটি মিয়ার উদ্বিগ্ন ফ্যাকাসে মুখ। উপুড় হয়ে ঝুঁকে রয়েছে গিলটি মিয়া ওর উপর।

'আর কোথাউ লেগেচে, স্যার?' রানাকে চোখ মেলতে দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হলো সে।

নিজের অজান্তেই হাতটা চলে এল রানার কপালে। ভেজা! রক্ত! ধড়মড়িয়ে উঠে বসল রানা।

'নড়বেন না, স্যার!' বিচলিত হয়ে উঠল গিলটি মিয়া। 'আর কোথাউ লেগেচে?'

'না,' ধরা গলায় বলল রানা। 'কোন পাথরের টুকরো ছুটে এসে লেগেছিল মনে হচ্ছে।' হঠাৎ আকাশের দিকে চাইল। 'কোথায় গেল ওটা?'

'উই উদিক গিয়ে নেমে পড়েচে শালা। দেখাচ্চি। দাঁড়ান, আগে রক্ত পড়াটা বন্ধ করে নিই।'

রাকস্যাক থেকে ফার্স্ট-এইড কিট বের করল গিলটি মিয়া ব্যস্ত হাতে। পানির ফ্লাস্ক নিয়ে এল। কপালটা ধুয়ে পরিষ্কার করতেই সব পানি শেষ করে ফেলার উপক্রম করল গিলটি মিয়া। বারণ করল রানা।

'সব পানি শেষ কোরো না, গিলটি মিয়া। আমার তো ব্র্যাণ্ডি আছে। তুমি শেষে ছাতি ফেটে মরবে।'

'বেশি কতা বলবেন না, স্যার,' পুরো ডাক্তারী ভঙ্গি নিয়ে নিয়েছে গিলটি মিয়া। 'শেষ হয়ে গেলে কোন পাহাড়ী ঝর্ণা থেকে ভরে লিতে কতক্ষুণ?'

'পথে কোন ঝর্ণা না পড়লে?'

'আবার কতা বলে!' রেগে উঠল গিলটি মিয়া। সবটুকু পানি দিয়ে রানার কপাল ধুয়ে ফার্স্ট-এইড কিট হাতড়াচ্ছে সে। 'কি আচে? দু'পাঁচদিন পানি না খেলে মরে না মানুষ। নিন, এবার চোখ বুজে দাঁতে দাঁত কেমড়ে ধরুন।'

দুই মিনিট পর রানাকে ছেড়ে দিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে গম্ভীর মুখে পরীক্ষা করল সে নিজের হাতের কাজ, তারপর হাসল সন্তুষ্ট চিত্তে।

‘লেখাপড়া করলে বিরাট সিবিল সার্জেন্ট হতে পারতুম, স্যার। হাতের কাজে খুঁত পাবেন না কোন।’

ইলাস্টোপ্লাস্ট টিপে ব্যথার পরিমাণ অনুভব করবার চেষ্টা করল রানা, তারপর বলল, ‘ভেরি গুড। এবার বলো দেখি কি হলো ব্যাপারটা? ভাগল কেন ব্যাটারা?’

‘ভাগবে না মানে? না ভেগে উপায় আচে? ডাইভার ব্যাটা একা মানুষ, পেলেন চালাবে, না আক্রমণ করবে?’

‘রিক্‌কির কি হলো?’

‘ও ব্যাটা তো আপনার এক গুলিতেই শেষ। বোম ফেলার পরপরই ও-ও তো পড়েচে পেলেন থেকে। ভাগ্যিস আমার ঘাড়ে পড়েনি! পেলেনটা সরে গেচিল ততক্ষুণে। ওই দেকুন ঘাড় মটকে পড়ে আচে কি রকম।’

বিশ পঁচিশ ফুট নিচে ভাঙাচোরা বেকায়দা ভঙ্গিতে শুয়ে আছে রিক্‌কি। লাল হয়ে রয়েছে শার্টের বুক-পকেট। নিষ্প্রাণ খোলা চোখ চেয়ে আছে আকাশের দিকে নির্নিমেষে।

‘আর উই যে, ওখানে নেমেচে পেলেনটা। দেকতে পাচ্চেন না? আমার আঙুল সোজা তাকান। উ···ই যে!’

দেখতে পেল রানা। প্রায় আট-দশ মাইল দূরে একটা বিচ্ছিন্ন ফার্ম-হাউসের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রয়েছে হেলিকপ্টার। খুব সম্ভব ওখানেই আডিা গেড়েছে সিলভিও। খেলনার মত বাড়িটার সামনে মনে হচ্ছে কয়েকটা পিঁপড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

বিনকিউলারটা চোখে লাগাল রানা। এক লাফে অনেক কাছে চলে এল বাড়িটা। অ্যাডজাস্টিং নব ঘুরিয়ে পরিষ্কার করে নিল রানা দৃশ্যটা। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লুইসা

পিয়েত্রো। হেলিকপ্টারের দিকে চেয়ে রয়েছে সে। একটু পাশ ফিরে কপ্টারটার দিকে চাইল রানা। ওখানটায় বেশ ভিড়। হাত নেড়ে কি যেন বলছে হেলমেট পরা পাইলট। মাথা নাড়ল সিলভিও। গিয়ান এবং পপিনিকে চিনতে পারল রানা ভিড়ের মধ্যে, বাকি সবাই অচেনা। কিছু একটা প্রশ্ন করল সিলভিও। আঙুল দিয়ে সোজা রানার দিকে দেখাল পাইলট, হেলমেটটা খুলে হাতে নিল, দুই হাত একত্র করে দ্রুত ফাঁক করল কথা বলতে বলতে। রানা বুঝল গ্রেনেডের বর্ণনা হচ্ছে।

আবার মাথা নাড়ল সিলভিও। তারপর ঝট করে ফিরল গীয়ানের দিকে। সংক্ষেপে কয়েকটা আদেশ দিল সে, একবার হাত তুলে দেখাল এই পাহাড়ের দিকে, তারপর ঘুরে হাঁটতে শুরু করল বাড়িটার দিকে। ওর পিছু পিছু পাইলটও চলল বাড়ির দিকে। ব্যস্ত হয়ে উঠল বাকি কয়জন। দু’জন ছুটে গেল ফার্ম-হাউসের পাশেই আর একটা ঘরের সামনে। দরজা দু’পাট হাঁ করে খুলে ঢুকে গেল ভিতরে। কয়েক সেকেণ্ড পর বেরিয়ে এল দুটো গাড়ি। টপাটপ উঠে পড়ল সাতজন, যে যেটায় পারল। সাঁ করে গেট দিয়ে বেরিয়ে এল গাড়ি দুটো, উঁচু-নিচু পথ পেরিয়ে উঠে এল বড় রাস্তায়, তারপর দ্রুতবেগে রওনা হলো এই পাহাড়ের উদ্দেশে।

‘এত কি দেকচেন, স্যার?’ জিজ্ঞেস করল গিলটি মিয়া।

‘রওনা হয়ে গেল ওরা।’ চামড়ার খোলের ভিতর রেখে দিল রানা বিনকিউলার। ঘণ্টা দু’য়েক লাগবে ওদের এখানে পৌঁছতে। চলো এগিয়ে থাকা যাক।’

‘কোতায়?’

‘আপাতত ওরা যেখানটায় গাড়ি রেখে হাঁটতে শুরু করবে সেইখানে পৌঁছতে হবে আমাদের।’

‘এই জকম নিয়ে পারবেন অতটা হাঁটতে?’

'পারতেই হবে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। ধরা পড়লে হাটুরে কিল খেয়ে মরতে হবে। নয়জন আসছে ওরা। চলো নামতে শুরু করি।'

পাহাড় থেকে নিচে নামতে লাগল দশ মিনিট। এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে জমির উপর দিয়ে এগোল ওরা পশ্চিম দিকে, ফার্ম-হাউসটা লক্ষ্য করে। মন্থর গতিতে এগোচ্ছে ওরা ঝোপ-ঝাড় আর পাথরের চাঁই এড়িয়ে। আধঘণ্টা একটানা হেঁটে টের পেল রানা কী অসাধ্য সাধনে লেগেছে সে। মাথাটা ঘুরছে। আর কতক্ষণ লাগবে বড় রাস্তায় পৌঁছতে কে জানে! এভাবে আর বেশিক্ষণ হাঁটা সম্ভব নয় ওর পক্ষে।

খাড়াই বেয়ে উপরে উঠলে দেখা যায় ফার্ম-হাউসটা, নিচে নামলে অদৃশ্য হয়ে যায়। দূরত্ব এখন সাত মাইল। রাস্তার বেশ কাছাকাছি এসে গেছে ওরা নিশ্চয়ই, এবার ধীরে ধীরে বামদিকে এগোনো দরকার। আরও আধঘণ্টা চলবার পর আবার একটা খাড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। খুবই সতর্কতার সাথে এগোচ্ছে ওরা এখন, মাঝে মাঝেই থেমে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করছে গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ। উঁচু জায়গায় এসে রাস্তা দেখতে পেল রানা, কিন্তু ঢাল বেয়ে নামতে গিয়েই ঝপ করে বসে পড়ল।

বাম পাশে পাহাড়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে দুটো গাড়ি। পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে সাত-আটজন লোক। ঘুরপথে না এসে সরাসরি এলে ঠিক ওদের মুখোমুখি পড়ত ওরা।

গীয়ানকে দেখা গেল বসে আছে গাড়ির কাছে। পাহারা দিচ্ছে।

'আড়ালে আড়ালে নেমে যেতে হবে আমাদের।' চাপা গলায় বলল রানা। 'আগে এই ব্যাটারা পাহাড় ডিঙিয়ে নিচে নামতে শুরু করুক, তারপর। একটা গাড়ি অকেজো করে দিতে হবে। তার

আগে কাবু করতে হবে গীয়ানকে। কিন্তু বেশিদূর তো নামা যাবে না এই ঢাল বেয়ে। শেষের তিরিশ গজ একেবারে ফাঁকা, একটা ঝোপ নেই। একবার পিছন ফিরে চাইলেই...'

'গুলি খাবে, আবার কি?' বলল গিলটি মিয়া। 'এই মোটা মরলে আমাদের কোন ক্ষতি আচে?'

'আওয়াজ হবে। ফিরে আসবে ওই ব্যাটারা কি হলো দেখতে।'

'ততক্ষণে আমরা ভাগলওয়া!' হাসল গিলটি মিয়া। 'আমাদের অত তাড়াহুড়ো কিসের? যাক না ব্যাটারা দুটো পাহাড় ডিঙিয়ে, তারপর জিরিয়ে-টিরিয়ে নিয়ে নামব আমরা ধীরে-সুস্তে।'

কথাটা ঠিক। রাজি হয়ে গেল রানা।

পাশের পাহাড়ের মাথায় উঠেই বসে পড়ল পপিনি। ঝোপের আড়ালে আরও একটু ভাল করে গা ঢাকা দিল রানা ও গিলটি মিয়া। এখান থেকে গজ পঞ্চাশেক হবে। আরও একজন উঠল চূড়ায়। বিরক্ত ভঙ্গিতে থুতু ফেলল পপিনি।

'এত লোক একসাথে কষ্ট করে কোন লাভ আছে?' বলল পপিনি। 'পাইলট বলল তিনজনই মারা গেছে একসাথে। নিজের চোখে দেখেছে সে। তার পরেও এত লোক লস্কর নিয়ে যাওয়ার কি মানে হয়? অর্ধেক আমরা থেকে গেলেই তো পারি, বাকি অর্ধেক যাক, নিয়ে আসুক লাল খাতাটা।'

'বাজে বোকো না পপিনি,' বকা দিল দ্বিতীয় লোকটা। 'চীফ সাবধান হতে বলে দিয়েছে গীয়ানকে। মারা না-ও গিয়ে থাকতে পারে। ওই লোকটা খুবই নাকি ভয়ঙ্কর, ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছে আমাদের ভেনিসে। চলো, নামা যাক। উফ্, আরও পাঁচটা পাহাড় ডিঙাতে হবে।'

নামতে শুরু করল লোকটা। গজর গজর করতে করতে চলল পপিনিও। বাকি সবাই একে একে এসে পৌঁছল এবং নেমে গেল

নিচে।

'চলুন, স্যার, নিচের ওই সবশেষের ঝোপটার আড়ালে গিয়ে বিশ্রাম নেয়া যাক আদ-ঘণ্টা।'

অতি সন্তর্পণে, হাত বা পায়ের ধাক্কায় একটি পাথর না খসিয়ে নেমে এল ওরা আড়াইশো গজ ঝোপ-ঝাড় আর পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে আড়ালে। একটা বোল্ডারের উপর পাশ ফিরে বসে হাওয়া খাচ্ছে গীয়ান। কালো স্যুট আর কালো হ্যাট পরনে। একটা সিগারেট ধরিয়ে টানছে আনমনে।

মনে মনে হিসেব করল রানা। নিঃশব্দে যদি কাজ সারা সম্ভব হয়, তাহলে আর দেরি করবার কোন মানে হয় না। কিন্তু গুলি যদি করতেই হয়, এবং ওরা যদি কারণ অনুসন্ধান করতে আসেও, সবাই আসবে না। বড়জোর একজন বা দু'জনকে পাঠাবে। তাদেরও গাড়ির কাছে পৌঁছতে লাগবে কমপক্ষে ঝাড়া বিশ মিনিট। ততক্ষণে একটা গাড়ি অকেজো করে দিতে পারবে ও অনায়াসে। অপরটাতে চড়ে রওনা হবে ওরা ফার্ম-হাউসের দিকে। তারপর, যদি হেলিকপ্টারটা দখল করতে পারে...

অস্থির হয়ে উঠল রানা দশ মিনিটের মধ্যেই। প্রতীক্ষা করতে ওর ভাল লাগে না কোনদিনই। তার উপর গীয়ানের সিগারেট খাওয়া দেখে এবং ধোঁয়ার গন্ধে সিগারেটের তেষ্টা পেয়ে গেল ওর ভয়ানক। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে।

'আমি চললাম, গিলটি মিয়া। তুমি এখানটাতেই থাকো। কাছাকাছি গিয়ে আমি যখন হাত তুলব, তখন একটা ঢিল মেরে ওর মনোযোগ অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করো। শেষের দশ গজ ধাওয়া করে পৌঁছতে হবে ওর কাছে।'

গিলটি মিয়া বুঝল প্ল্যান কিছুটা পরিবর্তন করছে রানা। মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হয়ে গেল।

রওনা হতে যাবে রানা, ঠিক এমনি সময় উঠে দাঁড়াল

গীয়ান। পায়চারি শুরু করল গাড়ির পাশে। মাঝে মাঝে ভ্রূ কুঁচকে পাহাড়ের দিকে দেখছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই দ্বিতীয় পাহাড়টায় চড়তে শুরু করেছে ওরা। খানিক বাদেই দেখা যাবে ওদের। এখনও কেন দেখা যাচ্ছে না, কেন আরও দ্রুত পা চালাচ্ছে না সবাই, সেটা ভেবে নিরতিশয় বিরক্ত হচ্ছে গীয়ান। অকম্মার ঢেঁকি, খেয়ে খেয়ে খোদাই ষাঁড় হয়ে গেছে, কুঁড়ের বাদশা সব, ইত্যাদি যা নয় তাই বলে গাল দিল সে কিছুক্ষণ ওদের, অস্থির পায়ে পায়চারি করল, বার বার পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, তারপর আবার গিয়ে বসল পাথরটার উপর। সিগারেট ধরাল আরেকটা।

রাকস্যাকটা খুলে রেখে ক্রলিং শুরু করল রানা। দ্রুত নিঃশব্দে নেমে যাচ্ছে নিচে। থামছে। দু'একটা বিচ্ছিন্ন ঝোপের আড়ালে, বা বিক্ষিপ্ত পাথরের আড়ালে থেমে দেখে নিচ্ছে গীয়ানের মতিগতি। আবার নামছে। মনে হচ্ছে প্রকাণ্ড এক লেজ-কাটা টিকটিকি এগিয়ে যাচ্ছে শিকারের দিকে।

দশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেল রানা। দৌড় প্রতিযোগিতার ভঙ্গিতে প্রস্তুত হলো সে- বাম পা সামনে, হাত দুটো মাটিতে। একটা হাত চট করে একবার উঁচু করেই নামিয়ে নিল।

গুলি করল গিলটি মিয়া। খটাং করে গাড়ির গায়ে লেগে ছিটকে এসে পড়ল মার্বেলটা গীয়ানের পায়ের কাছে। চমকে গাড়ির দিকে চেয়েছিল গীয়ান, এখন অবাক চোখে দেখছে গুলিটা, পরমুহূর্তে উঠে দাঁড়াল বিপদ টের পেয়ে।

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক। প্রকাণ্ড এক লাফ দিয়ে ওর ঘাড়ের উপর পড়ল রানা। টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল গীয়ান, রানা পড়ল ওর উপর। চার হাত-পা চলছে রানার সমানে।

রানার রাকস্যাকটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে দৌড়ে নেমে এল

গিলটি মিয়া। কিন্তু সাহায্যের প্রয়োজন হলো না। ততক্ষণে পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনছে রানা গীয়ানের জ্ঞানহীন দেহটা বোল্ডারের আড়ালে।

'উঠে পড়ো, গিলটি মিয়া,' বলল রানা। 'লাল গাড়িটায়।'

কালো গাড়িটার এঞ্জিনের বনেট খুলে ফেলল রানা, ডিস্ট্রিবিউটার ক্যাপটা খুলে হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে এল দু'তিনটে তারসহ, মাটিতে ফেলে পা দিয়ে চেপে চুর করে দিল সেটা। বনেট নামিয়ে কি মনে করে গীয়ানের হ্যাটটা টান দিয়ে খুলে মাথায় পরল, তারপর গিয়ে বসল লাল গাড়ির ড্রাইভিং সীটে।

বহুদূর থেকে একটা চিৎকারের শব্দ ভেসে এল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা, দ্বিতীয় পাহাড়ের চুড়োয় দাঁড়িয়ে আর সবাইকে ডেকে রাস্তার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে দু'জন লোক। দেখে ফেলেছে ওরা রানা ও গিলটি মিয়াকে। নেমে আসতে শুরু করল এবার।

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে হাসল রানা। সিগারেট ধরাল একটা।

'আজ আর আমাদের ধরতে হচ্ছে না। ফার্ম-হাউসে পৌঁছতে ওদের লাগবে পাক্কা আড়াই ঘণ্টা।'

রওনা হলো ওরা। মাইল খানেক গিয়ে ভাল রাস্তায় পড়ল। বাঁক নিয়েই তুফান বেগে ছুটল ফার্ম-হাউসের দিকে। কাছাকাছি গিয়ে গতি একটু কমাল রানা।

'সীট ছেড়ে নিচে নেমে বসো, গিলটি মিয়া। আমাকে দেখে ওরা মনে করবে গীয়ান ফিরছে রিপোর্ট করতে। অপ্রস্তুত অবস্থায় পাব ওদের আশা করছি।'

একগাল হেসে সীট ছেড়ে নেমে গেল গিলটি মিয়া। পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। মাইল খানেক গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিল রানা। টুপিটা টেনে মুখের অর্ধেকটা ঢেকে দিয়েছে সে আগেই।

'পৌঁছে গিয়েছি, গিলটি মিয়া। তুমি যেমন আছ তেমনি বসে থাকবে। আমি আগে ঢুকব বাড়ির ভিতর। পাঁচ মিনিট পর ঢুকবে তুমি। আমার কোন বিপদ হলে তুমি সাহায্য করতে পারবে। দু'জনে একসাথে বিপদে পড়া ঠিক হবে না।'

'ঠিক আচে। পাঁচ মিলিট পরেই বেরোব আমি নাহায়।'

একবার ইচ্ছে করল রানার, সোজা গিয়ে হেলিকপ্টারে ওঠে। কাছেই মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ওটা চুপচাপ। কিন্তু ইচ্ছেটা দমন করল সে। আগে এ বাড়িতে যারা আছে তাদের কাবু করে নিতে হবে।

বাড়ির সামনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বাম হাতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে আছে রানা, ডানহাতে ওর ওয়ালথার পি. পি. কে। নিচু করে রেখেছে হাতটা।

ঘ্যাচ করে ব্রেক করল রানা। তিন লাফে পেরিয়ে গেল সামনের ছোট বাগানটা।

রানা আশা করেছিল গীয়ানকে ফিরতে দেখে দরজার কাছে এসে দাঁড়াবে সিলভিও বা আর কেউ। কিন্তু কেউ এল না। বন্ধ দরজায় কান পাতল রানা। কারও পায়ের শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। বুঝল প্রথম চালটা ওকেই চালতে হবে।

হ্যাণ্ডেলে চাপ দিয়ে ঠেলা দিতেই ক্যাঁচম্যাচ শব্দে খুলে গেল দরজাটা। হলরুম। ঢুকে পড়ল রানা। সামনেই দোতলায় ওঠার সিঁড়ি, ডানপাশে একটা বন্ধ দরজা, সিঁড়ির পাশ দিয়ে একটা প্যাসেজ।

আধ সেকেণ্ডের বেশি এসব দেখার সুযোগ পেল না রানা, কারণ ওর চোখ পড়ল হেলিকপ্টারের পাইলটের উপর। সিঁড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে নেমে আসছিল লোকটা, রানাকে দেখে জমে গেছে মূর্তির মত। হাঁ হয়ে গেছে ওর মুখটা, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে। যেন ভূত দেখতে পেয়েছে

সামনে।

'টুঁ শব্দ করলেই মারা পড়বে!' বলল রানা চাপা গলায়।

পিস্তলটার দিকে চোখ পড়তেই হাত দুটো তুলে ফেলল সে মাথার উপর। রক্তশূন্য মুখ। ডান গালটা লাফাচ্ছে আপনাআপনি।

'নেমে এসো!' আদেশ করল রানা।

ঠিক যেন একরাশ ডিমের উপর দিয়ে হাঁটছে এমনি সন্তর্পণে রানাকে বিন্দুমাত্র না চটিয়ে নেমে এল পাইলট।

'ঘুরে দাঁড়াও,' আবার হুকুম করল রানা।

কান্নার ভঙ্গিতে বিকৃত হয়ে গেল লোকটার মুখের চেহারা। ওর স্থির বিশ্বাস, ঘুরলেই গুলি করবে রানা। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, রানার হাতের পিস্তলটা একটু নড়ে উঠতেই চোখ বুজে ঘুরে দাঁড়াল। লোকটাকে সার্চ করে দেখা গেল কোন অস্ত্র নেই ওর কাছে। তিন পা পিছিয়ে গেল রানা আবার।

'আর সবাই কোথায়?'

প্যাসেজের শেষের দিকে একটা বন্ধ দরজার দিকে আবছা ইঙ্গিত করল লোকটা।

'হাঁটো। কৌশল করতে গেলেই গুলি খাবে।'

এগোল পাইলট। প্যাসেজ ধরে কিছুদূর এগিয়ে বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, হ্যাণ্ডেল ধরে চাপ দিয়ে খুলল দরজাটা, এবং পিছন থেকে রানার হাতের প্রচণ্ড এক ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে চার হাত-পায়ে ভর করে পড়ল গিয়ে চেয়ারে বসা সিলভিওর পায়ের কাছে।

'খবরদার, কেউ নড়বে না!' ঘরের ভিতর এক পা ঢুকে এসে বলল রানা।

চমকে উঠল লুইসা পিয়েত্রো। জানালার ধারে বসে ব্যস্ত হাতে উল বুনছিল, থেমে গেল হাত। ঝট করে ফিরল রানার দিকে।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ দুটো।

'রানা। বেঁচে আছ তুমি!'

নিবিষ্টচিত্তে একটা ম্যাপ দেখছিল সিলভিও। জ্যান্ত, পিস্তলধারী রানাকে চোখের সামনে দেখে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখটা। হাত থেকে খসে পড়ে গেল ম্যাপ। ঢোক গিলল বার দুই।

'কি? ভাবতে পারোনি গ্রেনেড খেয়েও এখানে এসে হাজির হতে পারি, তাই না?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল রানা সিলভিওকে। 'মৃত্যু-ভয় আসছে, সিলভিও?'

'গ্রেনেড?' তাজ্জব হয়ে গেল লুইসা। 'গ্রেনেড ছুঁড়েছিল ওরা তোমার ওপর? তাই কপালটা কাটা দেখছি?' তীব্রদৃষ্টিতে চাইল লুইসা সিলভিওর দিকে। 'সিলভিও। তুমি হুকুম দিয়েছিলে গ্রেনেড ছোঁড়ার? কি কথা দিয়েছিলে তুমি আমাকে?'

'চুপ করো লুইসা,' ধমকে উঠল সিলভিও। 'পুরুষ মানুষের কথার মধ্যে কথা বলোনা।'

'পুরুষ, না কাপুরুষ?' ফোঁস করে উঠল লুইসা।

লুইসার কথায় কর্ণপাত না করে রানার দিকে ফিরল সিলভিও।

'আপনার সাথে কথা আছে আমার। আপনি এদেশ থেকে বেরোতে পারবেন না। প্রত্যেকটা রাস্তায় পাহারা বসেছে। পুলিস খুঁজছে আপনাকে হন্যে হয়ে, প্রত্যেকটা বর্ডার টাউনে স্পেশাল গার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ হোক বা কাল হোক, ধরা আপনাকে পড়তেই হবে। আমার সাথে যদি একটা সমঝোতায় আসেন...'

'তোমাকে সমঝে নিয়েছি, আর কোনরকম সমঝোতায় আসার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই।'

'বইটা ফেরত দিয়ে দিন, সিনর মাসুদ রানা। যত টাকা চান,

কিনে নেব ওটা আমি আপনার কাছ থেকে।'

'টাকার চেয়েও বড় দু'একটা জিনিস এখনও এই পৃথিবীতে আছে, সিলভিও। নোট বইটা পাচ্ছ না তুমি, কাজেই ও-নিয়ে বাজে বকে লাভ নেই।'

'কুনো অসুবিদে নেই তো, স্যার?' দরজার বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করল গিলটি মিয়া। 'সব ঠিকঠাক?'

'এখানে কোন গোলমাল নেই,' সিলভিওর উপর থেকে চোখ না সরিয়েই জবাব দিল রানা। 'কিন্তু বাড়িতে আর কেউ আছে কিনা দেখার সুযোগ পাইনি। তুমি একপাক ঘুরে দেখো। যদি কাউকে দেখতে পাও, একবার প্যাঁচার ডাক ডেকে তাকে বন্দী করে নিয়ে আসবে এখানে। আর যদি বিপদে পড়ো, দু'বার ডাকবে ডাকটা। বুঝতে পেরেছ?'

'নিচ্চয়। চললুম, স্যার।'

'আর একটা কথা। শক্ত দড়ি পেলে নিয়ে এসো খানিকটা।'

'পেয়ে যাব, স্যার। আমি থাকতে কোন চিন্তা নেই আপনার।'

পাইলটটা জড়োসড়ো ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে একবার রানা আর একবার সিলভিওর মুখের দিকে চাইছে। কোন্‌জন বেশি ভয়ঙ্কর বুঝে উঠতে পারছে না বোধহয়।

'কান পেতে রানার মুখে বাংলা কথা শুনছিল লুইসা, বলল, 'বড় মিষ্টি ভাষা তো! যাই হোক, এখন কি করবে আমাদের? মেরে ফেলবে?'

'বেঁধে রেখে চলে যাব। তোমাদের লোকজন এসে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে, খুলে দেবে ওরা।'

'কিন্তু তাহলে পালাবে কি করে?'

'হেলিকপ্টারটা নিয়ে উড়ে চলে যাব।'

মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল সিলভিওর মুখ। বলল, 'গুল মারছ! চালাতে পারবে না তুমি ওটা।'

'সেটা নিজের চোখেই দেখতে পাবে।'

'কিন্তু এদের তুমি চেনো না রানা,' বলল লুইসা। 'এরা বড় ভয়ঙ্কর। করতে পারে না এমন কাজ নেই। যতদিন বেঁচে থাকবে মৃত্যু-পরোয়ানা ঝুলবে তোমার মাথার ওপর। তার চেয়ে নোট বইটা দিয়ে দিলে ভাল হত না? তোমার নিজের দেশের ব্যাপার তো নয় এটা। আমি তোমার ভালর জন্যেই বলছি, রানা। দিয়ে দাও ওটা, প্লীজ!'

'আমার মঙ্গল কামনার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, লুইসা। কিন্তু বহু দস্যুদলের বহু মৃত্যু পরোয়ানা এখনও ঝুলছে আমার মাথার ওপর, সুযোগ পেলে তারাও ছাড়বে না আমাকে। কিন্তু ওসব পরোয়া করি না। করলে ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে থাকতাম। নোটবইটা ফেরত দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

'কিন্তু তুমি এক বিদেশী গুপ্তচর, ওটা ভারতে পৌঁছে দিলে তোমার কি লাভ, রানা?'

'তোমাদের কি ক্ষতি শুনি?'

'পিয়েত্রো গ্লাস ফ্যাক্টরির নাম মুছে যাবে পৃথিবী থেকে। শুধু ভারতেই নয়, গোটা ইউরোপ জুড়ে যে বিরাট ব্যবসা গড়ে উঠেছে গত দশ বছর ধরে, ধূলিসাৎ হয়ে যাবে সেটা। নোট বইটা উদ্ধার করতে না পারলে দল থেকে বের করে দেয়া হবে সিলভিওকে।'

কিছুতেই হাসি সংবরণ করতে পারল না রানা। হেসে উঠে বলল, 'ছেলেমানুষের মত কথা বলছ, লুইসা। তোমাদের কাছে ব্যাপারটা যতখানি গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে, আমার কাছে মোটেই তা মনে হচ্ছে না। দশ বছর ধরে বে-আইনী ব্যবসা করে অঢেল টাকা করেছ তোমরা, এখন এ ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে তোমরা পথে বসবে না। আর দল থেকে যদি সিলভিওকে বের করে দেয়, সেটা ওর জন্যে শাপে বর হবে। মহা বাঁচা বেঁচে যাবে ও। কাজেই আমি তোমাদের কোন ক্ষতি দেখতে পাচ্ছি না। শুধু

দেখতে পাচ্ছি টাকা আর ক্ষমতার লোভে তোমরা কত নিচে নামতে পারো। জুলি মাযিনিকে খুন করতে বাধেনি তোমাদের, অনিলকে খুন করতে বাধেনি, জবাই করেছ তোমরা স্টেফানো মন্টিনির মত একজন মহৎপ্রাণ আত্মভোলা স্পোর্টসম্যানকে, এখান পর্যন্ত তেড়ে এসেছ আমাদের দু'জনকে খুন করতে। যাবার আগে তোমাদের এই মেয়েলী চেহারার মেনীমুখো ভাইটার বুকের ভেতর একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে যেতে পারলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু একজন অসহায় নিরস্ত্র, পরাজিত লোককে হত্যা করতে বাধছে আমার। কিন্তু তোমাদের তো বাধেনি? বিশেষ করে তুমি কি করে এই নির্বিচার হত্যাকাণ্ড সমর্থন করলে, ভাবতে অবাক লাগছে। এতকিছুর পরেও কি করে ওকালতী করছ ভাইয়ের হয়ে? তোমার প্রতি আমার দুর্বলতা আছে, কিন্তু তাই বলে তোমার অন্যায় আবদার রক্ষা করব, তা ভেবো না। কিছুতেই দেব না আমি এ নোটবই।'

রানার তীক্ষ্ণ তিরস্কারে স্তব্ধ হয়ে গেল লুইসা। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখটা। কয়েক সেকেণ্ড কোন জবাব খুঁজে পেল না, তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'খুন-খারাপীর পেছনে কোনদিনই আমার সমর্থন ছিল না। এখনও নেই। তোমার বন্ধুর মৃত্যুতে আমি সত্যিই দুঃখিত।'

গিলটি মিয়া তার কামান হাতে ঢুকল ঘরে। অপর হাতে একগোছা পাকানো দড়ি।

'কেউ নেই, স্যার। একেবারে ফাঁকা।'

'ঠিক আছে। এবার বেঁধে ফেলো সব ক'টাকে। জলদি।'

পাইলট কোন আপত্তিই করল না, কিন্তু সিলভিওর দিকে এগোতেই এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে কণ্ঠনালী টিপে ধরল সে গিলটি মিয়ার। এরকম একটা ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিল রানা। বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে এল সে, বাম হাতে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল

সিলভিওর থুতনির নিচে। চোখ কপালে উঠল সিলভিওর, হাত ছুটে গেল কণ্ঠনালী থেকে, শরীরটা ঘুরে গেল একটু। ধাঁই করে পিস্তলের বাঁট পড়ল সিলভিওর মাথায়। ধড়াস করে পড়ল মেঝেতে জ্ঞান হারিয়ে।

'এবার বাঁধো।' হুকুম করল রানা।

প্রেমিক রানার এই ভয়ঙ্কর রূপ বোধহয় স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি লুইসা। ওর আক্রমণের ক্ষিপ্রতা আর প্রচণ্ডতা এক সেকেণ্ডের জন্যে বিহ্বল করে দিল ওকে। নিজের ভাইয়ের উপর আঘাত পড়তে দেখে সহ্য করতে পারল না, ঝট করে মুখ ফিরাল জানালা দিয়ে বাইরে, পরমুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল।

এই হঠাৎ আড়ষ্টতা নজর এড়াল না রানার। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, এমনি সময় বাইরের দিকে চেয়েই কথা বলে উঠল লুইসা। কণ্ঠস্বরটা ভাবলেশহীন।

'তোমার একটু তাড়াতাড়ি করা দরকার রানা। ফিরে আসছে ওরা।'

দ্রুতপায়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল রানা। দেখা গেল সত্যিই একটা ছাত খোলা গাড়ি আসছে এইদিকে ধুলো উড়িয়ে। অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে আসছে ওটা।

সিলভিওকে বাঁধা শেষ করে এইদিকে এগিয়ে আসছিল গিলটি মিয়া। রানার একটা বাহু ধরল লুইসা।

'আমি তোমার হাতে বন্দী হতে চাই, রানা।'

'তোমাকে বন্দী করতে চাই না আমি, লুইসা।'

'বাঁধবে না আমাকে?'

'না। কোন বাঁধনেই বাঁধব না। তুমি মুক্ত।'

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল রানা ও গিলটি মিয়া।

হেলিকপ্টারে উঠে বাইরে মুখ বের করে দেখল রানা তীব্রবেগে ছুটে আসছে হুড খোলা গাড়িটা। ভিতরে ছয়জন যাত্রী।

অনেক কাছে চলে এসেছে। খুব সম্ভব বড় রাস্তায় এটাকে থামিয়ে দখল করে নিয়েছে ওরা।

ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে চালু করল রানা এঞ্জিন। পিচ কন্ট্রোলের থ্রটল ঘুরিয়ে চালু করল রোটর ব্লেড।

মাথা বের করে গাড়িটা দেখল গিলটি মিয়া। ফার্ম-হাউসের গেট দিয়ে ঢুকছে এখন ওটা। গুলি করল গিলটি মিয়া। মুহূর্তে চুর হয়ে ফেটে ঝাপসা হয়ে গেল গাড়ির উইণ্ডস্ক্রীন। প্রাণপণে ব্রেক চাপল ড্রাইভার, কয়েক ফুট স্কিড করে এগিয়ে থেমে গেল গাড়িটা।

ডোবার ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে নামল ছয়জন গাড়ি থেকে। পজিশন নিল যে যেখানে পারল।

হুইল ব্রেক ছেড়ে পিচ লিভারটা উপরে টানল রানা। ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে যাচ্ছে হেলিকপ্টার।

গুলি করতে শুরু করল ওরা। গিলটি মিয়ার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা গুলি। আরেকটা গিয়ে ঢুকল প্যানেলের গায়ে বসানো ঘড়ির মধ্যে। একজন টেকো লোকের কপালে সুপুরীর সমান ঢেলা তুলে দিল গিলটি মিয়া গুলি করে। কিন্তু তৃতীয় গুলির আর সুযোগ পাওয়া গেল না।

জয়স্টিকটা সামনে ঠেলে দিয়েছে রানা, আরও খানিকটা থ্রটল দিয়ে রাডার পেডালে রেখেছে বাম পা। কোণাকুণি ভাবে উঠে গেল হেলিকপ্টার। তিন সেকেণ্ডেই ফার্ম-হাউসের আড়ালে পড়ে গেল ওরা ছয়জন।

উত্তর-পশ্চিম কোণে হারিয়ে গেল হেলিকপ্টার ছোট হতে হতে বিন্দু হয়ে গিয়ে।

নয়

রানার পাশের সীটে বসে খুশি মনে পর্বতমালা দেখতে দেখতে চলেছে গিলটি মিয়া। আনন্দ আর ধরে রাখতে পারছে না সে। শেষকালে বলেই ফেলল, 'উফ্! এইসব পাহাড়-পব্বত ডিঙিয়ে যদি হেঁটে যেতে হত, এক্কেবারে ফিনিশ হয়ে যেতুম, স্যার। ভাগ্যিস এটার ডাইবারীটা শিকে রেকেছিলেন, তাই রক্ষে!' আবার একচোট হেসে নিয়ে বলল, 'শালাদের এমন ক্যাঁচকলা দেকিয়ে দিয়েচেন, তিন পুরুষেও ভুলতে পারবে না। তবে মেয়েটাকে আমার তত খারাপ মনে হয়নিকো। কিন্তুক ওর ভাইটা, ওটা একটা...'

'অত খুশি হওয়ার কিছু নেই, গিলটি মিয়া,' বলল রানা মৃদু হেসে। 'খানিক বাদেই নামতে হবে আমাদের!'

'কেন? লণ্ডন-প্যারিস যাচ্চি না আমরা এটায় চড়ে?'

'তেল নেই,' সোজা সাপ্টা জবাব দিল রানা। 'আর দশ মিনিটের মধ্যেই নামতে হবে আমাদের। বর্ডারটাও পার হওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।'

'তার মানে আবার হাঁটতে হবে?' আঁতকে উঠল গিলটি মিয়া।

মাথা ঝাঁকাল রানা।

খানিকক্ষণ মন-মরা হয়ে বসে রইল গিলটি মিয়া, কিন্তু আবার খুশি হয়ে উঠতেও সময় লাগল না ওর।

'কিন্তুক, যাই বলুন, বড় জবর ঘোল খাওয়ানো গেচে

শালাদের। ওরা মনে করবে আমরা নাগালের বাইরে চলে গেচি।'

'উঁহুঁ।' মাথা নাড়ল রানা। 'ওরা জানে বেশিদূর যেতে পারব না আমরা এটায় করে। পাইলট বলে দেবে যে তেল নেই এতে।'

'তাহালে তো মুশকিল! আবার তাড়া খাওয়া নেড়ি কুত্তার মত ভেগে বেড়াতে হবে। তা এখুন আমরা চলেচি কোন্‌দিকে?'

'বর্ডারের দিকে। ওখানে কড়া পাহারা রয়েছে। যে করে হোক ওদের চোখে ধুলো দিয়ে ঢুকে পড়তে হবে আমাদের সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ভেতর। একবার ওখানে পৌঁছতে পারলে ট্রেনে করে চলে যাব আমরা জুরিখ। সেখান থেকে লণ্ডনের প্লেন ধরা কষ্টকর হবে না। কিন্তু তেলের যা অবস্থা তাতে বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছোনো যাবে বলে তো মনে হয় না।'

ফুয়েল গজের দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে উঠল রানার। প্রায় জিরোতে গিয়ে ঠেকেছে কাঁটা। একটা ছোট চৌকোণ জায়গায় বার বার লাল বাতি জ্বলে উঠে বিপদ সঙ্কেত জানাচ্ছিল, এখন আর নিভছে না সেটা, জ্বলে রয়েছে সারাক্ষণ। আগামী তিন চার মিনিটের মধ্যেই একেবারে খালি হয়ে যাবে পেটস্ল ট্যাংক।

'এদিক ওদিক একটু খুঁজে দেখো তো গিলটি মিয়া, প্যারাসুট পাওয়া যায় কিনা।'

'মরি মরব, কিন্তুক আমি এত ওপর থেকে ঝাঁপ দিতে পারব না, স্যার। অসম্ভব। আপনার জন্যে খুঁজে দেখতে পারি...'

উঠতে যাচ্ছিল গিলটি মিয়া, বারণ করল রানা।

'থাক। তাহলে আর দরকার নেই,' খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে আঙুল তুলে দেখাল। 'ওই দেখো টিরানো শহর। ওই পর্যন্ত পৌঁছতে পারব না আমরা। কিন্তু এখন এখানে নামাও নিরাপদ নয়, ফেরারও উপায় নেই।'

হঠাৎ বুদ্ধি খেলল রানার মাথায়, 'আরে! গর্দভ আমি একটা! রিজার্ভ ট্যাংক তো দেখিনি। ওখানে কিছু পেটস্ল থাকতে পারে।

নাকি রিজার্ভ ট্যাংকের তেলেই চলছি আমরা?'

একটা বোতাম টিপল রানা। পরমুহূর্তে হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। সামান্য একটু উঁচু হয়ে গেল ফুয়েল গজের কাঁটা। লাল বাতিটা সর্বক্ষণ না জ্বলে বিপদ সঙ্কেত জানাতে শুরু করল আবার থেকে থেকে। রানার মুখে হাসি দেখে জোরে হেসে উঠল গিলটি মিয়া কিছু না বুঝেই। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'হাসছেন যে, স্যার?'

'তুমি হাসছ কেন?'

'আপনাকে হাসতে দেখলে আমার খুব খুশি লাগে, স্যার। তাইতে হাসচি।' পরিষ্কার উত্তর গিলটি মিয়ার। রানা জানে, এতটুকু মিথ্যে নেই ওর কথায়। আশ্চর্য এক মায়া-জালে জড়িয়ে গেছে গিলটি মিয়া ওর সাথে, চেষ্টা করেও দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি সে ওকে। 'গোমড়ামুকো লোক আমার পচোন্দ হয় না, স্যার। কই, বললেন না, হাসচেন কেন?'

'আরও দশ মিনিটের পেটস্ল পাওয়া গেছে। টিরানোতে না নেমে আর একটু ভেতরে গিয়ে নামতে পারব এবার আমরা।' উঁচুতে উঠতে শুরু করেছে হেলিকপ্টার। 'পর্বত ডিঙিয়ে আমরা সমতল জায়গায় নামার চেষ্টা করব। ম্যাপটা বের করো দেখি?'

সুইস বর্ডারের তুষার ঢাকা পর্বত-শৃঙ্গের পঞ্চাশ ফুট উপর দিয়ে টপকে চলে এল ওরা এপারে। ম্যাপ দেখে মোটামুটি পছন্দসই জায়গা বের করে ফেলল রানা। সাত মিনিট পর মেঘ ফুঁড়ে নেমে এল ওরা ছাগল-চরা একটা সবুজ মাঠে। কাছাকাছিই রাস্তা দেখা যাচ্ছে একটা।

'লোকজন জড়ো হওয়ার আগেই ঝটপট নেমে পড়ো, গিলটি মিয়া। জবাবদিহি করতে গেলে দেরি হয়ে যাবে।'

হেলিকপ্টার থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে উঠে এল ওরা রাস্তায়। হাঁটতে শুরু করল দ্রুতপায়ে। মাইল তিনেক হাঁটার পর

অপেক্ষাকৃত ধীর করল হাঁটার গতি। আরও কিছুক্ষণ চলার পর পেছনে এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল রানা।

'গাড়ি আসছে, দেখা যাক লিফট পাওয়া যায় কিনা।'

পাঁচ মিনিট পর দেখা গেল মস্ত এক ট্স্যাক আসছে। কাছে আসতেই হাত তুলে থামবার ইঙ্গিত করল রানা। থেমে দাঁড়াল ট্স্যাক, জানালা দিয়ে গোলগাল হাসি-খুশি মুখ বের করে মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার।

'সেন্ট মরিয পর্যন্ত লিফট দিতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'উঠে পড়ো।' পাশের দরজাটা খুলে দিল ড্রাইভার।

ওই পাহাড়ের ধারে একটা হেলিকপ্টার দেখতে পেয়েছে ড্রাইভার, সেই গল্প শোনাতে শোনাতে নিয়ে এল রানাদের সেন্ট মরিযে। একবারও তার সন্দেহ হলো না ওই হেলিকপ্টারের সাথে এই বিদেশীদের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। মেইন রোডে নেমে পড়ল ওরা ধন্যবাদ জানিয়ে।

চলতে চলতে একটা রেস্তোরাঁর দিকে চেয়ে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল গিলটি মিয়া।

'কিচু খেয়ে নিলে হয় না, স্যার?'

'সময় নেই, গিলটি মিয়া। টেস্নে যদি রিফ্রেশমেন্ট কার থাকে তাহলে দেখা যাবে। পা চালাও এখন।'

স্টেশনে গিয়ে জানা গেল আগামী পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে কোন টেস্ন নেই। একগাল হাসল গিলটি মিয়া।

'এবার তাহলে কিচু…'

'নষ্ট করবার মত একটা সেকেণ্ডও নেই আমাদের হাতে, গিলটি মিয়া,' বলল রানা। 'সিলভিও ওই ফার্ম-হাউসে বসে বসে আঙুল চুষবে না। এতক্ষণে নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘনিয়ে তোলার ব্যবস্থা করে ফেলেছে ব্যাটা। হাল ছাড়বে না সহজে। আর

কোনও আক্রমণের সুযোগ দিতে চাই না আমি ওকে, হাত ফস্কে বেরিয়ে যেতে চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। চলো, একটা গাড়ির ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখা যাক। রওনা হবার আগে খাবার কিনে নেব আমরা। পথ চলতে চলতে খাওয়া যাবে।'

দ্বিগুণ ভাড়া দেয়ার প্রস্তাব করায় শেষ পর্যন্ত রাজি হলো রেন্ট-এ কার ম্যানেজার। বিশ মিনিটের মধ্যে একটা কালো সিট্স্ন ডি. এস-এর পেট্স্ল ট্যাংক ভর্তি করে নিয়ে, এবং অতিরিক্ত সাবধানতার খাতিরে গোটা দুই দু-গ্যালনী টিনে পেট্স্ল ভরে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা জুরিখের পথে।

'কতক্ষুণে পৌঁচব, স্যার?'

'রাত সাড়ে আটটার আগে না,' বলল রানা। 'দেড়শো মাইল যেতে হবে গাড়ি চালিয়ে।'

দশ মিনিটের মধ্যে সিলভাপ্লানা পৌঁছে ডান দিকে মোড় নিল রানা, ছুটল ফুল স্পীডে। মাথার মধ্যে একই স্পীডে চিন্তা চলেছে ওর। বুঝতে পারছে সে, এয়ারপোর্টে শেষ চেষ্টা করবে সিলভিও। একবার লণ্ডনের পথে রওনা হয়ে যেতে পারলে রানাকে আর কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না ওরা। কাজেই সব রকম চেষ্টা করবে সে যাতে নোটবই নিয়ে কিছুতেই প্লেনে উঠতে না পারে ও। কিছু একটা কৌশল চিন্তা করে বের করতে হবে ওর যাতে ধোঁকা দেয়া যায় সিলভিওকে। অবশ্য কোনরকম গোলমাল না-ও হতে পারে। ওরা যে জুরিখের দিকে চলেছে সেটা সিলভিওর পক্ষে জানা সহজ নয়। ও হয়তো মনে করবে মিলানো গিয়ে প্লেন ধরবার চেষ্টা করবে রানা। তবু সাবধান হতে হবে। চিঠিতে অনিল লিখেছিল, সব সময় মনে রাখবে, সারা ইউরোপে ওদের লোক আছে…প্রত্যেক দেশে রয়েছে নেট-ওঅর্ক…যমের মত ভয় করে ওদেরকে সবাই। কোসা নোস্ট্রার প্রচণ্ড ক্ষমতা সম্পর্কে রানা নিজেও পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ওদের দক্ষতাকে হেয় করে দেখবার

ধৃষ্টতা ওর অন্তত নেই।

চল্লিশ মিনিট পর কয়ের শহরে ঢুকল রানা, শহর এলাকা ছাড়িয়ে এসে আবার বাড়াল স্পীড। এবার ছুটেছে ওরা সারগানের দিকে। খাবারের প্যাকেট খুলল গিলটি মিয়া, গপাগপ গিলতে শুরু করল একটার পর একটা স্যাণ্ডউইচ। রানাও খেল কয়েকটা। কিন্তু মাইল দশেক গিয়েই চমকে উঠল রানা হঠাৎ। অদ্ভুত ধরনের আওয়াজ হলো এঞ্জিনে। গাড়ির গতি কমে আসছে।

পেট্রল গজের দিকে চেয়ে দেখল রানা। নাহ্ পেট্রল তো প্রচুর রয়েছে। দশ গ্যালন পেট্রল ভরিয়েছে সে সেন্ট মরিযে। তাহলে এত চমৎকার টিউন করা এঞ্জিন হঠাৎ গোলমাল শুরু করল কেন?

'কি হলো, স্যার? থামচেন কেন?'

'থামছি না। থেমে যাচ্ছে।'

গাড়িটা কিনার করে রেখে বেরিয়ে পড়ল রানা দরজা খুলে। প্রথমে এঞ্জিনের বনেট খুলল সে, তারগুলো পরীক্ষা করে দেখল, তারপর বুঝল কারবুরেটার না খুললে বোঝা যাবে না ব্যাপারটা। বুট থেকে টুল-কিট বের করে নিয়ে এল।

তিন মিনিটের মধ্যে টের পেল রানা গোলমালটা কোথায়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল ওর রাগে।

'হারামীর বাচ্চারা পানি মিশিয়ে দিয়েছে পেট্রলে!'

'সব্বোনাশ! একোন উপায়?'

'চার গ্যালন পেট্রল আছে টিনে,' বলল রানা। 'ট্যাংকের পানি ফেলে দিয়ে...'

'ঠিক বলেচেন!' ছুটে গিয়ে টিন দুটো নিয়ে এল গিলটি মিয়া।

ট্যাংকের তলা থেকে নাট খুলে সব পানি ঝরিয়ে দিল রানা রাস্তার উপর। নাটটা লাগাতে লাগাতে গিলটি মিয়াকে বলল, 'ঢালো পেট্রল ট্যাংকের ভেতর।'

একটা টিনের মুখ খুলে নাকের কাছে নিয়ে শুঁকে দেখল গিলটি মিয়া। ভ্রূ জোড়া কপালে উঠল ওর।

'পেট্টল কোতায়, স্যার! এর মদ্যেও তো পানি!'

মুখটা কালো হয়ে গেল রানার। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল গাড়ির নিচ থেকে।

সত্যিই! পরীক্ষা করে দেখল রানা, টিনের মধ্যে পরিষ্কার কলের জল।

'বাহ্! ভাল ঘোল দিয়েচে শালারা!' প্রশংসা না করে পারল না গিলটি মিয়া। 'এঁটকে দিয়েচে রাস্তার মধ্যে। কিন্তুক একোন একটা ব্যবস্তা তো করা দরকার। কি করা যায়, স্যার? পেট্টল লিয়ে আসব?' টিন থেকে পানি ঢেলে ফেলতে শুরু করল সে।

'পারবে তুমি?' দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কি যে বলেন, স্যার! আপনি হুকুম করলে পুরো পেট্টল পামটা বেচে দিয়ে আসতে পারি আরাকজনের কাচে। পারি না কি! আদ ঘণ্টা, বড়জোর এক ঘণ্টা, লিয়ে আসচি আমি পেট্টল।'

মাথা নিচু করে এপাশ-ওপাশ নাড়ছিল রানা, নিজের বোকামির জন্যে মনে মনে গাল দিচ্ছিল নিজেকে। পেট্রল ভরবার সময় একটু যদি খেয়াল করত তাহলে এখন এই অবস্থায় আটকে বসে থাকতে হত না রাস্তায়। অন্তত একটি ঘণ্টা পিছিয়ে গেল সে এখন। গাড়িটা এখানে ছেড়ে দিয়ে আর কোন গাড়িতে লিফট নেয়ার চেষ্টা করবে? না। তাতে আরও দেরি হয়ে যাবে জুরিখে গিয়ে পৌঁছতে। ঝট করে মাথা তুলল সে।

'কোথায় যাচ্ছ পেট্রল আনতে?'

'মাইল দশেক আগে একটা পেট্টল পাম দেকেছিলুম, স্যার। ওকান থেকেই ভাবচি...'

'যাবে কি করে?'

‘ঠ্যাঙা দেকিয়ে চলে যাব, স্যার। ঠ্যাঙা দেকালেই পৌঁচে দেয় এদেশে যে কোন ডাইবার। মন খারাপ করে কোন লাভ নেই, স্যার, আমি রওনা হয়ে যাই, বেশি দেরি হবে না।’

‘দাঁড়াও, গিলটি মিয়া। অত তাড়াহুড়ো করো না। তাড়াহুড়ো করে একবার ভুল করেছি, আর ভুল করতে চাই না। কারও গাড়িতে যদি লিফট নিতে চাও এইখান থেকে সেটা সবচেয়ে সুবিধে হবে। এইখানে দাঁড়ালে যে-কোন দিক থেকে যে-কোন গাড়ি আসুক না কেন ভদ্রতার খাতিরে লিফট দিতে বাধ্য হবে।’

‘ঠিক বলেচেন, স্যার,’ এক কথায় রাজি হয়ে গেল গিলটি মিয়া।

‘আর একটা কথা, কি আশ্চর্য দ্রুত কাজ করেছে ওরা খেয়াল করেছ?’

‘করেচি, স্যার,’ একগাল হাসল গিলটি মিয়া। ‘অনেকটা আপনার মতই ঝটপট ওদের কাজ-কম্মো। তাজ্জব কারবার! এইটুকু সোমায়ের মদ্যেই গুবলেট করে দিলে পেট্টোলের মদ্যে।’

‘যেখানে পেট্রল আনতে যাচ্ছ, সেখানেও গুবলেট করে রেখেছে কিনা কে জানে?’

‘রেকেচে, স্যার। আমি জানি। ধরে লিচ্চি, রেকেচে। তাই তোয়ের হয়েই যাচ্চি। ধানাই-পানাই আমার কাচে খাটবে না।’ কান খাড়া করল গিলটি মিয়া একটা গাড়ির এঞ্জিনের শব্দে।

‘ঠিক আছে। এই গাড়িতেই তুলে দিচ্ছি তোমাকে। খুব সাবধান থাকবে। আমি এদিকে কার্বুরেটার পরিষ্কার করে সবকিছু চেকআপ করে নিয়ে পাহারা দিই গাড়িটা।’

রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল রানা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও থামতে হলো ওপেলটাকে, না থামলে চাপা দিতে হয় রানাকে। ধুমসো মোটা এক লোক বিরক্ত ভঙ্গিতে চোখ-মুখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে।

‘পেট্রল ফুরিয়ে যাওয়ায় বিপদে পড়েছি। দয়া করে আমার এই সঙ্গীকে পাম্প পর্যন্ত একটু পৌঁছে দেবেন?’

সাহায্যের আবেদন এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই দেখে রেগে গেল লোকটা। আপনমনে গজ গজ করল গাড়িতে ওঠার সময় কেন মানুষের হুঁশ থাকে না সে-সম্পর্কে, শেষ পর্যন্ত পাশের দরজা খুলে দিল। ধন্যবাদ দিয়ে এঞ্জিনের পিছনে লাগল রানা, গিলটি মিয়া উঠে পড়ল গাড়িতে দু'হাতে দুটো খালি টিন নিয়ে।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর ফিরে এল গিলটি মিয়া পেট্রল পাম্পের ব্রেক-ডাউন ভ্যানে চড়ে। খুশি হয়ে উঠল রানা। আশ্চর্য লোকটা! এই বিদেশে কারও কথার একবিন্দু বোঝে না গিলটি মিয়া, ওর একটি কথাও বোঝে না কেউ, তবু দিব্যি কাজ চালিয়ে নিচ্ছে সে আকারে ইঙ্গিতে।

কিন্তু আকার-ইঙ্গিতের ধরন দেখে চমকে উঠল রানা। ড্রাইভিং সীটে বসা লোকটার পেটে খোঁচা দিল গিলটি মিয়া ওর ভয়ঙ্কর-দর্শন খেলনা পিস্তল দিয়ে। ভয়ে ভয়ে নেমে এল একজন ঢোলা জামা-কাপড় পরা শুকনো লম্বা নিষ্ঠুর চেহারার লোক।

‘কি ব্যাপার, গিলটি মিয়া?’ প্রশ্ন করল রানা।

‘বলচি, একটু দাঁড়ান, স্যার।’ পিস্তল দিয়ে এই গাড়ির পেটস্ল ট্যাংকের দিকে ইঙ্গিত করল সে লম্বা লোকটাকে। ‘হাঁ করে কি দেকচিস, হারামজাদা, ঢাল্ পেট্টোল যা আচে! একেবারে টই-টুম্বুর করে দিবি।’

লোকটা একবার রানা এবং গিলটি মিয়ার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে পাইপ লাগাল সিট্রনের ট্যাংকের মুখে। খুশি হয়ে রানার দিকে ফিরল গিলটি মিয়া।

‘এ শালা খুব হারামী, স্যার। অ্যা…ত বড় এক যন্তোর লিয়ে মারতে উটেচিল আমাকে। প্রত্থম বলে; বনদো হয়ে গেচে দোকান। আমি বললুম দে বাবা, বিপদে পড়েচি, একটু নাহায়

সাহায্যই কর্। না। পচন্দ হলো না কতাটা। পোঁদ ঘুরিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকল গ্যারেজে। বুজলুম, সিদে আঙ্গ□লে ঘি উটবে না। কেমন একটু সন্দো হলো, গেলুম পিচু পিচু। ও বাবা! সাঁই করে চালাল যন্তোরটা মাতা সই করে। বাউলি কেটে সরে গেলুম। তারপর বের করলুম পেস্তলটা। এটা দেকেই শালার চক্কু চড়কগাচ! একেবারে ঠাণ্ডা। ফিরিজের পানি। টিন দুটো ভরে দিতেই এই পিচ্চি-লরীতে পেট্টোল ভরতে বললুম। ভাবলুম, আপনার সাথে এ লোকের আলাপ করিয়ে দোয়া দরকার। তাই ওরই গাড়িতে করে লিয়ে এলুম শালাকে আপনার কাচে। এবার কতা বলুন ওর সাতে, আমি টিন দুটো নামাই।'

ব্রেক-ডাউন ভ্যানের ট্যাংক থেকে অর্ধেকের বেশি পেট্রল চলে এল সিট্রনের ট্যাংকে। পাইপটা বের করে নিয়ে ট্যাংকের মুখ লাগাচ্ছে লোকটা, ভয়ে ভয়ে চাইছে গিলটি মিয়ার দিকে। ওর সামনে এসে দাঁড়াল রানা।

'আমাদের কাছে পেট্রল বিক্রি না করার হুকুম পেয়েছ?'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল লোকটা।

পিস্তলটা বের করল রানা, কিন্তু ততটা ভয় পেতে না দেখে খটাং করে লাথি মারল সে লোকটার হাঁটুর ছয় ইঞ্চি নিচে। 'কেঁউ' করে আর্তচিৎকার দিয়ে পা ভাঁজ করে চেপে ধরল লোকটা ব্যথার জায়গা।

'উত্তর দাও!' গর্জন করে উঠল রানা। 'আমরা বেপরোয়া লোক। খুন করতে বাধবে না!'

'টেলিফোন করেছিল আমার কাছে ওরা,' বলল লোকটা।

'তেল দিতে বারণ করেছিল?'

'হ্যাঁ। আর বলেছিল সম্ভব হলে যে-কোন রকম গোলমাল বাধিয়ে দেরি করিয়ে দিতে।'

'কতক্ষণ আগে ফোন পেয়েছ?'

'ঘণ্টাখানেক আগে।'

ভিতর ভিতর ভয়ানক বিচলিত হয়ে উঠল রানা খবরটা শুনে। তার মানে সিলভিও জানে ওরা কিসে করে কোনদিকে চলেছে। শুধু এয়ারপোর্টেই নয়, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স বা জার্মান বর্ডারেও ফাঁদ পাতা থাকবে ওদের জন্যে। পালাবার সব পথ বন্ধ করে দিয়ে তাড়া করে ধরা হবে ওদের এবার। এদেশেও পেট্রল চুরির দায়ে পুলিস লাগাবে নাকি ওদের পেছনে!

পেট্রলের দাম বাবদ যথেষ্ট পরিমাণ ইটালিয়ান কারেন্সি গুঁজে দিল রানা লোকটার হাতে।

'শোনো,' বলল রানা। 'কোসা নোস্ট্রার দুই দলের মধ্যে গোলমাল লেগেছে। এর সাথে নিজেকে জড়াতে গেলে মারা পড়বে যে-কোনও দলের হাতে। পাম্প বন্ধ করে বাড়ি চলে যাও। মুখ থেকে একটা কথা বের করলেই খুন হয়ে যাবে। আমার আরও লোক আসছে সেন্ট মরিয থেকে। সাবধান! ভাগো এখন।'

ভ্যানটা ঘুরিয়ে নিয়ে তুফান বেগে রওনা হয়ে গেল লোকটা। রানা উঠে পড়ল সিট্রনের ড্রাইভিং সীটে।

সারাগানস পেরিয়ে ওয়ালেনস্টাডের দিকে রওনা হলো সিট্রন ডি. এস.। পুরো একটা ঘণ্টা নষ্ট হয়ে গিয়েছে পেট্রলের গোলমালে, সেটা পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে রানা বিপজ্জনক ভাবে গাড়ি চালিয়ে। অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে হাঁপিয়ে উঠল গিলটি মিয়া। খানিক উসখুস করে আপন মনে কথা বলতে শুরু করল।

'কিন্তুক এই দেরি করিয়ে দিয়ে লাব কি ওদের?'

'আমাদের যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে না ওদের?' বলল রানা। 'একটা ঘণ্টা অনেক সময়। এতক্ষণে তৈরি হয়ে গেছে ওরা। মুশকিল হচ্ছে আমরা কোন্ পথে কোন্ দিকে চলেছি জানা আছে ওদের, কিন্তু আমরা ওদের

কোন খবর পাচ্ছি না।'

'ঠিক বলেচেন। কি মতলব ঠাউরেচে টের পাওয়া যাচ্চে না। পথেই এঁটকে দোয়ার ব্যবস্তা করেচে কিনা জানা নেই আমাদের। আমি ভাবচি কি, পেলেনে আমাদের যাওয়ার দরকার কি? যে-কোন একটা বডারের দিকে রওনা দিলে কেমন হয়?'

'অসুবিধে আছে। এই ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে আমরা যা খুশি তাই করতে পারি না। তাছাড়া অত ঝুঁকি না নিয়ে জুরিখেই যদি ওদের কোন কৌশলে ফাঁকি দিতে পারি তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়। দেখা যাক, একটা না একটা বুদ্ধি এসে যাবে মাথায়, যাতে সময়ও বাঁচবে, পরিশ্রমও বাঁচবে।'

ওয়ালেন লেক ছাড়িয়ে এসেছে ওরা বেশ কিছুক্ষণ হয়, দূরে টলটলে পানিতে আলোর প্রতিবিম্ব দেখে রানা বুঝল এসে গেল জুরিখ লেক। আর পঁচিশ মাইল। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় পথে আক্রমণ আসবার সম্ভাবনা কমে গেছে বেশ খানিকটা। লেকের ধার ঘেঁষা রাস্তা দিয়ে ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে ছুটছে ওরা। হঠাৎ কথা বলে উঠল রানা।

'একটা বাঙালী হোটেল চিনি আমি। ওখানেই উঠব আপাতত। তারপর দেখা যাবে কি করা যায়।'

'এই গাড়িটা হোটেলের সামনে দেকলে বুজে নেবে ওরা কোথায় উটেচি আমরা।'

'এটাকে ইউরোপা হোটেলের সামনে ছেড়ে দেয়ার কথা আছে রেন্ট-এ কার কোম্পানীর ম্যানেজারের সাথে। সেটা করতে যাওয়া আমাদের জন্যে বিপজ্জনক হবে। যে কোন একটা হোটেলের সামনে ছেড়ে দেব, খুঁজে নিক ওরা। পায়ে হেঁটে চলে যাব আমরা প্যালেস হোটেলে।'

জুরিখ পৌঁছে ঘড়ি দেখল রানা। রাত নয়টা। আধ ঘণ্টা পুষিয়ে নিয়েছে সে বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে

আধ মাইল হেঁটে প্যালেস হোটেলে গিয়ে হাজির হলো ওরা। ধূলি-মলিন জামা-কাপড় দেখে রিসেপশন-ক্লার্ক প্রথমটায় তেমন আমল দিতে চাইল না। ম্যানেজারের সাথে দেখা করার প্রস্তাবে একটু সচকিত হলো। রানা যখন বলল, এই হোটেলের মালিকের সাথে সে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত, তখন ব্যস্ত-সমস্ত ভঙ্গিতে নিয়ে গেল ওদেরকে ম্যানেজারের বন্ধ দরজার সামনে। চোখ বড় বড় করে বলল, 'ভয়ানক রাগী লোক, স্যার! আপনারাই ঢুকুন।'

বিরাট একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে সুইভেল চেয়ারে বসে কাগজপত্র ঘাঁটছে ধোপ দুরস্ত জামাকাপড় পরা একজন প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া লোক। রানাকে ভ্রূ কুঁচকে দেখল আপাদমস্তক। কিন্তু গিলটি মিয়ার দিকে চোখ পড়তেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। কপালে উঠেছে ওর ভুরু জোড়া।

'আমনে! উস্তাদ! আমনে কৈত্থন!'

'কে! লেদু না? লাম্বা আহাম্মুক!' হাসি ফুটে উঠল গিলটি মিয়ার ঠোঁটে। 'তুই কি করচিস এখেনে?'

প্রকাণ্ড টেবিল ঘুরে এসে একেবারে পায়ে হাত দিয়ে সালাম শুরু করল ঝাড়া ছ'ফুট লম্বা লোকটা গিলটি মিয়াকে। উঠে দাঁড়ালে আর নাগাল পাবে না, তাই বাঁকা থাকতে থাকতেই চট করে থুতনি ধরে আদর করল গিলটি মিয়া ওকে।

বসল সবাই। একগাল হাসল গিলটি মিয়া।

'কতদিন দেকা নেই! জেল থেকে বেরোলি কবে?' রানার দিকে ফিরে বলল, 'আমার স্যাঙাৎ, স্যার।'

'কি কমু, উস্তাদ! দুক্কের কতা কি কমু। স্বাদীনতার লগে লগেই দ বাইরোয়া পরছিলাম। কই যাই ভাবতাছি, ইমুন সময় কানডা চাইপপ্তা দরল আমার চাচায়। আইন্যা ফালাইল এই ফডোলে। কয়, দেহি কত চুরি করবার পারস। পরথম তিনডা মাস বুক বাসাইয়া কানলাম, উস্তাদ। তারপর শুরু করলাম।

তিনডা বছরে, উস্তাদ, থুই নাই কিসু। সুইস ব্যাঙ বইরা ফালাইবার দশা করছিলাম, অহন হুনি আমার নামেই লেইখ্যা দিতাসে চাচায় এই ফডোল। হালার মাইয়াডারে আবার বিয়া কইরা ফালাইসি দ!'

'বিয়েও করে ফেলেচিস! বাহ! তাইলে তো বেশ সুকেই আচিস মনে হচ্চে।'

'না, উস্তাদ। দ্যাশের লাইগ্যা পরানডা পুরে! যাউগ গা, আমনের খবর কন। ইয়ানো ক্যামনে কৈত্থন আইলেন?'

'সে অনেক হিস্টিরী। অত কতা বলবার সোমায় নেই। অল্প কিছুক্ষণ আচি। চলে যাব আজই। আমাদের পেচনে আবার বাজে লোক লেগে আচে। ওদের চোক ফাঁকি দিয়ে আজই পালাতে হবে আমাদের।'

'আমি থাকতে আর কুনো চিন্তা নাই, উস্তাদ। কি লাগবো খালি হুকুম করবেন, আইন্যা হাজির করুম।'

রানার দিকে ফিরল গিলটি মিয়া।

'কি কি লাগবে বলে ফেলুন, স্যার। ছেলেটা ভাল। সাদ্য মতো করবে।'

'আপাতত একটা রূম দরকার। আধ ঘণ্টার মধ্যে রূমে বসে আমরা খেয়ে নিতে চাই। আর, কেউ আমাদের কথা জিজ্ঞেস করলে বলতে হবে যে আমরা এই হোটেলে উঠিনি। ব্যস, এই।'

'এইডা কুনো কাম অইলো, স্যার? কি মুসিবতে পরছেন, আমি কি সাইয্য করার পারি, হেইডা না কইবেন।'

'ও ব্যাপারে আপনার কিছুই করবার নেই,' বলল রানা। 'কোসা নোস্ট্রা।'

'সারসে! আই সব্বোনাশ! এইডা কি কন!' ফ্যাকাসে হয়ে গেল ম্যানেজারের মুখটা। 'হ্যাগোর লগে বাইজ্যা বইসেন! ঠাইট মাইরা লাইব দ।'

'সেইজন্যেই আপনাকে এর মধ্যে জড়াতে চাই না। রিসেপশন ক্লার্ককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আপনি নিজে যদি আমাদেরকে ঘরে পৌঁছে দেন তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়।'

'একশৎ বার। আমনেরা বয়েন, আমি নিজে গিয়া হ্যারে কইয়া আহি আগে।'

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে একটুও ভুল করেনি লোকটা। দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

'গুরুভক্তির নমুনা দেকে তো মনে হয় যেটুকু কাজ দোয়া হয়েচে ঠিক ঠিকই করবে। কিন্তুক বে-থা করে সংসারিক হয়েচে একোন, ওকে এসবের মদ্যে না জড়িয়ে ভালই করেচেন, স্যার।'

টেবিলের উপর থেকে টেলিফোন ডাইরেক্টরীটা টেনে নিয়ে এয়ারপোর্টের নম্বর বের করল রানা। রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করল। জানা গেল, লণ্ডনের দুটো ফ্লাইট আছে আজ- একটা সাড়ে এগারোটায়, অপরটা রাত দেড়টায়।

লম্বা পা ফেলে ঘরে এসে ঢুকল লেদু।

'আহেন আমার লগে। খারোন, এই দরজাটা দিয়া লই।' ভিতর থেকে দরজা লাগিয়ে দিয়ে ডাকল, 'আহেন। এই দিক দা।'

একটা সাইড ডোর দিয়ে বের করে নিয়ে এল ম্যানেজার ওদের নির্জন করিডরে, কয়েক পা এগিয়ে লিফট। লিফট এসে থামল পাঁচ তলায়। লম্বা করিডর ধরে এগিয়ে চারশো ছেচল্লিশ নম্বর কামরায় চাবি লাগাল ম্যানেজার। ঘর খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খানা কি খাইবেন, উস্তাদ? দেশী না বিদেশী?'

'দেশী, দেশী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল গিলটি মিয়া। 'সবচে ভাল হয় যদি ডাল, ভাত, আলুভত্তা আর কাঁচামরিচের ব্যবস্তা করতে পারিস।'

হাসল ম্যানেজার। মাথা নাড়ল।

‘উস্তাদের ডাইল খাওনের শখ রইছে দেহি অহনও? কিন্তুক ফিডাইয়া মাইরা লাইব আমারে বউয়ে যদি হুনে উস্তাদেরে ডাইল-বাত খাওয়াইয়া বিদাই দিসি। বড় ডরাই হুযুর, অরে খবর না দিলে জবর গোশ্‌শা অইব। ডাইলের কতা কমুনে, বাকিডা হ্যার হাতেই ছাইরা দেই, কি কন?’ রানার দিকে ফিরল, ‘আর আমনেরে কি খাতির করুম, স্যার? কি খাইবেন?’

‘আমাকে বিশেষ কোন খাতির করতে হবে না,’ মৃদু হাসল রানা। ‘এক খাতিরেই আমাদের দু’জনের হয়ে যাবে। তবে খাতিরটা একটু তাড়াতাড়ি করুন। সাড়ে এগারোটার ফ্লাইটে লণ্ডনের প্লেন ধরবার চেষ্টা করব আমরা।’

ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলে যাচ্ছিল ম্যানেজার, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

‘আমনেরে কি নামে খুজ করব হ্যারা এইডা দ জিগান হয় নাই?’

‘মাসুদ রানা।’

দুই চোখ কপালে উঠল ম্যানেজারের।

‘হাইরি সব্বোনাশ! আমনেই হেই মাসুদ রানা সায়েব! কি খুশির দিন রে! কী সৌবাইগ্য আইজ আমার! কার মুখ দেইখ্যা উটছিলাম আইজ ঘুম থেইক্যা। এই বিদ্যাশে হটেশ আইসা হাজির আইজ আমার ওস্তাদে, আর তিন বচ্ছর দইরা বিয়ান হাইঞ্জা বেলা যার নাম হুনতাছি হউরের মুখে, দেহা তার আইজই পাইলাম! কী আচাইয্য! অক্ষণে ফাল দিয়া আয়া পরব চাচায় খবর হুনলে। আমনেই না বাচাইছিলেন হ্যারে ডামুইডিয়ায় ডাহাইতের হাত থন?’

‘পা কি ভাল হয়ে গেছে ওর?’

‘না, স্যার। ডাইন ফাওডা কাইট্টা লাইসে। কাডের ফাও দা আড়ে।’

ঘড়ি দেখল রানা।

‘আমরা কাদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি বলেছি আপনাকে। আমাদের উপস্থিতিটা যত কম জানাজানি হয় ততই ভাল। বুঝতে পেরেছেন?’

‘বুঝলাম। খামোশ খায়া থাহন লাগব। আইচ্চা, কবুল। আমনেরা জিরাইয়া লন, আমি খাওনের বন্দোবস্তডা করি।’

ম্যানেজার বেরিয়ে যেতেই দরজা লাগিয়ে দিয়ে বাথরূমে গিয়ে ঢুকল রানা। সেই পুরানো জামাকাপড়ই পরতে হলো, কিন্তু দাড়ি কামিয়ে, দাঁত মেজে, স্নান সেরে নতুন গেঞ্জি ও জাঙ্গিয়া পরে রীতিমত আরাম বোধ করল সে। বেরিয়ে এসে নরম বিছানায় শুয়ে সিগারেট ধরাল। গিলটি মিয়া গিয়ে ঢুকল বাথরূমে।

গত কয়েকদিনের পরিশ্রমের পর নরম বিছানা পেয়ে দু’চোখ ভেঙে ঘুম আসতে চাইছে রানার। চোখ লেগে আসছিল, এমনি সময়ে খুট করে বাথরূমের দরজা খুলে গিলটি মিয়া বেরিয়ে এল। কেটে গেল তন্দ্রার ভাবটা। খাট ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করল সে।

আশ্চর্য করিৎকর্মা লোক লেদু। আধঘণ্টার মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে দু’জন বেয়ারার হাতে মস্ত দুটো ট্রে ভর্তি খাবার নিয়ে হাজির হলো। দরজায় টোকা দিতেই পিস্তল হাতে বাথরূমে গিয়ে দাঁড়াল রানা, গিলটি মিয়াকে ইঙ্গিত করল দরজা খুলে দেয়ার জন্যে। ম্যানেজার এসে ঢুকতেই পিস্তলটা যথাস্থানে গুঁজে বেরিয়ে এল বাথরূম থেকে।

বেয়ারাদের বিদায় দিয়ে দরজা লাগিয়ে এসে পরিবেশনে মন দিল ম্যানেজার।

এত রকমের ব্যঞ্জন দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল এর বেশির ভাগই তৈরি হয়েছে বাড়িতে। প্রথমে খুব খুশি হয়ে উঠল গিলটি মিয়া, তারপর গম্ভীর হয়ে গেল।

‘এটা কি করেছিস, লেদু? তোদের নিজেদের খাবার উটিয়ে লিয়ে এসেচিস নিচ্চয়? এত রান্না তো আদঘণ্টায় হয় না?’ হাত গুটিয়ে নেয়ার উপক্রম করল সে।

একেবারে মোক্ষম অস্ত্র ছাড়ল লেদু।

‘আমার লগে তেরিবেরি খাটব না, উস্তাদ। আমনে অহন খাওন বন্দ করলে তিন দিন আমি কিচ্চু খামু না কইয়া দিলাম। আল্লার কসম! আমি জবান লারি না, আমনে দ জানেন।’ পরাজিত ভঙ্গিতে আবার খাওয়ায় মন দিতে দেখে বলল, ‘আমি শুদু কইসি আমার মইদ্যে যেটুকু বুরা দ্যাহ, হেইটুক আমার বাপ-চাচার থন পাইসি; আর যেটুকু বালা দ্যাহ, হেইটুক দিসে আমার উস্তাদে। বাস, আর কিচ্চু কওন লাগে নাই। যুর কইরা যা আছিল্ সব তুইলা দিছে বউয়ে। হেতিয়ে কয়, আবার ফাক করতে নাই দুইগণ্টা দেরি অইব, যা আছে লইয়া যাও স্বপনের বাপ...’

খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনর্গল গল্প করল ধোপ-দুরস্ত বিদেশী কাপড় পরা ম্যানেজার খাস দেশী বাংলায়। এটা ওটা তুলে দিল, না খেতে চাইলে ঝগড়া করল। খাওয়া শেষ করে হাত মুখ ধুয়ে আসতেই পাড়ল আসল কথা।

‘একজনে আইছিল, স্যার। জিগায়া গেছে আমনেগো কতা।’

‘কখন এসেছিল?’

‘এই দশ-পনেরো মিনিট অইব। কেরানী কইছে, না, এই ফডোলে উডে নাই হ্যারা। কিন্তুক বিশ্বাস যায় নাই। রেসটি খুইলা দেইখা তারপর গেছে।’

‘চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন?’

‘বাইঠা। মোডা। কালা স্যুট আছিল পরনে। ইডালীর লোক বইলা মালুম হয়।’

‘গীয়ান!’ গিলটি মিয়ার দিকে চেয়ে বলল রানা। ‘তার মানে জুরিখে পৌঁছে গেছে সিলভিও দলবলসহ।’

একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরময় বার দুই পায়চারি করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। ফিরল লেদুর দিকে।

‘এখান থেকে ইণ্ডিয়ান কনসুলেট কতদূর?’

‘আদা মিনিটের রাস্তা,’ বলল ম্যানেজার। ‘বাইরোইয়াই বাও দিকে গেলে ছয়-সাত বিল্ডিং পার অইলে ছাতের উপর ফেলেগ দেহা যাইব। ঈডাই।’

‘ভেরি গুড। দশ মিনিট একা থাকতে চাই আমরা। তারপর এই হোটেলের পিছন দিয়ে বেরোবার কোন রাস্তা থাকলে সেই পথে বেরিয়ে যেতে চাই।’

‘একশৎ বার,’ বলল ম্যানেজার। টিপ দিল কলিং বেলে। ‘আমি নিজে রাস্তা দেহাইয়া দিমু।’

দুই বেয়ারার সাহায্যে এঁটো থালা বাসন নিয়ে চলে গেল সে। দরজা লাগিয়ে দিল গিলটি মিয়া।

‘কনসুলেটের কতা জিজ্ঞেস করলেন কেন? কি করবেন ভাবচেন, স্যার?’

‘একটা ধোকাবাজির প্ল্যান এসেছে মাথায়। দেখা যাক কাজে লাগে কিনা।’

নীল প্লাস্টিক মোড়া প্যাকেটটা বের করল রানা। ছোট্ট লাল বইটা বের করে রাখল জ্যাকেটের সাইড পকেটে। তারপর টেবিলের উপর রাখা একখানা স্ক্রিব্‌লিং-প্যাড থেকে গোটা বিশেক কাগজ খসিয়ে নিয়ে চারভাঁজ করল। ওজনটা পছন্দ হলো না, পিস্তল থেকে একটা বুলেট বের করে গুঁজে দিল একটা ভাঁজে। এবার ইলাস্টিক ব্যাণ্ড মুড়ে রাখল ওটাকে নীল প্লাস্টিকের খোলের মধ্যে। আবার ওজন নিয়ে সন্তুষ্ট হলো। তারপর খস-খস করে চিঠি লিখল একটা। সেটাকে খামে বন্দী করে খামের মুখ আঠা দিয়ে লাগিয়ে প্লাস্টিক-প্যাকেট আর চিঠিটা রেখে দিল বুক পকেটে। তারপর সিগারেটে লম্বা করে একটা টান দিয়ে হাসল।

'ব্যাপারটা একটু বুজিয়ে দিন, স্যার। আমার মাতায় ঢুঁকচে না।'

টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার কানে তুলে নিল রানা।

'আমি লেদু, স্যার।' ম্যানেজারের কণ্ঠ ভেসে এল। 'এট্টু আগে আবোর আইছিল হেই গায়েন। মোডা লোকটা। ধমক দিয়া গেছে কেরানীরে। কয়, দুইজন টুরিসরে ঢুকতে দেহা গেছে এই ফডোলে।'

'সে কি উত্তর দিয়েছে?'

'হ্যায় কইসে বাইরোইতেও দেহা গেছে, তহন কি চক্ষু বুইজ্যা আছিলা? আইছিল্, আমরা খেদায়া দিছি। ফহির মিসকিন আর টুরিসের লগে আমগোর কুনো খাতির নাই।'

'ঠিক আছে। অনেক অসুবিধায় ফেললাম আপনাকে, কষ্ট দিলাম অনেক। এবার আমরা রওনা হতে চাই।'

'ঈতান কইয়া আর শরম দিয়েন না, স্যার। আমি আইতাসি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে রানা বলল, 'একে তো হোটেলের বিল দিতে যাওয়াটা উচিত হবে না, তাই না?'

'না, স্যার। বেইজ্জত করা হবে অনেকটা।'

'তাহলে এক কাজ করো,' পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল রানা। দশ-বারোটা পাঁচ হাজার লিরার নোট বের করে দিল গিলটি মিয়ার হাতে। 'ওর ছেলে স্বপনকে কিছু কিনে দিতে বোলো।'

'তাই ভাল, স্যার।'

'আবার এসেছিল গীয়ান। আমার মনে হচ্ছে ইণ্ডিয়ান কনসুলেটে পৌঁছানো সহজ হবে না।' দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। সেদিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'দেখো তো কে?'

পিস্তল হাতে আবার বাথরূমে ঢুকল রানা। সাবধানে দরজা

খুলে উঁকি দিল গিলটি মিয়া। ঘরে ঢুকল ম্যানেজার। বেরিয়ে এল রানা।

'এবার আমরা যাব। কোন্ পথে নামতে হবে দেখিয়ে দিয়েই আপনার ছুটি।'

'কন কি, স্যার। আমনেগো পৌচ্চায়া দিয়া তারপর ছুডি।'

'ওনার কতার ওপরে কতা বোলো না, লাম্বা আহাম্মুক!' ধমক দিল গিলটি মিয়া। 'নাও ধরো।'

নোট দেখে আঁৎকে উঠল লেদু। 'এইডা কি করতাছেন, উস্তাদ!'

'তোর জন্যে না রে, গাদা। এগুলো তোর ছেলের জন্যে। নে ধর্, কিচু কিনে দিস ওকে। খেলনা-ফেলনা যা তোর পচোন্দ হয় দিস।' নোটগুলো জোর করে লেদুর হাতে গুঁজে দিয়ে রাকস্যাকের দিকে ফিরল গিলটি মিয়া।

'ওগুলো থাক, গিলটি মিয়া, ও আর দরকার হবে বলে মনে হয় না।'

লিফটের মুখেই বিদায় নিল ওরা ম্যানেজারের কাছ থেকে। দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই নামতে শুরু করল লিফট। রানার দিকে ফিরল গিলটি মিয়া।

'কিন্তুক ব্যাপারটা আমি ঠিক বুজতে পারচি না, স্যার। কনসুলেটে যাচ্চি কেন? আর যাচ্চিই যদি, এত আগে কেন? এয়ারপোর্টে রওয়ানা দোয়ার সোমায়...'

'অনিল জানিয়েছে যত যাই ঘটুক না কেন রঞ্জন চৌধুরীর হাতে দিতে হবে আমার এই খাতাটা। কাউকে বিশ্বাস করতে বারণ করেছে। আমি করিও না। কিন্তু এমন ভান করতে চাই যেন খাতাটা আমি কনসালের হাতে তুলে দিচ্ছি। আসলে ওর ভিতর কি আছে তুমি তো জানোই! বিশেষ করে অনুরোধ করব আমি

যেন এটা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে করে খুবই গোপনীয়তা আর সাবধানতার সাথে রঞ্জন চৌধুরীর হাতে পৌঁছবার ব্যবস্থা করা হয়। আমার কথার ততটা গুরুত্ব না দিলেও একবার কলকাতায় রঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেই সতর্ক হয়ে যাবে কনসাল। আমার বিশ্বাস সিলভিওর লোক আছে ইণ্ডিয়ান কনসুলেটে। যত সাবধানই হোক না কেন খবরটা বেরিয়ে যাবেই। আমরা কনসুলেটে ঢোকার পর পরই খবর নেয়ার চেষ্টা করবে সিলভিও, কি করছি আমরা ওখানে। যেই জানবে যে একটা নীল প্লাস্টিক মোড়া প্যাকেট দিয়েছি আমরা কনসালকে, পেট চেপে ধরে হাসবে সে। কারণ ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ থেকে ওটা হাতানো ওর জন্যে ডালভাত। আমি আশা করছি, এই খবর জানার পর আমাদের পিছু ধাওয়া করা ছেড়ে দেবে সে, নিরাপদে উঠতে পারব আমরা প্লেনে। আমাদের সাথে ওর ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা নেই- ওর চাই শুধু প্যাকেটটা। আসল ব্যাপার টের পেতে পেতে আমরা ফুড়ুৎ করে উড়ে যাব নাগালের বাইরে।'

হেসে উঠল গিলটি মিয়া। 'দারুণ বুদ্ধি বের করেচেন, স্যার।'

'এখন কনসুলেট পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে হয়।'

লিফট থেকে বেরিয়ে ম্লান-আলোকিত একটা চত্বর পেরিয়ে রাস্তার পাশের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা।

চাপা গলায় বলল রানা, 'আমি দশ গজ এগিয়ে গেলে তারপর পিছু পিছু রওনা হবে তুমি।'

'গুলিটা যাতে আপনার ওপর দিয়েই যায়, সেজন্যে?'

'তর্ক কোরো না, গিলটি মিয়া। যা বলছি তাই করো। আর, যদি গুলি ছুঁড়তে হয়, চোখ সই করে মারবে।'

সাবধানে দরজা খুলে মাথাটা বের করল রানা বাইরে।

বেশ চওড়া রাস্তা। দূরে দূরে এক একটা ল্যাম্প পোস্ট ফুটপাথের খানিকটা অংশ আলোকিত করেছে। বাকি অংশ

অন্ধকার। যে কোন সংখ্যক লোক বাড়িগুলোর গেটের পাশে, বাগানে, বা দরজার কাছে অন্ধকার ছায়ায় লুকিয়ে থাকতে পারে। আগে থেকে বুঝবার কোন উপায় নেই।

পিস্তলটা বের করে হাতে নিল রানা। দ্রুতপায়ে এগোতে শুরু করল দেয়াল ঘেঁষে।

একটা বাড়ির মাথায় ফ্ল্যাগ দেখতে পেল রানা। কাছেই। আর তিনটে বাড়ির পর।

চট করে ঘাড় ফিরিয়ে গিলটি মিয়াকে খুঁজল রানা। পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু ও জানে, কাছেই কোথাও আছে সে।

হঠাৎ রাস্তার অপর পাশে একটা বাড়ির দরজার সামনে ম্যাচ জ্বলে উঠল। কিন্তু সিগারেট না ধরিয়ে রাস্তার উপর ছুঁড়ে ফেলল লোকটা জ্বলন্ত কাঠি।

মুহূর্তে বুঝতে পারল রানা, এটা কোনও সংকেত। দৌড় দিল সে। পিছনে কোথাও মৃদু গর্জন করে স্টার্ট নিল একটা গাড়ির এঞ্জিন- স্পষ্ট শুনতে পেল সে। এগিয়ে আসছে।

গিলটি মিয়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেল রানা পিছনে। দৌড়াচ্ছে সে-ও।

পিছনে গাড়ির এঞ্জিনের শব্দটা দ্রুত এগিয়ে আসছে, অনেক কাছে চলে এসেছে সেটা। হঠাৎ রানা বুঝতে পারল কনসুলেটে পৌঁছবার আগেই গাড়িটা ওভারটেক করবে ওকে।

পিছন ফিরে চাইল রানা।

কালো একটা গাড়ি ছুটে আসছে তীর বেগে। আলো নেভানো। রানা চাইতেই দপ করে জ্বলে উঠল চারটে হেডলাইট। মুহূর্তে চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না সে আর চোখে। দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

'শুয়ে পড়ুন, স্যার! গুলি করবে!' গিলটি মিয়ার গলার আওয়াজ পেল রানা।

কড় কড় করে গর্জে উঠল একটা এল. এম. জি. গাড়ির ভিতর থেকে। গতি কমাচ্ছে গাড়িটা। ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে রানা ফুটপাথের উপর। ফুলঝুরির মত আলোর ফুলকি বেরোচ্ছে মেশিন গানের মুখ দিয়ে। পিছনের দেয়ালটা ঝাঁঝরা হয়ে গেল। গুলি করল রানা।

গাড়ির ভিতর আর্তনাদ করে উঠল একজন লোক। পরমুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল আরেকজন। রানা বুঝল দ্বিতীয়জন চিৎকার করেছে গিলটি মিয়ার নিঃশব্দ গুলি খেয়ে। হঠাৎ গতি বেড়ে গেল গাড়িটার। সাঁ করে বেরিয়ে গেল সেটা, অদৃশ্য হয়ে গেল বাঁয়ে মোড় নিয়ে।

উঠে দাঁড়াচ্ছিল রানা, ঝপ করে শুয়ে পড়ল আবার। রাস্তার অপর পারে দরজার আড়ালে দাঁড়ানো লোকটা গুলি করল। রানার চামড়ার জ্যাকেটের খানিকটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল গুলিটা কাঁধ ঘেঁষে।

গুলি করল রানা।

এলোমেলো পা ফেলে আলোকিত রাস্তায় বেরিয়ে এল একজন লোক, শরীরটা বাঁকা হয়ে আছে সামনের দিকে, চার-পাঁচ পা এগিয়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে রাস্তার ওপর উপুড় হয়ে।

গিলটি মিয়াকে দেখা গেল এবার, লম্বা পা ফেলে দৌড়ে আসছে এদিকে। এক লাফে উঠে দাঁড়াল রানা। প্রাণপণে ছুটল দু'জন কনসুলেটের গেটের দিকে।

দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দু'জন। এমনি সময় দু'পাট খুলে গেল বন্ধ দরজাটা। স্টেনগান হাতে বেরিয়ে এল দু'জন প্রহরী।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা ও গিলটি মিয়া। মাথার উপর হাত তুলল রানা। দেখাদেখি গিলটি মিয়াও।

'ব্যাপার কি? থার্ড ওয়ার্লড্ ওঅর?' প্রশ্ন করল একজন

সিকিউরিটি গার্ড।

'কনসালের সঙ্গে জরুরী দরকার আছে আমার,' বলল রানা। 'একটু আগে যে আওয়াজ পেয়েছেন, সেটা আমাকে খুন করবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস। শিগগির ঘরের ভেতর ঢুকে না পড়লে আবার গুলি হবে।' রাস্তার দিকে চেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল রানা। আসছে আবার গাড়িটা। ওটার মধ্যে থেকেই গুলি করা হয়েছিল।

'আপনারা ভারতীয়? বাঙালী?'

'বাঙালী, কিন্তু ভারতীয় নই, বাংলাদেশের লোক। তাড়াতাড়ি করুন, এসে পড়ল!'

তর্কের ভঙ্গিতে শুরু করল একজন, 'বাংলাদেশের লোক হলে এই কনসুলেটে কেন? আপনাদের কনসুলেট…'

গতি কমে আসছে গাড়িটার। দ্বিতীয়জন বুঝতে পারল ব্যাপারটার তাৎপর্য। কিন্তু স্টেন গানের মুখটা সরল না।

'জলদি ঢুকে পড়ুন!'

ঢুকে পড়ল রানা ও গিলটি মিয়া।

'দরজার সামনে থেকে সরে যাও। গিলটি মিয়া। দেয়ালের আড়ালে!' চাপা গলায় বলল রানা।

চট করে সরে গেল গিলটি মিয়া। রানাও সরল, এবং হ্যাঁচকা একটানে সরিয়ে আনল বোকা প্রহরীটাকে খোলা দরজার সামনে থেকে।

পরমুহূর্তে আবার গর্জে উঠল মেশিনগান। ক্ষিপ্ত বোলতার মত বোঁ বোঁ আওয়াজ তুলে একঝাঁক গুলি ঢুকল খোলা দরজা দিয়ে। আন্দাজের উপর নির্ভর করে শুধু ডান হাতটা বের করে গুলি করল রানা। থেমে গেল মেশিনগান, গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ বাড়ল। ছুটে গিয়ে একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল রানা রাস্তার উপর পড়ে থাকা দেহটা তুলছে দু'জন লোক গাড়িতে। তিন সেকেণ্ড পর তীরবেগে যে পথে এসেছিল সেই পথে অদৃশ্য হয়ে গেল

কালো গাড়িটা।

দরজাটা বন্ধ করে রানার দিকে ফিরল বোকা প্রহরীটা।

'আমার প্রাণ রক্ষা করার জন্যে ধন্যবাদ, মিস্টার...'

'মাসুদ রানা।' কথা জুগিয়ে দিল গিলটি মিয়া একগাল হেসে। 'ওনার নাম মাসুদ রানা।'

দশ

ইণ্ডিয়ান কনসুলেটের প্রকাণ্ড একটা গাড়িতে এয়ারপোর্টের দিকে চলেছে রানা ও গিলটি মিয়া। ড্রাইভারের পাশে বসে আছে একজন আর্মড্ গার্ড। পিছনে দুটো মোটর সাইকেলে করে চলেছে দু'জন স্টেন-গানধারী সিপাই। সতর্ক। প্রস্তুত।

কনসাল ভীমসেন নায়ার খুবই দ্রুত কাজ করেছেন বলতে হবে। আসলে কনসুলেটের উপর এই সশস্ত্র হামলায় খেপে একেবারে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এখানে ওখানে ফোন করে ঠাণ্ডা জুরিখ শহর গরম করে তুলেছিলেন। রানার বক্তব্য শুনে, এবং নীল প্যাকেটটার মধ্যে ভারতের জন্যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে আঁচ করতে পেরে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন আরও বেশি। কথা দিলেন, রানার এত কষ্ট স্বীকার করে এত দূর থেকে বয়ে আনা প্যাকেটটা তিনি যথেষ্ট সাবধানতার সাথে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে করে কলকাতায় পৌঁছবার ব্যবস্থা করবেন। এতসব উত্তেজনার মধ্যেও গোপনে একবার কলকাতার সাথে যোগাযোগ করতেও ভুললেন না ভীমসেন।

রঞ্জন চৌধুরীর সাথে তাঁর কি কথা হয়েছিল রানা জানে না, কিন্তু পনেরো মিনিট পর যখন ভীমসেন নায়ার আবার এসে

ঢুকলেন ওয়েটিং রুমে, স্পষ্ট অনুভব করতে পারল রানা, বিন্দুমাত্র সন্দেহের চিহ্নও নেই তখন আর তাঁর মনে। রানার নিরাপত্তার কথা ভেবে গাড়ি আর গার্ডের ব্যবস্থা করে ফেললেন দশ মিনিটের মধ্যে। টেলিফোনে বুক করে ফেললেন টিকেট। এখন বাকি শুধু প্লেনে উঠে বসা। সাধ্যমত সবই করেছেন ভদ্রলোক।

'এ যাত্রা বোধায় বেঁচে গেলুম, স্যার।' দূর থেকে এয়ারপোর্টের বাতি দেখে একগাল হাসল গিলটি মিয়া। 'উফ্, কম ধকলটা যায়নি এ ক'টা দিন! কিন্তুক মজাও লেগেচে দারুণ। কি বলেন? পেলেনে উটে এমন এক ঘুম দোব না...'

রিসেপশন অফিসের কাছে থেমে দাঁড়াল গাড়িটা।

'আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি জেনে আসি কত নম্বর রানওয়েতে রয়েছে প্লেন।'

গার্ডটা গাড়ি থেকে নেমে যেতেই গাড়ির দুই পাশে এসে দাঁড়াল মোটর সাইকেল আরোহী দু'জন। সতর্ক। প্রস্তুত। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইছে চারদিকে।

তিন মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল গার্ডটা রিসেপশন অফিস থেকে।

'এই যে আপনাদের টিকেট।' অ্যালিটালিয়ার মার্কা মারা দুটো টিকেট এগিয়ে দিল গার্ড। 'দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে আপনাদের। বে ফাইভে আছে প্লেনটা। আপনারা উঠবার আগে ওটা সার্চ করে দেখার অর্ডার আছে আমার ওপর। অবশ্য সার্চ করতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'লাগুক, লাগুক!' সোৎসাহে বলল গিলটি মিয়া। 'ভাল করে খোঁজো বাওয়া, বোম-টোম থাকলেই গেচি।'

গাড়িতে উঠে বসল গার্ড। টারমাকের উপর দিয়ে বে-ফাইভের দিকে চলল গাড়ি দ্রুত বেগে। ওখানে একটা রিসেপশন রুমের সামনে জনা পাঁচেক লোক দাঁড়ানো।

পিছন দিক দিয়ে ঘুরে ভি. আই. পি. লেখা একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা।

'ভেতরে ঢুকে পড়ুন, স্যার,' বলল গার্ডটা। 'বাইরে একজন পাহারা দেবে, আর আমরা বাকি দু'জন যাব প্লেনটা সার্চ করতে। অল ক্লিয়ার দেখলে আমি ডাকব আপনাদের।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা।

দ্রুত পায়ে চলে এল রানা ও গিলটি মিয়া কামরার মধ্যে। ঘরের ভিতরটা একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল গার্ড, কি যেন আদেশ দিল কাউকে, তিন সেকেণ্ড পর চলে গেল মোটর সাইকেল দুটো।

ফোমের সোফায় বসে এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত হাসল গিলটি মিয়া।

'খাতিরটা দেকেচেন, স্যার? আরও অনেক আগেই কোনও কনসুলেটে যাওয়া উচিত ছিল আমাদের। তাই না?'

জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল রানা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাল বাম থেকে ডাইনে। এত সহজে ছেড়ে দেবে ওদের সিলভিও? শেষ চেষ্টা করবে না একবার?

'সরে আসুন, স্যার।' বলল গিলটি মিয়া। 'জানালার কাচে না দাঁড়ানোই ভাল। বলা তো যায় না...' আঁৎকে উঠে থেমে গেল গিলটি মিয়া। ওরা যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল তার উল্টো দিকের দরজাটা ফাঁক হয়ে গেছে। সেই ফাঁকে দেখা যাচ্ছে একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ কোল্ট অটোমেটিক। পিস্তলধারী এক পা এগিয়ে আসতেই চিনতে পারল সে সিলভিওকে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'এই সেরেচে! এ-লোক থাকে পাতায় পাতায়।'

'এক পা নড়লে মারা যাবে, মাসুদ রানা,' বলল সিলভিও চাপা গলায়। গিলটি মিয়াকে বলল, 'তুমিও বসে থাকো চুপচাপ!'

পাঁই করে ঘুরল রানা। লাফ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা

করল কলজেটা বুকের ভিতর থেকে, পারল না। ধুপধাপ ধুপধাপ হাতুড়ি পিটে চলেছে হৃৎপিণ্ড।

সিলভিওর পিছু পিছু ঘরে ঢুকল লুইসা পিয়েত্রো।

'এই যে রানা, কেমন আছ?' হাসল লুইসা। 'বিদায় না নিয়েই চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছিলে যে?'

গোলাপী সিল্কের ব্লাউজ আর কালো একটা স্কার্টের উপর চমৎকার একখানা থ্রী-কোয়ার্টার মিংক কোট পরেছে লুইসা। স্বর্গের অপ্সরী মনে হচ্ছে ওকে দেখে। এগিয়ে এসে একটা সোফায় বসল লুইসা, রানার দিকে চেয়ে হাসল মিষ্টি করে।

'এই যে, কি খবর!' অনেক কষ্টে মুখের ভাব অপরিবর্তিত রেখে বলল রানা। জ্যাকেটের পকেটে রাখা লাল নোট বইটা স্পষ্ট ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। 'কিন্তু তোমাদের এবারের আবির্ভাবটা একটু অতিরিক্ত বিপজ্জনক হয়ে গেল না? দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন গার্ড, আরও দু'জন রয়েছে খুব কাছেই।'

'ও নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না,' বলল সিলভিও। 'বাইরের গার্ড আমার লোক। নোট বইটা এবার দিয়ে দাও লক্ষ্মী ছেলের মত। ওটা পেলে তোমাদের যাত্রায় আর কোন বিঘ্ন ঘটাব না আমি। না দিলে মারা পড়বে এক মিনিটের মধ্যে।'

'আমাদের মেরে এয়ারপোর্ট থেকে পালাতে পারবে না তুমি, সিলভিও। খামোকা ভয় দেখিয়ো না। সারা এয়ারপোর্টে যত গার্ড আছে সব তোমার লোক, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

'কথা বাড়িয়ো না, মাসুদ রানা। ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছেচি আমি। কেউ ঠেকাতে পারবে না আমাকে। দিয়ে দাও বইটা!'

আশ্চর্য রকম জ্বলজ্বল করছে সিলভিওর চোখ দুটো।

'প্লীজ, রানা!' কথা বলে উঠল লুইসা। ওর চোখে মিনতি আর উদ্বেগ। 'দিয়ে দাও ওটা। ও যা বলছে ঠিক তাই করবে। কি লাভ

অনর্থক প্রাণ দিয়ে? নোট বইটা দিয়ে দিলে সত্যিই ছেড়ে দেবে ও তোমাকে। কথা দিয়েছে ও।'

বেশ খানিকটা সামলে নিয়েছে রানা। মিষ্টি করে হাসল লুইসার দিকে চেয়ে।

'অপূর্ব সুন্দর লাগছে তোমাকে, লুইসা। মনে হচ্ছে তোমার অনুরোধ রক্ষা করে ফেলতাম যদি আমার পক্ষে সম্ভব হত। আসলে সত্যিই নোট বইটা আমার কাছে নেই।'

'কোন রকম ধোকাবাজি আর খাটবে না, মাসুদ রানা।' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল সিলভিও। 'দশ সেকেণ্ড সময় দেব তোমাকে, তারপর গুলি করব!'

ওর চোখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারল রানা, সত্যিই গুলি করবে সিলভিও।

'ওটা কনসালকে দিয়ে দিয়েছি আমি। এতক্ষণে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে পোরা হয়ে গেছে। নিরাপদে পৌঁছে যাবে ওটা কাল কলকাতায়।'

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল সিলভিও।

নিরুপায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। সহজ ভঙ্গিতে এসে বসল লুইসার পাশে।

'বিশ্বাস না করলে আমার কি করার আছে, বলো? সার্চ করে দেখতে পারো,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'ঠিক আছে, তাই করছি।' রানার উপর থেকে চোখ না সরিয়ে এক-পা পিছিয়ে গেল সিলভিও, দরজাটা একপাট খুলে ডাকল, 'গীয়ান! ভেতরে এসো!'

লুইসার একটা হাত তুলে নিল রানা নিজের হাতে। হাত বুলাল নরম মিংক কোটের হাতায়।

'সুন্দর কোটটা। মিংক পরলে অসুন্দরীকেও সুন্দর লাগে দেখতে, আর সুন্দরীকে লাগে অপূর্ব। তোমাকে আমার কেমন

লাগছে বলতে পারবে?'

'সুন্দরী...' কথাটা বলেই টের পেল লুইসা এই ধরনের আলাপের উপযুক্ত সময় এটা নয়। রানার চোখে স্থির হলো ওর উদ্বিগ্ন দৃষ্টি। সরাসরি কাজের কথায় এল সে। 'সত্যিই নেই ওটা তোমার কাছে?'

'আল্লার কসম!' হাসল রানা। 'তোমার ভাই আমাকে এত বোকা মনে করে কেন? আমি তো জানতাম এয়ারপোর্টে শেষ চেষ্টা করবে ও বইটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে। ওটা আমার কাছে রাখার চেয়ে কনসুলেটের ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে পাঠানো হাজার গুণ নিরাপদ।'

গীয়ান এসে ঢুকল ঘরে। কটমট করে চাইল রানার চোখের দিকে। রানা টের পেল নিশপিশ করছে ওর হাত, ছটফট করছে ভিতর ভিতর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে।

'এই দু'জনকে সার্চ করো, গীয়ান!' বলল সিলভিও। 'কি খুঁজছি তা তো তোমার জানাই আছে। জলদি!'

মাথার উপর হাত তুলে উঠে দাঁড়াল রানা। গিলটি মিয়ার দিকে চেয়ে বলল, 'কোন গোলমাল কোরো না, গিলটি মিয়া। যা বলে, করো। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই এখন।'

সার্চ শুরু করল গীয়ান।

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে গিলটি মিয়া।

রানার সারা শরীর সার্চ করে সরে দাঁড়াল গীয়ান। সিলভিওর দিকে ফিরল।

'নেই।'

'এবার ওই লোকটা,' বলল সিলভিও।

পিস্তলের ইঙ্গিতে মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াল গিলটি মিয়া। দক্ষ হাতে ওকেও সার্চ করল গীয়ান, তারপর সরে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ল। নেই।

'এবার সন্তুষ্ট হয়েছ?' বসে পড়ল রানা। 'পারলে না, সিলভিও। হেরে গেলে শেষ পর্যন্ত। ওটার কলকাতায় পৌঁছানো আর ঠেকানো গেল না। কালই রওনা হয়ে যাবে ওটা সশস্ত্র প্রহরায়।'

'ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের কথাটা আমাকে না বললেই ভাল করতে মাসুদ রানা।' চতুর একটুকরো হাসি খেলে গেল সিলভিওর ঠোঁটে। 'দাঁড়াও, এখনই তার প্রমাণ দিচ্ছি।' গীয়ানকে ইঙ্গিত করতেই রিভলভার বের করে তাক করে ধরল সে রানার বুকের দিকে। কোণের টেবিলের উপর রাখা টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল সিলভিও।

'ইণ্ডিয়ান কনসুলেট দিন দয়া করে,' বলল সিলভিও মাউথপিসে। পনেরো সেকেণ্ড চুপচাপ থেকে বলল, 'সুকান্ত পালিতকে দিন দয়া করে।' আবার খানিক চুপ। 'পালিত? এই কিছুক্ষণ আগে একটা জিনিস দিয়েছে মাসুদ রানা তোমাদের বসের হাতে।' তিন সেকেণ্ড বিরতি। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ! নীল প্লাষ্টিক মোড়া। দেখেছ ওটা তুমি?' বিরতি। 'আমি জানি, কলকাতায় যাচ্ছে।' আবার বিরতি। 'কি বললে? তোমারই ওপর ভার পড়েছে? ভেরি গুড! শোনো। ওটা আমার দরকার। বুঝতে পেরেছ? আধঘণ্টার মধ্যে আমার হাতে পৌঁছে দিতে হবে ওটা।' কয়েক সেকেণ্ড বিরতি। হেসে উঠল সিলভিও। 'অবশ্যই। এ চাকরি তোমার আজই শেষ। কাল থেকে আর যেতে হবে না কনসুলেটে। ঠিক আছে, রাখলাম। আধঘণ্টা পর আমার ওখানে আসছ তুমি।' রিসিভার নামিয়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে ফিরল সিলভিও রানার দিকে। 'শেষ পর্যন্ত কে হারল, মাসুদ রানা? পালিতের হাতেই ভার দেয়া হয়েছে ওটা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে ভরে কলকাতা পাঠাবার।' হাসল তৃপ্তির হাসি। 'কি লাভ হলো? এত ছোটাছুটি, এত দৌড়ঝাঁপ, এত লোকক্ষয়- কে জিতল শেষ পর্যন্ত?'

রেগে উঠে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রানা, ওর ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রাখল লুইসা।

'প্লীজ, রানা! হারজিত তো সব কিছুতেই আছে। সব সময় জিতলে চলে না, মাঝে মাঝে হারতেও হয়। চেষ্টার তো তুমি কোন ত্রুটি করোনি। মেনে নাও। ও ভয়ানক চতুর আর হারামী লোক। তাছাড়া তুমি তো একা, আর ওর হয়ে কাজ করছে হাজারটা লোক। ভয়ঙ্কর সব লোক। তুমি পারবে কেন?'

হাসল সিলভিও। 'ঠিকই বলেছে লুইসা। মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখবেন না, সিনর মাসুদ রানা। একটা ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ সংস্থার সাথে একা লড়ে আপনি আপনার পাঞ্জার যে জোর দেখিয়েছেন, আমি আজীবন শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখব সে কথা। চলুন, আপনাকে প্লেনে তুলে দিই এবার।' অস্ত্র পকেটে পুরল সিলভিও, কিন্তু হাতটা রয়ে গেল পকেটেই। গীয়ানও তাই করল। 'চলুন। দয়া করে বিদায়ের আগে আর কোন রকম গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করবেন না। খেয়াল রাখবেন দুটো পিস্তল আপনাদের দু'জনের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে প্রস্তুত আছে সর্বক্ষণ।'

'তুমি আসবে না আমাকে সী অফ করতে?' জিজ্ঞেস করল রানা লুইসাকে।

'নিশ্চয়ই!'

দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে ওরা টারমাকের উপর দিয়ে প্লেনের উদ্দেশে। রানার কনুই জড়িয়ে ধরেছে লুইসার কনুই। আবার কবে কোথায় দেখা হবে সে ব্যাপারে নিচু গলায় কথা হচ্ছে ওদের মধ্যে।

ছুটে এল একজন সুন্দরী এয়ার হোস্টেস।

'আপনি সিনর মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি আমরা। উঠে পড়ুন।'

‘যাচ্ছি। উঠে পড়ো, গিলটি মিয়া, আমি আসছি এক্ষুণি।’

তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল গিলটি মিয়া, সিঁড়ির মাথায় গিয়ে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাইল রানার দিকে। গেল কোথায় নোট বইটা!

লুইসার দিকে ফিরল রানা। একটা হাত চলে গেল ওর ক্ষীণ কটিতে। কাছে সরে এল লুইসা। আলতো করে ছোট্ট একটা চুমো খেলো রানা ওর ঠোঁটে। বলল, ‘আবার দেখা হবে।’

চোখ দুটো টলটল করে উঠল লুইসার। বলল, ‘ভায়া খণ্ডিওস্, মাই ডার্লিং।’

সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বার দুই হাত বুলাল রানা লুইসার বাহুতে, তারপর হঠাৎ ঘুরে তরতর করে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। শেষ ধাপে উঠে টা-টা করল সবাইকে। ঢুকে গেল ভিতরে।

বন্ধ হয়ে গেল দরজা। সিঁড়ি সরে চলে গেল।

গিলটি মিয়ার দিকে এগোতে গিয়েও থমকে গেল রানা। হাসিমুখে ডাকল ওকে অনিল। তরতাজা হয়ে উঠেছে বিশ্রাম পেয়ে।

‘পাশের সীটটা খালি আছে, রানা। বসে পড়ো।’

একসাথে গর্জে উঠল চারটে এঞ্জিন। রওনা হবে এখুনি। বসে পড়ল রানা।

‘ওরা জানে মারা গেছ তুমি,’ বলল রানা। ‘এসো যাবার আগে ওদের ভূত দেখানো চমকে দেয়া যাক।’

দু’জন চাইল জানালা দিয়ে বাইরে।

আর্ক লাইটের নিচে দাঁড়িয়ে আছে লুইসা, সিলভিও আর গীয়ান। হাত নাড়ল রানা।

রানার পাশের মুখটা দেখেই আঁৎকে উঠল ওরা তিনজন। হাঁ হয়ে গেছে ওদের মুখ, বিস্ফারিত তিন জোড়া চোখ। ধীরে ধীরে নড়তে শুরু করল প্লেনটা। শেষ চমক দিয়ে দিল রানা ওদের।

পকেট থেকে ছোট্ট একটা লাল নোটবই বেরিয়ে এল, সেটা নেড়ে টা-টা করল ওদের।

মুহূর্তে বুঝতে পারল ওরা, মস্ত ধোঁকা দিয়েছে রানা, কনসুলেটে জমা দেয়নি, নোটবইটা সাথে নিয়েই চলে যাচ্ছে সে। ঠেকাবার কোন রাস্তা নেই আর।

হতাশা, বিক্ষোভ, ক্রোধ, প্রতিহিংসা, এবং পরাজয়- সবগুলো ভাবের খেলা দেখতে পেল রানা সিলভিওর মুখে। নিজের অজান্তেই কয়েক পা দৌড়ে এল সিলভিও প্লেনের সাথে সাথে, তারপর দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল টারমাকের উপর।

রানওয়ের দিকে ছুটল প্লেনটা।

এগারো

ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল হলের উপর দিয়ে একটা পাক খেয়ে ঘুরে নামতে শুরু করল বি.ও.এ.সি। তিন মিনিটের মধ্যেই ল্যাণ্ড করবে দমদম এয়ারপোর্টে। কন্টিনেন্টাল হোটেলটা এক ঝলক দেখতে পেল রানা। মাত্র আটদিন! অবাক হয়ে ভাবল রানা, মনে হচ্ছে যেন কত যুগ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আসলে মাত্র আটদিন আগে রওনা হয়েছিল ও কলকাতা থেকে। কী বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে কেটেছে এই আটটা দিন, মনে হয় দিন তো নয়, যেন আট বছর কাটিয়ে এল সে ইউরোপে।

অথচ সব ঘটনা অনিলকে বলতে কত সময় লেগেছিল? পঁয়তাল্লিশ মিনিট!

‘কিন্তু তোমাকে প্লেনে ওঠার আগে যখন সার্চ করা হলো, তখন

বইটা পাওয়া গেল না কেন?' দমদমে নামার কয়েক মিনিট আগে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল অনিল।

এটা গিলটি মিয়ারও প্রশ্ন। ঠিক পিছনের সীটে বসেছে সে, সামনে ঝুঁকে এল উত্তরটা শোনার জন্যে।

হাসল রানা। 'সার্চ করবার ঠিক কয়েক সেকেণ্ড আগে লুইসার মিংক কোটের হাতার ভাঁজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম ওটা।'

'আচ্ছা!' চোখ কপালে উঠল অনিলের। 'সেই জন্যেই বিদায়মুহূর্তে অত প্রেম উথলে উঠেছিল তোমার? চুমু খাওয়ার ফাঁকে তুলে নিলে বুঝি ওটা আবার?'

'হ্যাঁ। এবার তোমার দিকটা শোনাও, অনিল। আমি কিন্তু সবটা ব্যাপার জানি না এখনও।'

'আমি তোমার মত গুছিয়ে বলতে পারি না,' বলল অনিল। 'তুমি প্রশ্ন করো, আমি উত্তর দিই।'

'বেশ আমি যেটুকু বুঝেছি, সেটা হচ্ছে সিলভিও পিয়েত্রোর গ্লাস ফ্যাক্টরির মাধ্যমে কোসা নোস্ট্রার ড্রাগ ট্রাফিক শুরু হয়েছিল ভারতে। খুব সম্ভব কাঁচের খেলনা, পুতুল বা ঘর সাজাবার কাঁচের সামগ্রীর মধ্যে করে আসত ওটা। এ ব্যাপারেই পাঠানো হয়েছিল তোমাকে ইটালীতে।'

'হ্যাঁ। দুই তরফা ট্রাফিক শুরু হয়েছিল। এখান থেকে যেত কাঁচামাল, ওখান থেকে আসত ফিনিশ্ড্ গুড হেরোইন হয়ে। কিন্তু আসলে যে ব্যাপারে আমার যাওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের কয়েকজন খুবই উঁচু মহলের লোক জড়িয়ে পড়েছিল এই ব্যবসার সঙ্গে। ড্রাগের সাথে এরা গোপন তথ্য ফাঁস করতে শুরু করেছিল। কোসা নোস্ট্রার এটাও একটা সাইড বিজনেস। ইনফরমেশন বিক্রি। আমাদের চীফ টের পেলেন যে এইসব হোমরা-চোমরা প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে আমাদের ডিপার্টমেন্টেরও কেউ কেউ জড়িত আছেন। কিন্তু এতই

সাবধানে চলছিল কাজটা যে কাউকে ধরা তো দূরে থাকুক, সন্দেহ করবারও উপায় ছিল না। দিশে না পেয়ে গোপনে ডেকে নিয়ে আমার পরামর্শ চাইলেন রঞ্জন চৌধুরী।'

'তুমি প্ল্যান দিলে যে ডবল-এজেন্টের রোল করে তুমি নামগুলো বের করে আনবে।'

'হ্যাঁ। এই প্ল্যানের মস্ত দুর্বলতা ছিল একটাই। সেটা হচ্ছে, বিপদে পড়লে সাহায্য পাব না কারও কাছে। প্ল্যানটা বাস্তবায়নের জন্যে এই তরফকে অভিনয় করতে হবে যে আমি বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী। কাজেই সাহায্যের প্রশ্নই ওঠে না। একা কাজ করতে হবে আমাকে। ধরা পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু। প্রথমটায় বারণ করেছিলেন আমাদের চীফ, কিন্তু আমার চাপাচাপিতে রাজি হয়ে গেলেন। ওঁর তখন খ্যাপা কুকুরের মত অবস্থা। রাজি না হয়ে উপায়ও ছিল না।'

'তারপর তুমি কাজ শুরু করলে। উনিও চুটিয়ে অভিনয় শুরু করলেন অতি অভিনয় হয়ে যাচ্ছে কিনা সে খেয়াল না করেই।'

'উপায় ছিল না ওঁর।' চীফের পক্ষ নিল অনিল। 'প্রথম চার মাসে ওদের মধ্যে ঢুকে পড়ার পথ তৈরি করলাম। ছোট্ট একটা কাজের ভার দিল, সেটা সুসম্পন্ন করলাম কলকাতায় এসে। তারপর ফিরে গিয়ে ওদের সাথে যোগ দিলাম পুরোপুরি ভাবে।' ম্লান হাসল অনিল। 'তার পরের সব ঘটনা তো তুমি জানোই।'

চুপচাপ বসে রইল ওরা কিছুক্ষণ।

নেমে পড়ল প্লেন।

কলকাতাতেও নোট বইটা উদ্ধারের চেষ্টা চালানো সিলভিওর পক্ষে অসম্ভব নয়। তাই লণ্ডন পৌঁছেই খবর দিয়েছিল রানা রঞ্জন চৌধুরীকে। এয়ারপোর্টে গার্ডের ব্যবস্থা করবার অনুরোধ জানিয়েছিল। অনিলকে সাথে নিয়ে ফিরছে, সে খবরও জানাতে ভুল করেনি।

প্লেনটা থেমে দাঁড়াতেই যাত্রীরা কে কার আগে নামবে তাই নিয়ে হুড়োহুড়ি শুরু করল। যেন প্রত্যেকেই দারুণ ব্যস্ত, জরুরী কাজ পড়ে আছে, এক্ষুণি না নামলে চলবে না। ওরা তিনজন বসে রইল গ্যাট হয়ে।

রানা ও গিলটি মিয়ার স্যুটকেস দুটোও তুলে দিয়েছিল বাতিস্তা অনিলের সাথে। ওগুলোর ভার গার্ডদের কাউকে দেবে বলে ঠিক করল রানা। এই খোলা এয়ারপোর্টে অনিলকে নিয়ে কাস্টমস ক্লিয়ারেনসের জন্যে অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।

দরজা খুলে দেয়ার আধ মিনিটের মধ্যে হুড়মুড় করে নেমে গেল সব যাত্রী। রানা এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করল বাইরেটা। আট-দশ জনের একটা দল এগিয়ে আসছে প্লেনের দিকে। অনিলের মাকে পরিষ্কার চিনতে পারল রানা। সাদা শাড়ি, চোখে চশমা, হাতে ছাতা আর ব্যাগ। একটু পিছিয়ে পড়েছেন উনি। তাঁর আগে হাঁটছেন ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের ডাকসেটে চীফ- রঞ্জন চৌধুরী। আশেপাশের সাদা পোশাক পরা লোকগুলোকেও দেখবার চোখ থাকলে চিনতে ভুল হয় না- সিক্রেট সার্ভিসের ট্রেনিং পাওয়া গার্ড।

নেমে এল ওরা প্লেন থেকে। অনিলের হাতে গুঁজে দেয়ার চেষ্টা করল রানা নোটবইটা, কিন্তু কিছুতেই নিল না সে।

'না, রানা। তুমি উদ্ধার করে এনেছ ওটা। তুমিই তুলে দাও ওঁর হাতে।'

'কি খবর? কেমন আছেন?' হাত বাড়িয়ে দিল রানা।

হ্যাণ্ডশেক করতে গিয়ে হাতে নোট বইটা ঠেকতেই একটু কুঁচকে উঠল রঞ্জন চৌধুরীর ভ্রূ জোড়া, মুহূর্তে সামলে নিয়ে হাসিমুখে জোরে ঝাঁকিয়ে দিলেন রানার হাত। হাতটা ছেড়ে দিয়ে রুমাল বের করলেন বেঢপ সাইজের কোটের পকেট থেকে। ততক্ষণে নোট বইটা চলে গেছে ওঁর পকেটে।

'দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে পরের ব্যাপারে নাক গলালে পরেরই উপকার হয়- কি বলেন, মিস্টার মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ,' মৃদু হেসে জবাব দিল রানা। 'আর লৌহমানব স্পাইদের মধ্যেও দু'এক টুকরো কোমল মনোবৃত্তি থাকা ততোটা পাপ নয়।'

'কথাটা আমি আর একটু ভেবে দেখব,' গম্ভীর হয়ে বললেন রঞ্জন চৌধুরী। 'সিদ্ধান্ত নেব আপনার কাছ থেকে পুরো ঘটনার রিপোর্ট পাওয়ার পর।'

'আমার যা বলার সব বলে দিয়েছি অনিলকে। ওর কাছেই রিপোর্ট নিয়ে নেবেন। সন্ধ্যার ফ্লাইটে ঢাকায় ফিরতে চাই আমি।'

অনিলকে জড়িয়ে ধরে মুহুর্মুহু চুমো খাচ্ছিলেন বৃদ্ধা। কথাটা কানে যেতেই খপ করে ধরলেন রানার হাত। আনন্দে, উত্তেজনায় কাঁপছে হাতটা।

'সেটি হচ্ছে না, বাবা!' কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন বৃদ্ধা। 'ক'দিন আমার কাছে থাকতে হবে তোমাকে। নিজ হাতে রান্না করে তোমাকে না খাওয়াতে পারলে মরেও শান্তি পাব না আমি, বাবা।'

'এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো ঠিক হচ্ছে না,' বললেন রঞ্জন চৌধুরী। হাত তুলে ইশারা করতেই তিনটে গাড়ি এগিয়ে এল এদিকে। রানার দিকে হাত বাড়ালেন তিনি। 'আপনাদের মালের আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ আর টিকেটগুলো দিন।' রানার হাত থেকে ওগুলো নিয়ে বললেন, 'খানিক বাদে এদের কেউ পৌঁছে দেবে ওগুলো অনিলের বাড়িতে। চলি। গুড বাই।'

দুটো গাড়িতে উঠে পড়লেন রঞ্জন চৌধুরী একজন ছাড়া বাকি দলবল নিয়ে। তৃতীয় গাড়িটার দিকে টানলেন বৃদ্ধা রানাকে। পালিয়ে যাবে মনে করে আঁকড়ে ধরে আছেন তিনি এখনও রানার হাত।

গিলটি মিয়া বসল ড্রাইভারের পাশের সীটে। ওকে ঠেলে প্রায় ড্রাইভারের গায়ে সাঁটিয়ে দিয়ে উঠে বসল গার্ড। পিছনের সীটে অনিল ও রানাকে দু'পাশে নিয়ে মাঝখানে বসলেন বৃদ্ধা। রওনা হলো গাড়ি।

তেমনি আঁকড়ে ধরে আছেন বৃদ্ধা রানার হাত। মুখে আশ্চর্য উজ্জ্বল এক টুকরো পবিত্র হাসি। নিঃশব্দে হাসছেন তিনি। হাসছেন, তো হাসছেন, তো হাসছেনই। হাসছে মায়ের প্রাণ।

সারাটা পথ হাসতে হাসতে চললেন বৃদ্ধা।

দুই চোখে জলের ধারা।

(শেষ)